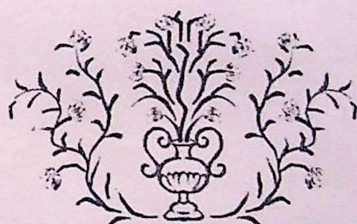
রায়-রামানন্দ মিলন

অধ্যাপিকা রমা বন্দ্যোপাধ্যায়

রায়-রামানন্দ মিলন



অধ্যাপিকা রমা বন্দ্যোপাধ্যায়

বেদান্ততীর্থ কথিকাসরস্বতী, ভাগবতরসভারতী

প্রকাশকাল ঃ রাধাষ্টমী, ১৪০২
দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ রাধাষ্টমী ২৭শে ভাদ্র ১৪২০

প্রকাশক ঃ বাসুদেব সরকার
পি-৮২ সি আই টি রোড
স্কিম নং—৬ এম
কোলকাতা-৭০০০৫৪

অক্ষরবিন্যাস ঃ ডটস্ উইনডো
রঘুনাথপুর, রাধানগর, পশ্চিম মেদিনীপুর

মুদ্রণ ঃ অবিনাশ রায়
শান্তি প্রেস
১ নারিকেলডাঙ্গা নর্থ রোড
কোলকাতা-৭০০০১১

গ্রন্থিক ঃ গীতা বাইণ্ডার্স
১ মানিকতলা মেন রোড
কোলকাতা-৭০০০৫৪

প্রাপ্তিস্থান ঃ
প্রকাশকের নিকট

মহেশ লাইব্রেরী
২/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কোলকাতা-৭০০০৭৩

সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৩৮, বিধান সরণী
কোলকাতা-৭০০০০৬

মূল্য ঃ একশো পঞ্চাশ টাকা

উৎসর্গ

সোদর প্রতিম মহাভাগবত—
শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ সরকার মহোদয়ের শ্রীকরকমলে।

রমা বন্দ্যোপাধ্যায়

পুণ্যস্মরণে

পরমভাগবত শ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দ দাস বাবাজী মহারাজ
পরমারাধ্য পিতৃদেব এবং নিত্যধামগত
রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কৃপাশীর্বাদপ্রার্থিনী
স্নেহের রমা

সংবেদন

পুণ্যতোয়া গোদাবরী বইছেন দক্ষিণ ভারতে। আজও বইছেন অনন্তলীলার সাক্ষী। তারই তীরে এই রসের খেলা রসের মেলা। এ রসের আস্বাদনে এ প্রেমের আস্বাদনে দুজন নায়ক—একজন ভোক্তা একজন দাতা। দান না করলে তো ভোগ হয় না। কিন্তু এখানে কে দাতা আর কে ভোক্তা বুঝবার উপায় নেই। রসজগতের এ এক বিচিত্র সংবাদ—আনন্দ সংবাদ তো বটেই। অনাদিরাদি শ্রীগোবিন্দ আজ রসলোলুপ রসপেটুক শ্রীগৌরাঙ্গ স্বরূপে রসভোক্তা হয়ে বসেছেন আর দাতার দিকে দেখা যাচ্ছে রসের সাগর শ্রীপাদ রামানন্দ রায়—কিন্তু রামানন্দ রায় যে দান করছেন—রসের যোগান দিচ্ছেন—এটি তাঁর নিজস্ব নয় কারণ এই রাম রায়েরই চিতচোরা শ্রীগৌরসুন্দর! আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্মের শ্রীমুখে শুনেছি—(শ্রীপাদ রামদাস বাবাজী মহারাজের শ্রীমুখের অক্ষর)

রামরায়ের চিতচোরা
চিত চুরি করে দাও না ধরা
গোরা এ তোমার কেমন ধারা।

রামরায়ের হৃদয়ে বসে গৌরসুন্দরই প্রেরণা দিয়ে দিয়ে কথা বলাচ্ছেন—রামানন্দ মেঘকে দিয়ে রসবর্ষণ করাচ্ছেন। তাই দাতার এখানে নিজের কোনও কর্ত্তৃত্বই নেই—সর্ব্বতোভাবে সমর্পিত আত্মা। এ বর্ষণে সাধ্যসাধনতত্ত্ব নিরূপিত হয়েছে এবং আরও কিছু জ্ঞাতব্য—জীবের পক্ষে যেটি জানলে আত্যন্তিক কল্যাণ—মহাপ্রভু কৃপা করে প্রশ্ন করে রামানন্দ রায়ের শ্রীমুখ দিয়ে নিজেরই সিদ্ধান্ত করিয়েছেন। 'রায় রামানন্দ মিলন' নামে এই গ্রন্থের এইটিই হল মূল বিষয়বস্তু। গ্রন্থের প্রতি পরিচ্ছেদের নামকরণ করা হয়েছে 'ধারা'। এক একটি পরিচ্ছেদে রসের ধারা—সকল ধারার অনন্ত প্রবাহের মিলন হয়েছে রসস্বরূপ রসরাজ রসিকেন্দ্র চূড়ামণি শ্রীগৌরাঙ্গ স্বরূপে। বিশ্বকবির কথায়—

আমার সকল রসের ধারা।
তোমাতে আজ হোক্ না হারা॥

'রায় রামানন্দ মিলন' পরম পূজ্যপাদ ব্রহ্মচারী শিশিরকুমার সম্পাদিত শ্রীসুদর্শন পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে বেশ অনেকগুলি সংখ্যায় প্রকাশিত

হয়েছেন। ব্রহ্মচারীজী অত্যন্ত যত্ন ও আদর করে প্রকাশের ব্যবস্থা করেছিলেন। আজ তিনি আমাদের চোখের সামনে নেই—কিন্তু সেই ধারাবাহিক প্রবন্ধের আজ এই গ্রন্থরূপে প্রকাশ তাঁরই অলক্ষ্যে কৃপার দান। তবে প্রবন্ধ যখন প্রকাশিত হয়েছিলেন—তখন গ্রন্থকারে প্রকাশের কোন পরিকল্পনা ছিল না। তাই তাকে গ্রন্থকারে রূপ দান করতে গিয়ে কিছু পরিবর্ত্তন পরিবর্দ্ধন করবার প্রয়োজন হয়েছে। সেজন্য সময় এবং পরিশ্রম দুটিরই দরকার। তবে সময় তো অনন্তকালের প্রবাহে বিলীন হয়ে গেছে আর পরিশ্রম বলে যেটি মনে হচ্ছে—সেটি পরিশ্রম তো নয়ই বরং পরম আনন্দ—শুধু আনন্দ নয় পরম সৌভাগ্য। শ্রুতিগণ তাঁদের স্তুতিতে ভগবানের কথার শ্রবণ কীর্ত্তনকে পরিশ্রম না বলে বলেছেন—পরিবর্ত্ত পরিশ্রমণা—অর্থাৎ পরিশ্রম কষ্ট তো নয়ই কিন্তু অপার আনন্দ। পরি উপসর্গটি এখানে 'বর্জন' অর্থে বলেছেন। শ্রবণ কীর্ত্তনে ভক্তের পরিশ্রম তো হয়ই না—বরং আনন্দ হয়। প্রথমেই নিবেদন জানিয়ে রাখি আমি ভক্তের পর্য্যায়ে নই। কাজেই এ কথাটি আমার পক্ষে খাটে না। তবে এইটুকু আনন্দ যে মহাপ্রভুর সঙ্গে রামানন্দ রায়ের যে সংবাদ সেটি আমার মত ক্ষুদ্রবুদ্ধির লেখনীতে ধরার কল্পনাও ধৃষ্টতা। তাতে অনেক দ্বিধা অনেক সঙ্কোচ। তবু সকলের ওপরে তাঁর কৃপাশক্তি কাজ করে এবং ভগবানের কৃপা জীবের কাছে আসে শ্রীগুরুপাদপদ্মের মাধ্যমে। এইটিই একমাত্র ভরসা। আমার নিজের মন দুষ্ট—লেখনী দুর্ব্বল—তাই তার সংস্পর্শে এই অমৃত সংবাদ গ্রন্থের মাধ্যমে যদি ভক্তবৈষ্ণবের প্রাণে কোনও আঘাত না দিয়ে রস আস্বাদন করান তাহলেই নিজেকে ধন্য ও কৃতকৃতার্থ বলে মনে করব। এর থেকে অপার আনন্দ আর নেই।

আর একটি প্রাণের কথা জানাই—'রায় রামানন্দ মিলন' গ্রন্থ প্রকাশের সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন আমার অগ্রজপ্রতিম মহানুভব শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ সরকার মহোদয়। তিনি পরম কৃপাপরবশ হয়ে সর্ব্বতোভাবে আনুকূল্য করেছেন—তা না হলে গ্রন্থ প্রকাশ কখনও সম্ভব হত না। তাই তাঁর কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ। শ্রীগৌরগোবিন্দ শ্রীরাধা মদনগোপালের শ্রীচরণযুগলে এইটিই একান্ত প্রার্থনা—তিনি তাঁর

পরিজনবর্গ নিয়ে পরম আনন্দে অপার শান্তিতে দীর্ঘজীবন যাপন করুন—শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপার ধারা অজস্রধারে তাঁর ওপর বর্ষিত হোক।

গ্রন্থের দোষত্রুটি থাকা খুবই স্বাভাবিক—লিপিকর প্রমাদ তো আছেই। তাই সুধীভক্তবৃন্দের শ্রীচরণে আমার অসংখ্য ভক্তিপূর্ণ প্রণতি জানিয়ে নিবেদন তাঁরা নিজগুণে সকল ত্রুটি মার্জনা করে নেবেন। ভিখারীর যেমন দানে পাওয়া বস্তুতে নিজের কোন কর্তৃত্বাভিমান থাকে না আমিও ভিখারিণী শ্রীগুরুদেবের অসীম কৃপার দানে এতে আমার নিজস্ব বলে কিছু নেই—থাকতে পারে না—ভক্তবৈষ্ণব আনন্দ পেলেই আমার সবকিছুর সার্থকতা।

শ্রদ্ধাস্পদ ব্রহ্মচারী শ্রীমৎ বন্ধুদাসজী গ্রন্থের প্রুফ সংশোধনের জন্য যথেষ্ট সহায়তা করেছেন—সেজন্য তাঁকে আমার অন্তরের গভীর কৃতজ্ঞতা জানাই।

পরিশেষে আর এক পরম সুহৃদ অশেষ প্রীতিভাজন শ্রীযুক্ত অবিনাশদাদার (শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র রায়) কাছে আমার চিরকৃতজ্ঞতা জানাই। তিনি তাঁর অজস্র দায়িত্বপূর্ণ কাজের মধ্যেও অতি যত্ন করে গ্রন্থ প্রকাশের সর্ব্বতোভাবে ভার গ্রহণ করেছেন—এর জন্য যথেষ্ট পরিশ্রমও করেছেন। শ্রীভগবানের অশেষ কৃপাশিস্ তিনি লাভ করুন—এটি একান্ত প্রার্থনা।

শ্রীগুরুবৈষ্ণবকৃপাপ্রার্থিনী
রমা বন্দ্যোপাধ্যায়

'রবীন্দ্র নিকেতন'
বাগানিয়া পাড়া
শ্রীধাম নবদ্বীপ
নদীয়া

দ্বিতীয় সংস্করণের মুখপত্র

জীবনের রথের চাকা কেমন করে পৃথিবীর ধূলি মলিন কামনা-কলুষিত বন্ধুর পথ দিয়ে আধ্যাত্মিক সমুন্নত সুমহান ব্রহ্মানন্দ-ঘনীভূত আত্মজিজ্ঞাসায় মগ্ন হতে পারে—খ্যাতি বৈভব সবকিছু পরিত্যাগ করে ঈশ্বরের একজন দীনাতিদীন সেবক বলে তাঁর চরণে নিজেকে উৎসর্গ করতে পারে—বিভূতিভূষণ সরকার ছিলেন তার মধ্যে একজন স্মরণযোগ্য। আসলে তিনি ছিলেন একজন গৃহী সন্ন্যাসী। নিজের পারিবারিক প্রতিপালন এবং বিগ্রহ সেবা উভয়ই তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে গেছেন। আবার সৎকার্যে অর্থব্যয় যত্রতত্র তিনি বহু ক্ষেত্রে বহুভাবে করেছেন। জ্ঞান-সঞ্জীবনী জীবনকে মহৎ করে আর এই মহতের কৃপাতেই জীব ভক্তি-বিজ্ঞান পায়। ভক্তির বিজ্ঞান সাধন করে ভক্ত ভক্তির রস আস্বাদন এবং ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে।

শ্রীমদ্ভাগবত হল প্রেমভক্তি রসের সাগর। সেই রসাস্বাদন যাঁরা করেছেন তাঁরা ধন্য হয়েছেন। বিভূতিভূষণ সরকার মহোদয় সেই রস সকলকে আস্বাদন করাবার প্রয়াসে বহু গ্রন্থ প্রকাশে ব্রতী হয়েছিলেন। রায় রামানন্দ মিলনও তিনি জীবিতকালে প্রায় আঠার বছর পূর্বে প্রকাশ করেছিলেন। এখন প্রয়াণের পর তাঁর সুযোগ্য পুত্র শ্রীবাসুদেব সরকার মহাশয় গ্রন্থটি পুনঃ মুদ্রণের ব্যবস্থা করেছেন। শুধুমাত্র এই গ্রন্থটিই নয় তাঁর পিতার প্রকাশিত সমস্ত গ্রন্থই তিনি রস-পিপাসু পাঠকদের রসাস্বাদনের জন্য সম্যক আগ্রহের সঙ্গে পুনঃ প্রকাশে সচেষ্ট হয়েছেন। গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার মত তিনিও তাঁর পিতার সর্ববন্দিত, স্বরূপ মহিমান্বিত আরব্ধ কাজ সম্পন্ন করতে উদ্যোগী হয়েছেন।

সৎকার্যে অর্থ ব্যয়ের সার্থকতা তো আছেই। বাসুদেব বাবুর এই প্রয়াস, এই রসভাণ্ড পরিপূর্ণ গ্রন্থগুলি প্রকাশের সংকল্পের জন্য সকলের কাছে তিনি চিরস্মরণীয় হ'য়ে থাকবেন।

অবিনাশ রায়

সূচীপত্র

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি

প্রথম ধারা

প্রাক্ কথন—প্রথম মিলন

মধুর শ্রীনীলাচলে সচল ব্রহ্ম শ্রীগৌরসুন্দরের মনে বাসনা জাগল দক্ষিণদেশ ভ্রমণে যাবার। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের কাছে আবেদন জানালেন—

সন্ন্যাস করি বিশ্বরূপ গিয়াছে দক্ষিণে
অবশ্য করিব আমি তাঁর অন্বেষণে॥

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত—মধ্য ৭ম

বিশ্বরূপ অন্বেষণে দক্ষিণ দেশ ভ্রমণ এতো ছল। প্রকৃত কথা কি দক্ষিণ দেশবাসীকে উদ্ধার। সার্ব্বভৌম শ্রীমন্মহাপ্রভুর মনের একান্ত অভিপ্রায় বুঝে বললেন—

তবে সার্ব্বভৌম কহে প্রভুর চরণে।
অবশ্য পালিবে প্রভু মোর নিবেদনে॥
'রামানন্দ রায়' আছে গোদাবরী তীরে।
অধিকারী হয়েন তেঁহো বিদ্যানগরে॥
শূদ্র বিষয়ী জ্ঞানে উপেক্ষা না করিবে।
আমার বচনে তাঁরে অবশ্য মিলিবে॥
তোমার সঙ্গের যোগ্য তেঁহো একজন।
পৃথিবীতে রসিক ভক্ত নাহি তাঁর সম॥
পাণ্ডিত্য আর ভক্তিরস দুঁহের তেঁহো সীমা।
সম্ভাষিলে জানিবে তুমি তাঁহার মহিমা॥

শ্রীচৈঃ চঃ মধ্য ৭ম

প্রভু তাঁর বাক্য অঙ্গীকার করলেন—

অঙ্গীকার করি প্রভু তাঁহার বচন।
তাঁরে বিদায় দিতে তাঁরে কৈল আলিঙ্গন॥
*   *   *   *
এত বলি মহাপ্রভু করিলা গমন।

দক্ষিণ দেশে কয়েকটি স্থান ভ্রমণ করে এবং দেশবাসীকে কৃপা করে

শ্রীমন্মহাপ্রভু জিয়ড়নৃসিংহক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন। সেখানে শ্রীনৃসিংহদেবকে দর্শন করে দণ্ডবৎ প্রণতি করে প্রেমাবশে বহু নৃত্যগীত স্তুতি করলেন।

শ্রীনৃসিংহ জয় নৃসিংহ জয় জয় নৃসিংহ
প্রহ্লাদেশ জয় পদ্মামুখপদ্মভৃঙ্গ॥
এইমত নানা শ্লোক পড়ি স্তুতি কৈল।
নৃসিংহ সেবক মালা প্রসাদ আনি দিল॥

শ্রীনৃসিংহদেব ভক্তবাৎসল্যের মূর্ত্তি। প্রহ্লাদজীর বিশুদ্ধা ভক্তিতে ভগবানের এই শ্রীবিগ্রহের অচেতন স্ফটিকস্তম্ভেতে আবির্ভাব। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই মূর্ত্তি বড় প্রিয়।

এরপরে মহাপ্রভু প্রেমাবেশে পথে চলেছেন—দর্শনমাত্রে লোককে বৈষ্ণব করে প্রেমে মাতিয়ে কতদিন পরে গোদাবরীতীরে এসে উপস্থিত হলেন। গোদাবরী দেখে প্রভুর শ্রীযমুনা স্মরণ হল—আর তীরে বন দেখে বৃন্দাবন স্মৃতি মনে জেগে উঠল। সেই বনে কতক্ষণ নৃত্যগান করে গোদাবরী পার হয়ে স্নান করলেন। তারপর ঘাট ছেড়ে কিছুদূরে গিয়ে নদীর তীরে বসে প্রভু শ্রীকৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন করছেন।

এমন সময় সেখানে দোলায় চড়ে রামানন্দ রায় বাজনা বাজিয়ে গোদাবরী স্নানে এলেন। সঙ্গে তাঁর অনেক বৈদিক ব্রাহ্মণ—তাঁরা মন্ত্র উচ্চারণ করলেন। রামানন্দ বিধিমতে স্নানাদি তর্পণ করলেন। প্রভুর করুণাভরা দৃষ্টি রামানন্দের উপর পড়ল, তখনই মনে মনে বুঝলেন ইনিই রামানন্দ রায়। প্রভুর মন সর্ব্বতোভাবে রামানন্দের সঙ্গে মিলনের জন্য ব্যগ্র। তবু ধৈর্য্য ধরে বসে রইলেন। কারণ মিলনের একটি শুভলগ্ন আছে। সেইক্ষণ না আসা পর্য্যন্ত তো অপেক্ষা করতে হবে। ভগবানের আকর্ষণ হয়েছে ভক্তের প্রতি আর ভক্তের বুঝি হবে না? কারণ ভক্তিমহারাণী তো থাকেন মাঝখানে। ভক্ত ভগবান দুজনেই এই ভক্তিতে আকৃষ্ট হন। অপূর্ব্ব সন্ন্যাস মূর্তি দর্শন করে রামানন্দ আকৃষ্ট হয়ে কাছে এলেন।

সূর্য্যশতসম কান্তি অরুণ বসন।
সুবলিত প্রকাণ্ড দেহ, কমললোচন॥
দেখিয়া তাঁহার মনে হৈল চমৎকার।
আসিয়া করিল দণ্ডবৎ নমস্কার॥ শ্রীচৈঃ চঃ মধ্য ৮ম

প্রভু তাঁকে উঠিয়ে প্রেমভরে আলিঙ্গন করে বললেন—ওঠ, বল কৃষ্ণ

কৃষ্ণ। প্রভুর হৃদয় তো মিলনের জন্য তৃষাতুর হয়ে আছে। তবু জিজ্ঞাসা করলেন—

তথাপি পুছিল—তুমি রায় রামানন্দ?
তেঁহো কহে—সেই হয় দাস শূদ্র মন্দ॥

প্রভু তাঁকে দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করে প্রেমাবেশে প্রভু ভৃত্য দুজনেই অচেতন হয়ে পড়লেন।

স্বাভাবিক প্রেম দোঁহার উদয় করিলা।
দুঁহা আলিঙ্গিয়া দুঁহে ভূমিতে পড়িলা॥
স্তম্ভ, স্বেদ, অশ্রু, কম্প পুলক বৈবর্ণ্য।
দুঁহার মুখেতে শুনি গদগদ কৃষ্ণবর্ণ॥

রামানন্দের সঙ্গে যে সব বৈদিক ব্রাহ্মণ ছিলেন তাঁরা তো দেখে চমৎকৃত হচ্ছেন—এমনটি তো আর কোথাও দেখেন নি। ভাবছেন—সন্ন্যাসীর তো দেখছি ব্রহ্মসম তেজ অথচ তিনি শূদ্রকে আলিঙ্গন করে কাঁদছেন কেন? আবার এই মহারাজ রামানন্দ রায় পরম গম্ভীর মহাপণ্ডিত—তিনি এই সন্ন্যাসীর স্পর্শে এত অস্থির হলেন কি করে? এ বিচারের আর মীমাংসা হয়ে উঠছে না।

কিছু পরে বিজাতীয় লোক দেখে প্রভু ভাব সংবরণ করে স্থির হয়ে বসলেন। হেসে রামানন্দকে মনের কথা বলতে লাগলেন—সার্ব্বভৌম তোমার সঙ্গে মিলবার জন্য আমাকে অনেক করে বলে দিয়েছেন—

তোমা মিলিবারে মোর এথা আগমন।
ভাল হৈল, অনায়াসে পাঁইলু দরশন॥

প্রভুর কথা শুনে রামানন্দ নিজ দৈন্যে বললেন—'সার্ব্বভৌম আমাকে বড় কৃপা করেন—সেইজন্যই তোমার দর্শন পেয়ে আজ ধন্য হলাম। আজ আমার মানবজন্ম সার্থক হল। কারণ ভক্তকৃপা ছাড়া মানুষ জন্মের সার্থকতা নেই।

কাঁহা তুমি সাক্ষাৎ ঈশ্বর নারায়ণ।
কাঁহা মুঞি রাজসেবী বিষয়ী শূদ্রাধম॥
আমা নিস্তারিতে তোমার ইহাঁ আগমন।
পরম দয়ালু তুমি পতিতপাবন॥

প্রভু কহে—

রামানন্দ তুমি মহাভাগবতোত্তম।
তোমার দর্শনে সবার দ্রব হইল মন॥
অন্যের কি কথা আমি 'মায়াবাদী সন্ন্যাসী'।
আমিও তোমার স্পর্শে কৃষ্ণপ্রেমে ভাসি॥

এইভাবে ভক্ত ভগবান দুজনে দুজনকে স্তুতি করছেন—দাস, প্রভু দুইই সমান। তাই আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্মের শ্রীমুখের আস্বাদন শুনলাম—

সে দাস কৈ সে প্রভু কই
সে মধুর লীলা কই—
কার গুণ গাইব রে—দাসের গুণ না প্রভুর গুণ—

গোদাবরী তীরে এক বৈদিক ব্রাহ্মণের শুভাগমন হল তখনই। তিনি মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করলেন। মহাপ্রভুও অঙ্গীকার করলেন। পরস্পরের বিদায় বেলায় দুজনেই দুজনের বিচ্ছেদে কাতর। প্রভু বললেন—

তোমার মুখে কৃষ্ণকথা শুনিতে হয় মন।
পুনরপি পাই যেন তোমার দরশন॥

রায় কহে—

আইলা যদি পামর শোণিতে।
দর্শনমাত্রে শুদ্ধ নহে মোর দুষ্ট চিতে॥
দিন পাঁচ সাত রহি করহ মার্জন।
তবে শুদ্ধ হয় মোর এই দুষ্ট মন॥

এই বৈদিক ব্রাহ্মণের ঘরেই রামানন্দের সঙ্গে মহাপ্রভুর মিলন এবং কথোপকথন। রায় রামানন্দ সংবাদ—অর্থাৎ একজন প্রশ্নকর্ত্তা আর একজন উত্তরদাতা—এই প্রশ্নোত্তরে যে প্রসঙ্গ তার নামই সংবাদ। প্রশ্নকর্ত্তা এখানে মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান আর উত্তরদাতা হলেন ভক্তপ্রবর রামানন্দ রায়। মহাপ্রভু প্রশ্ন করছেন আবার তিনিই শ্রোতা হয়ে আস্বাদন করছেন আর ভক্ত রামানন্দ রায় সেই আস্বাদনের যোগান দিচ্ছেন। এটি লীলার বড় বিচিত্র পরিপাটি। শুধু পরিপাটি নয়, ভগবল্লীলায় ব্যতিক্রমও বটে।

দ্বিতীয় ধারা

বন্দনা

ভগবানের লীলার বিচিত্র পরিপাটিতে আচার্য্য শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদ বন্দনা গাইলেন—

সঞ্চার্য্য রামাভিধ-ভক্তমেঘে
স্বভক্তিসিদ্ধান্ত চয়ামৃতানি।
গৌরাব্ধিরেতৈরমুনা বিতীর্ণৈ-
স্তজ্জত্ব-রত্নালয়তাং প্রয়াতি॥ শ্রীচৈঃ চঃ ৮ম ১ শ্লোক

স্বয়ং ভগবান শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু দক্ষিণ ভারতের বহু তীর্থ ভ্রমণ করে অবশেষে গোদাবরীতীরে এসে বিশ্রাম করলেন। মহাপ্রভু প্রেমসৌভাগ্যবান। প্রশ্ন হতে পারে ভগবানের আবার সৌভাগ্য কি? রাধাপ্রেম আস্বাদন করবার মত বিগ্রহ পেয়ে তিনি সৌভাগ্যবান। কনককেতকী-কুসুমের পরিমলের মত সর্ব্বত্র পরিমলে আমোদিত। শ্রীগৌরপাদপদ্ম সকল গুণের বাসস্থান। অখিল মনোমুগ্ধকর এই নবীন সন্ন্যাসী কে? এই সন্ন্যাসী কে? এই প্রশ্ন করতে করতে সেখানকার ব্রাহ্মণগণ মিলিত হলেন ব্রহ্মণ্যদেবের কাছে। ব্রাহ্মণগণ এসেছেন পরে ভক্তপ্রবর রামানন্দরায়ের সঙ্গে মিলন।

শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের অনুরোধ গোদাবরীতীরে দক্ষিণ ভারতে রায় রামানন্দ রসের সাগর—তাঁর সঙ্গে তুমি মিলিত হবে প্রভু। সেখানে তোমার সঙ্গে মিলিত হবার পক্ষে ঐ একজনই মাত্র আছেন। রামানন্দের সঙ্গে মিলিত হয়ে গৌরসুন্দরের আর আনন্দের সীমা নেই! মহাপ্রভু তাঁকে কিছু পড়বার জন্য অনুরোধ জানালেন। রামানন্দের সঙ্গে মহাপ্রভুর পূর্ব্ব হতে কোন পরিচয় ছিল না। এই প্রথম সাক্ষাৎ ও সম্ভাষণ। কি বললে মহাপ্রভু সন্তুষ্ট হবেন তা তো তাঁর জানা নেই। রামানন্দ যে উক্তি করেছেন সেটি তাঁর নিজস্ব নয়। শ্রীল কবিরাজ এ সম্বন্ধে যে কথা বন্দনা প্রসঙ্গে বললেন সেইটিই ঠিক।

এ জগতে দেখা যায় সাগরের জল লবণাক্ত। সে জল সাধারণ মানুষের পক্ষে অপেয়—পান করতে পারা যায় না। কিন্তু সেই লবণাক্ত জল যখন আকাশের সূর্য্য তার প্রখর কিরণ দিয়ে শোষণ করে আকাশে মেঘের সঞ্চার করে এবং সেই মেঘ পরে অবিচারে অমৃতোপম বারি

বর্ষণ করে তখন সেই মেঘের জল সাগরেও পড়ে। সাগরে জলের দরকার নেই তবু মেঘের এটি স্বভাব সাগরেও বর্ষণ করে। সেই মেঘ থেকে যখন জল ঝরে তখন যদি স্বাতী নক্ষত্র যুক্ত হয় তখন ঐ জলবিন্দু সাগরের গর্ভে যে শুক্তি (ঝিনুক) থাকে তার মধ্যে পড়ে তাতে ঐ জলবিন্দু মুক্তায় পরিণত হয়। মুক্তা তো রত্নবিশেষ। এই রত্নকে সাগর গর্ভে ধারণ করে বলে সাগরের একটি নাম রত্নাকর। সাগর আগে সাগর ছিল কিন্তু রত্নাকর ছিল না। কিন্তু যখন মেঘের বর্ষণের জলে মুক্তা তৈরী হল তখন সেই মুক্তাকে গর্ভে ধারণ করায় সাগর হল রত্নাকর।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদের আস্বাদন—এখানে শ্রীগৌরসুন্দর হলেন সাগর—কিসের সাগর? প্রেমের সাগর। বলা আছে—

প্রেমসিন্ধু গোরা রায় নিতাই তরঙ্গ তায়।

গৌর প্রেমসিন্ধু কিনা তাই তার বৈশিষ্ট্য আছে। সে লবণাক্ত নয়। জীবমীন জল ছাড়া বাঁচতে পারে না। তাই গৌরচন্দ্র জীবমীনকে সংসার লবণাক্ত সাগর থেকে অর্থাৎ প্রাকৃত বিষয় রস থেকে টেনে তুলে অপ্রাকৃত প্রেমসাগরে ডুবিয়ে দিয়েছেন। তার ফলে জীবের পক্ষে ভগবানকে না জানা রূপ দুরধিগম্যতারূপ যে অপেয়তা তা আর নেই। প্রেমসাগরে ডুবে গিয়ে সে অমৃতপানে বিভোর হয়ে যায়। এই অমৃত জীব পেল কি করে? গৌর আমার অমৃত সাগর। এই সাগরের জল গৌর সূর্য্য তাঁর কৃপা কিরণ দিয়ে টেনে নিয়ে রামানন্দ রায় নামে মেঘ সঞ্চার করেন। গৌর সাগরও বটে সূর্য্যও বটে। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদ বন্দনা গেয়েছেন—

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ।
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ॥

এখানে শ্রীগৌরসুন্দরকে সূর্য্য আর শ্রীনিত্যানন্দকে চন্দ্রমা বলা আছে। এই রামানন্দ মেঘে আছে অজস্র ভক্তিসিদ্ধান্ত যাকে বলা হয়েছে ভক্তিসিদ্ধান্ত চয়ামৃত জল। সেই রামানন্দ মেঘ থেকে যখন ভক্তিসিদ্ধান্ত-চয়ামৃত জল বর্ষিত হল তখন তা গৌরসাগরেও বর্ষিত হল। গৌরসুন্দর নিজেরই ভক্তিসিদ্ধান্ত রায় রামানন্দের মুখে শুনছেন—প্রশ্ন হতে পারে তাতে কি লাভ হল? মেঘের জল যেমন সাগরে পড়লে তাতে মুক্তা তৈরী হয় এবং সেই মুক্তা রত্নবিশেষ। তাই এই মুক্তাকে গর্ভে ধারণ

করে সাগর রত্নাকর হয়—তা না হলে অসীম জলরাশি সাগরে কিন্তু তাতে সাগর সাগর বটে কিন্তু রত্নাকর হতে পারে না। এখানেও তেমনি রামানন্দরায়ের মুখে নিজেরই ভক্তি সিদ্ধান্ত শ্রীমন্মহাপ্রভু শুনছেন বটে কিন্তু যেন নূতন করে আস্বাদন করছেন, এ আস্বাদন যেন তাঁর আগে ছিল না। এই তজজ্ঞত্বরূপ অর্থাৎ সিদ্ধান্তের আস্বাদনরূপ রত্নকে লাভ করে গৌরসাগর আজ প্রেমরত্নাকর হলেন। গৌর সাগর ছিলেন কিন্তু রত্নাকর ছিলেন না। রামানন্দ মেঘ বর্ষণ করায় এইটি লাভ হল। এই প্রেম-রত্নাকর গৌরের স্পর্শে জীব প্রাকৃত লবণ সমুদ্র থেকে শরণামৃত সমুদ্রে উন্নীত হল। কাজেই লবণতারূপ যে অপেয়তা অর্থাৎ ভগবল্লাভের যে দুরধিগম্যতা তা দূর হল। রামানন্দকে মেঘ বলা হয়েছে—তার একটি কারণ আছে। রামানন্দ তো নিত্যসিদ্ধ পরিকর। নিত্য পরিকরই কেবলমাত্র ভগবদ্ রস আস্বাদন করতে পারে। মেঘের জলে সাগরের গর্ভে শঙ্খ মুক্তা রত্ন তৈরী হয়। তেমনি স্বভক্তিই রামানন্দের মুখে শ্রবণ করে গৌরসাগরে প্রেমরত্নের সৃষ্টি হল। তখনই গৌর তজ্জ্ঞত্বরূপ রত্নালয়তা পেলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিজস্ব আস্বাদনের বস্তু সাধারণের উপভোগ্য হতে পারে না। তাই ভক্তদ্বারে সেই সিদ্ধান্তগুলি জীবজগৎকে দান করলে জীবজগৎ ধন্য হবে। রামানন্দ মহাপ্রভুর আশয় বুঝতে পেরে উচ্চারণ করলেন—

মনো যদি ন নির্জিতং কিমমুনা তপস্যাদিনা
কথং স মনসো জয়ো যদি ন চিন্ত্যতে মাধবঃ।
কিমস্য চ বিচিন্তনং যদি ন হন্ত চেতোদ্রবঃ
স বা কথমহো ভবেদ্ যদি ন বাসনাক্ষালনম্॥

চিত্তই যদি দ্রবীভূত না হয়, বশীভূত না হয়—কারণ বশীভূত হলে তবে দ্রবীভূত হবে অর্থাৎ বিষয় থেকে নিস্পৃহ না হয় তাহলে তপস্যা করবারই বা প্রয়োজন কি? আর চিত্ত যদি হরিস্মরণে রত না হয় তাহলে চিত্ত স্থিরই বা হবে কিভাবে! কারণ কথা আছে—

জীব কিছুতেই স্থির হতে নারে
যতই সাধন করুক না কেন জীব কিছুতেই স্থির হতে নারে
সম্বন্ধ লক্ষণা ভক্তির আশ্রয় না পেলে জীব কিছুতেই স্থির হতে নারে।
শ্রীপাদ রামদাস বাবাজী মহারাজের শ্রীমুখোক্তি।

শাস্ত্রেরও কথা আছে—

হৃষীকেশে হৃষিকানি যস্য স্থৈর্য্যং গতানি হি।
ত এব ধৈর্য্যমাপ্নোতি সংসারে জীবচঞ্চলে ॥

হৃষীকেশ শ্রীগোবিন্দে যার ইন্দ্রিয় স্থির হয়েছে সে-ই এই জীবচঞ্চল সংসারে স্থিরতা লাভ করতে পারে। তা ছাড়া মনকে স্থির করার অন্য কোনও উপায় নেই।

আর চিত্ত যদি প্রেমে দ্রবীভূত না হয় তাহলে ভগবৎ চিন্তা করেই বা লাভ কি? সকলের মূলে হল বাসনার ক্ষয়। অনাদিকালের দুর্ব্বাসনা ক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত চিত্ত দ্রবীভূত হওয়ার কোন উপায় নেই।

রায় রামানন্দ সন্নিধানে মহাপ্রভু এসে বললেন—'তোমা মিলিবারে মোর এথা আগমন'—দাস আত্মনিবেদন করছেন এবং প্রভু তাঁকে অঙ্গীকার করছেন। এ আত্মনিবেদন—এটি বুঝা কঠিন। যেমন প্রভু, তাঁর তেমনি দাস, কখনও মনে হয় প্রভুরই বুঝি আত্মনিবেদন এবং দাসের অঙ্গীকার আবার পরক্ষণেই দেখা যায়, না—তা তো নয়—দাসেরই আত্মনিবেদন এবং প্রভুরই অঙ্গীকার। মহাপ্রভুর লীলা বড় মিষ্টি। ভক্তের সঙ্গে ভগবানের মিলন ব্রজলীলা এবং নদীয়ালীলায় বহুবার হয়েছে। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীদশমে ৮৫ অধ্যায়ে শ্রুতদেব ও বহুলাশ্ব নামে দুই ভক্তের সঙ্গে ভগবানের মিলন প্রসঙ্গ পাওয়া যায়—মহামুনি কন্ব, ভগবানের অবতার পরশুরাম, দেবগুরু বৃহস্পতি সকলে ভগবানের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন—কিন্তু ঐ দুজন ভক্ত আসেন নি। তাতে তাঁরা কিন্তু বঞ্চিত হন নি। ভগবান নিজে মিথিলায় এলেন তাঁদের দেখা দিতে। কৃষ্ণ নিজে মিথিলায় আসতে দুইজনেই একসঙ্গে ভগবানকে নিজের কাছে চাইলেন। ভগবানের মহিমা এমনই তিনি দুজনের গৃহেই একসঙ্গে প্রবেশ করলেন—এবং শুধু ভগবান একা নন তাঁর পরিকরেরাও সকলে দুজনের কাছে একসঙ্গে আতিথ্য গ্রহণ করলেন। এইটিই ভগবানের মহিমা। একসঙ্গে ষোল হাজার মহিষীকে কৃষ্ণ বিবাহ করলেন সেখানে পরিকরদেরও উপস্থিত থাকতে হয়েছিল। ষোল হাজার মাতাপিতা ষোল হাজার পুরোহিত এ বড় বিচিত্র ব্যাপার—কিন্তু এ গৌরলীলায় মহাপ্রভুর সঙ্গে যে রামানন্দ রায়ের গোদাবরী তীরে মিলন—এ মিলন বড় সুন্দর বড় কমনীয়। এ মিলনে রামানন্দ রায়ের সঙ্গে মহাপ্রভুর প্রথম পরিচয়

বহু জন্ম জন্মান্তরের—দুজনে দুজনের প্রতীক্ষায় আকুল আগ্রহে দিন গুণছেন। মহাপ্রভুর প্রশ্নের কি উত্তর হতে পারে—তার হার্দ্দ্য বুঝে উত্তর দেওয়া কঠিন। তাই মহাপ্রভু কৃপা করে নিজের আস্বাদনের বস্তু পরম উপভোগ্য রাধাপ্রেম রামানন্দ ভক্ত দ্বারে জীবের জন্য পরিবেশন করলেন। ভগবানের সঙ্গে নিত্য পরিকরেরই লীলা হয়। পরিকর ছাড়া ভগবান থাকতে পারেন না।

মহাপ্রভুর দান ভারী মিষ্টি। উত্তরদাতা যিনি হলেন তিনি পর্জন্যবৎ বর্ষণ করবেন। যাকে দেবেন তাকেও জানতে দেবেন না যে তাকে দান দিচ্ছেন—অন্যলোক তো দূরের কথা। ভগবানে যে রতি সেইটিই আসল বিদ্যা। শ্রীমদ্ভাগবতে বলা আছে—'সা বিদ্যা তন্মতি র্যথা।' ক্ষুধাকে লক্ষ্য করে যেমন অন্ন খায়—ক্ষুধার নিবৃত্তি হলে যেমন অন্নের আর উপযোগিতা থাকে না—তেমনি সব কিছু জানতে জানতে এমন কিছু জানতে হবে যাকে জানলে সকল জানার নিবৃত্তি হবে এবং যাঁকে পেলে সকল পাওয়ার নিবৃত্তি হবে—শ্রীভগবান গীতাবাক্যে বলেছেন—

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্খতি।

এখানে ব্রহ্মভূত মানে নয় যে ব্রহ্ম হয়ে গেছে—কিন্তু যে ব্রহ্মকে উপলব্ধি করেছে, তার চিত্ত সর্ব্বদা প্রসন্ন—সে কখনও শোক করে না—তার কামনা বাসনা বলতে কিছু সেই—স্বরূপের উপলব্ধিরই অপর নাম মুক্তি। মুক্তির লক্ষণ শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রে বলা আছে—'মুক্তিহিত্বাহন্যথারূপং স্বরূপেণ বাবস্থিতিঃ'। স্বরূপকে জানার নামই মুক্তি।

শ্রীমন্মহাপ্রভু জীবের খাঁটি স্বরূপটি বলেছেন—আমি অর্থাৎ আত্মা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য অথবা শূদ্র নয়—আত্মা ব্রহ্মচারী, গৃহস্থী, বাণপ্রস্থী অথবা সন্ন্যাসী নয় কিন্তু আত্মা শ্রীগোপীজনবল্লভের চরণকমলের দাসের দাসের দাস। শ্রীগোবিন্দ জীবের স্বরূপটি বলেছেন—

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতন। গী ৫/৭

অংশ জীব বিন্দু, অংশী ভগবান সিন্ধু। সিন্ধু ও বিন্দুর মধ্যে যে পার্থক্য জীব ও ভগবানের মধ্যে সেই পার্থক্য। জলের বিন্দু এবং সিন্ধু যদিও উভয়েরই উপাদান জল তথাপি সিন্ধুর জলে যে ফেনা বুদ্বুদ তরঙ্গ প্রভৃতি দেখা যায়—জল বিন্দুতে তা থাকা সম্ভব হয় না—তেমনি চিৎকণ জীবন এবং অখণ্ড চিদানন্দ স্বরূপ শ্রীভগবান—উভয়েরই উপাদান চিৎ

হলেও ভগবানের বিভূতি, ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য, এ সকলের কিছুই বিন্দু জীবে থাকা সম্ভব নয়—সংসারেও দেখা যায় অর্থের ন্যূনতায় ভৃত্য এবং অর্থের প্রাচুর্য্যে প্রভু উভয়ের উপাদান এক মনুষ্যত্ব হলেও তাদের দাস প্রভু সম্বন্ধরূপ পার্থক্য যথেষ্ট আছে। বিভু চৈতন্য প্রভু এবং অণু চৈতন্য দাস—এই যে দাস প্রভু সম্পর্ক—এ বড় মধুময়। মায়ার দাসত্ব কষ্টের কিন্তু গোবিন্দের দাসত্ব পরম মঙ্গলময়। জ্ঞান থেকে ভক্তিকে পৃথক্ করবার জন্য ভক্তির নাম দেওয়া হয়েছে জ্ঞানবিশেষা ভক্তিঃ। জ্ঞানই ভক্তি—তবে ভক্তির এমন একটি বৈশিষ্ট্য আছে যা জ্ঞানে নেই। শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় উপমা দিয়েছেন—কৌরব শব্দবিশেষে পাণ্ডব শব্দবৎ বোধ্যঃ। পাণ্ডবদেরও কৌরব শব্দে অভিহিত করা যায়—কিন্তু কৌরবদের থেকে পাণ্ডবদের এমন একটী পৃথক বৈশিষ্ট্য আছে যাতে করে তাদের কৌরব না বলে পৃথক্ পাণ্ডব শব্দে অভিহিত করা হয়—পাণ্ডবদের সখা হচ্ছেন কৃষ্ণ। কৌরবদের কিন্তু এই কৃষ্ণসখত্ব গুণটি নেই—কৃষ্ণ যে শুধু পাণ্ডবদের সখা তা নন—তিনি তাদের সব—পতি, গুরু, দেবতা, কুলপতি এমন কি ভৃত্য পর্য্যন্ত।

গোদাবরী তীরে শ্রীপাদ রামানন্দ রায়ের সঙ্গে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মিলন। এখানে রামানন্দ রায়ের সঙ্গে মহাপ্রভুর মিলন না মহাপ্রভুর সঙ্গে রামানন্দ রায়ের মিলন—এটি বলা কঠিন। বৈয়াকরণ সূত্র করেছেন—সহযুক্তেই-প্রধানে'। অপ্রধান যে তার সঙ্গেই 'সহ' শব্দ বসবে। এখন এখানে দু'জনের মধ্যে প্রধানই বা কে আর অপ্রধানই বা কে? গৌর ভগবানের ভগবত্তার ওপরে আর কোন ভগবত্তা নেই। কারণার্ণবশায়ী মহাপুরুষের নিঃশ্বাস হল বেদ। মহাপুরুষের নিঃশ্বাসই যদি বেদ হয় তাহলে আবার মুনিরা তা প্রণয়ন করেছেন বলা হয় কেন? শ্রীজীবগোস্বামিপাদ তাঁর তত্ত্বসন্দর্ভে এ বিষয়ে বিচার করেছেন। মুনিরা বেদের স্মর্ত্তা কিন্তু কর্ত্তা নন। বেদ অনাদি কাল হতেই রয়েছে। যে মুনির প্রতি কৃপা পরবশ হয়ে ঈশ্বর তাঁকে দিয়ে বেদমন্ত্র স্মরণ করান তিনিই তখন সেই বেদমন্ত্রের স্মর্ত্তা হন। বৈকুণ্ঠাধিপতি নারায়ণের চারটি কায়ব্যূহ। বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ। তার মধ্যে সঙ্কর্ষণ কায়ব্যূহের অংশ কারণার্ণবশায়ী বা প্রথম পুরুষাবতার। গোলোকাধিপতির অংশ এই কায়ব্যূহ—অংশ এবং অংশী অভিন্ন। কারণ গীতায় ভগবান বলেছেন—'বেদান্তকৃৎ বেদবিদেব

চাহম্।' শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্র যদিও শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা নিরূপণ প্রসঙ্গে বলেছেন—

"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকারও বলেছেন—

একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য।
যারে যৈছে নাচায় সে তৈছে করে নৃত্য॥

কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান। একটি দীপ থেকে যেমন অন্য দীপ প্রজ্বলিত হয় তেমনি কৃষ্ণের ভগবত্তা থেকে অন্য সকল ভগবানের ভগবত্তা নির্দ্ধারিত হয়। যাঁর ভগবত্তা থেকে অন্য সকলের ভগবত্তা তিনিই স্বয়ং ভগবান। কিন্তু এমন যে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তিনিও যখন রাধা বিরহিত অবস্থায় থাকেন তখন তিনি শোভা পান না।

পুনঃ শুক কহে কৃষ্ণ মদন-মোহন।
পুনঃ শারী কহে শুকে করি পরিহাস—
রাধা সঙ্গে যদা ভাতি তদা মদনমোহনঃ।
অন্যথা বিশ্বমোহঽপি স্বয়ং মদনমোহিতঃ॥

হে শুক! রাধা সঙ্গে যখন কৃষ্ণ তখনই তিনি মদনমোহন। অন্যথা তিনি বিশ্বমোহন হলেও স্বয়ং মোহযুক্ত। এই যে মদন বলা হল এ মদন অপ্রাকৃত। রাধার সঙ্গ অভাবে কৃষ্ণ পর্য্যন্ত দুর্ব্বল। রাধা বিরহিত কৃষ্ণ যে দুর্ব্বল বলা হল, এ দৌর্ব্বল্য তত্ত্বের নয়। তত্ত্বের অপূর্ণতা এতে একটুকু নেই। কারণ সব ভগবানই তত্ত্বের দিক দিয়ে নিজে নিজে পূর্ণ। শ্রুতি বলেছেন—

পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥

কিন্তু তত্ত্বের অপূর্ণতা না থাকলেও রসের অপূর্ণতা আছে। তত্ত্ব বাহন, রস তার ওপরে চড়ে। এ জগতেও দেখা যায় তত্ত্বে এক ব্যক্তি ধনবান। কিন্তু প্রয়োজনে দান করেছেন মাত্র হাজার টাকা। কাজেই প্রচুর ধন তাঁর থাকা সত্ত্বেও তাঁকে হাজার টাকা দানকারী ছাড়া আর অন্য কিছু বলা যাবে না। তেমনি তত্ত্বের দিক দিয়ে সকলেই পূর্ণ ভগবান হলেও রসের অপূর্ণতা আছে বলেই সকলের ভগবত্তাকে স্বয়ং ভগবত্তা বলা চলে না। আর সকল ভগবান স্বয়ং ভগবান নন। রসের দিক দিয়ে যে ভগবানের

প্রকাশ যত বেশী সেই ভগবানের ভগবত্তা তত বেশী। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের মৃদ্ভক্ষণলীলা প্রসঙ্গে শ্রীবালগোপাল যখন মা যশোদাকে বললেন—

নাহং ভক্ষিতবানম্ব সর্ব্বে মিথ্যাভিশংসিনঃ।
যদি সত্যগিরস্তর্হি সমক্ষং পশ্য মে মুখম্॥ ভাঃ ১।৮।২৬

এই যে বালগোপাল মায়ের কাছে বললেন—'আমি তো মাটি খাইনি মা!' এটি তো মিথ্যা কথা বলা হল। এখন গোপালের এই ভাষণের দুটি দিক আছে। একটি হল তত্ত্বের দিক আর একটি রসের দিক—লীলার দিক। তত্ত্বের দিক দিয়ে দেখলে দেখা যাবে গোপাল মিথ্যা কথা বলেন নি। কারণ গোপাল খাবেন কি? যেটি খাবেন সেটি খাদ্য এবং গোপাল খাদক। খাদ্য খাদক ভিন্ন বস্তু হলে তবেই খাওয়া সম্ভব হয়। কিন্তু গোপাল জগতের কোনও বস্তু হতে ভিন্ন নন। অতএব মাটি বলে যে বস্তু যা তিনি খেয়েছেন সেটি তাঁর থেকে ভিন্ন না হওয়ায় তাঁর পক্ষে মাটি খাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। কারণ স্থাস্নু, চরিষ্ণু, মহৎ অথবা অল্প অর্থাৎ স্থাবর জঙ্গম, ক্ষুদ্র বা বৃহৎ কোন বস্তুই অচ্যুত ভিন্ন নয়। কাজেই তত্ত্বের দিক দিয়ে ভগবান ঠিকই বলেছেন। মিথ্যা বলেন নি। মৃত্তিকা যখন স্থাবর জঙ্গম মহৎ বা অল্প হতে ভিন্ন নয় তখন সে মৃত্তিকা অচ্যুত গোপাল হতেও ভিন্ন না হওয়ায় গোপালের পক্ষে মৃত্তিকা ভক্ষণ সম্ভব হয় না। কারণ খাদ্যখাদক ভিন্ন হচ্ছে না। গোপালের বাক্য তাহলে তত্ত্বত সত্য। আর গোপাল যদি মিথ্যাবাদী হন তাহলে উপাসকের উপাসনা ব্যর্থ হয়ে যায়। গৃহত্যাগ করে উপাসক একজন মিথ্যাবাদী বালকের উপাসনা করবে এ সম্ভব হয় না। আর রসের দিক দিয়ে বা লীলার দিক দিয়ে বিচার করলে বলা যায় এমন যদি কোন কৃপাসিঞ্চিত ভাগ্যবান থাকেন যিনি ভগবান বালগোপালকে মিথ্যাবাদী বলেই জেনেছেন তাহলে তাঁর আনন্দের সীমা নেই। শ্রী বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ বলেছেন—বাল্যস্বভাবে তাড়ন ভয়ে গোপালের মায়ের কাছে যে মিথ্যাভাষণ সেটি বাৎসল্যরসের পোষক। এ রস ভক্ত এবং ভগবান উভয়েরই পরম আনন্দের বস্তু। পুত্র যদি সত্যকথাটি সোজাসুজি বলতেন, আমি ভগবান, আমি ও মৃত্তিকা ত ভিন্ন নই। কাজেই আমার পক্ষে মৃত্তিকাভক্ষণ তো সম্ভব নয় তাতে মায়ের তেমন আনন্দ হত না। কিন্তু মায়ের ভয়ে এই যে পুত্রের মিথ্যা

ভাষণ এতেই বাৎসল্য রসের পুষ্টি —মায়ের আনন্দ। তাই গোপালের এই মিথ্যাভাষণ দোষের না হয়ে মহাগুণেই পরিণত হয়েছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে চতুঃশ্লোকে ভগবান বলেছেন—

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যৎযৎসংসৎপরম্।

পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোহবশিষ্যেত সোহস্ম্যহম্॥ ভাঃ ২।৯।৩২

শ্রীজীবপাদ বলেছেন, ভগবান যে সৃষ্টির পূর্ব্বে ছিলেন তিনি তাঁর বিগ্রহ, ধাম, লীলা, পরিকর সকলের সঙ্গে অবস্থান করছিলেন। উদাহরণ দিয়েছেন রাজা গচ্ছতীতি বৎ। রাজা যখন যান তখন তাঁর সঙ্গে সৈন্যসামন্ত, অশ্ব, হস্তী রথ পদাতিক চতুরঙ্গ সেনা ছত্র, চামর দাসদাসী সবই যায়। কিন্তু বলবার সময় বলা হয় রাজা গচ্ছতি। এখানে রাজার রাজা, সম্রাটের সম্রাট শ্রীভগবানের পক্ষে ভগবান বলতে যে তাঁর ধাম, লীলা, পরিকর সকলকে বুঝাবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি? কৃপাসিঞ্চিত ভাগ্যবানের পক্ষে এই রসিকশেখর ভগবানের অনুভূতি হয়ে থাকে। তত্ত্বের চেয়ে রস বড়। অগ্নির স্ত্রী স্বাহা। অগ্নির তাত্ত্বিক দিক্ তার দহনকাজ। তেজস্বিতাই তার স্বরূপ। কিন্তু অগ্নির রসিকতা হল স্বাহা। ভগবান তত্ত্বের ওপর রসিকতাকে নিয়ে থাকেন। কিন্তু রসিকতা স্বাহার কণ্ঠালিঙ্গন করে থাকলেও যেমন অগ্নির তেজস্বিতা স্বরূপের কোন হানি হয় না তেমনি ভগবানের পত্নী রসিকতাকে অবলম্বন করে থাকলেও তাঁর সৎ চিৎ আনন্দ এই তত্ত্বস্বরূপের কোন হানি হয় না।

ধাম্না স্বেন সাদনিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি। ভাঃ ১।১।১

রসিকতাকে নিয়ে থাকলেও ভগবানের কাছে কখনও মায়ার অন্ধকার যায় না। শ্রুতি বলেছেন, 'রসো বৈ সঃ'। রসিকতা ভগবানের প্রিয়জন। তাই তার আনন্দের জন্য ভগবানের যা কিছু চেষ্টা। রসিকতা কখনও একা থাকে না। ভগবান নিত্য রসিকতা আলিঙ্গিত।

শ্রুতি বলেছেন—

একো দেবো নিত্যলীলানুরক্তঃ।

মায়ের ভয়ে শিশুর মিথ্যাভাষণ—এতে বাৎসল্যরসের পুষ্টি। তত্ত্বের অবধি কৃষ্ণচন্দ্র। ব্রজলীলায় এই তত্ত্ব একেবারে চাপা পড়ে গেছে। ঘি যেমন দুধ ভিন্ন অতিরিক্ত কিছু নয়। ঘির উপাদান দুধ। তেমনি রসের উপাদান তত্ত্বই। রস যা হল ঘি আর তত্ত্ব হল দুধ। যার দাম বেশী তাতে

যার দাম কম সেটি অনুগত থাকে। দুধ এক টাকা সের হলে ঘি আট টাকা সের। তাহলে দুধ ঘিতে অনুগত। এখানেও তাই। তত্ত্ব রসের অনুগত। অনুগত অর্থাৎ বাহন। ভগবান তত্ত্বের খবর রাখেন না। রসেই তাঁর প্রীতি। কৃষ্ণ সর্ব্বদাই তত্ত্ব পরিপূর্ণ। রাধা সঙ্গে যখন কৃষ্ণ মিলিত তখনই তিনি রসপরিপূর্ণ। গোপীমণ্ডলমণ্ডিত কৃষ্ণই রসের অবধি। গৌরস্বরূপে রাধাকৃষ্ণ নিত্য মিলিত। শ্রীযমুনাতীরে শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রকট বিহারকালে যুগলের কখনও মিলন ছিল আবার কখনও ছিল বিরহ। কিন্তু গৌরস্বরূপে নদীয়ায় প্রকটবিহারকালে সুরধুনীতীরে রাধাকৃষ্ণমিলিত মুরতির নিত্যবিহার। তাই সুরধুনী অতি গর্ব্বভরে বলেছেন—

দেখে যা লো ও যমুনে
আমার তীরে যুগলের নিত্যবিহার—
আমার তীরে বিহরে গৌরাঙ্গ
হয়ে রাধাকৃষ্ণ এক অঙ্গ
আমার তীরে বিহরে গৌরহরি
রাই সম্পুটে বংশীধারী।

ভগবান জগতে জীবের ভোগের জন্য যেমন বিষয় ব্যবস্থা করেছেন তেমনি বিষয় ত্যাগের উপায় স্বরূপ বিষয় ভোগের তিক্ততাও পাশাপাশি দিয়েছেন এবং এই তিক্ততা বোধ জীবের জাগানোর জন্য ভগবান নিজেই সাধু, গুরু, শাস্ত্ররূপে আবির্ভূত হন। শ্রীগৌর অবতারে প্রধান কাজ হল প্রেমরস আস্বাদন আর আনুষঙ্গে জীবউদ্ধার।

গোদাবরী তীরে শ্রীমন্মহাপ্রভু আজ প্রশ্নকর্ত্তা হয়ে বসেছেন আর বক্তা হয়েছেন শ্রীপাদ রামানন্দ রায়। ভগবানের লীলার এ এক বিচিত্র ভঙ্গী। অর্জ্জুন গীতা এবং উদ্ধবগীতা গ্রন্থে ভগবান স্বয়ং বক্তা আর শ্রোতা হয়েছেন সখা অর্জ্জুন এবং উদ্ধব। সেখানে ভগবান শুধু ভগবানই। কিন্তু ভগবানের আসনে বসে ভগবান দেখলেন এতে তো তেমন সুখ নেই। ভক্ত ভগবানকে ভোগ করে যে আনন্দে মত্ত হয়ে থাকে সে আনন্দ তো ভগবানে নেই। সেই আনন্দ পাওয়ার জন্য ভগবানের লোভ হল। সেই লোভে লোভে ভগবান গৌরলীলায় ভক্তকূলচূড়ামণি হয়ে বসেছেন। তাই গৌর শুধু ভগবান নন—তিনি ভক্ত ও ভগবান দুইই। লীলাসৌষ্ঠবের জন্য ভগবান আজ ভক্ত সেজেছেন দেখছেন এতে কেমন সুখ। ভক্ত

ভগবানকে ভোগ করে যে আনন্দ পায় তাতে সে জগৎ ভুলে যায় কিন্তু ভগবান তো তাঁর আনন্দে জগৎ ভুলতে পারেন না। তাই ভক্তের আনন্দ পাওয়ার জন্য ভগবানের আজ লোভ হয়েছে। পদমর্য্যাদাও তাই আজ পরিবর্ত্তিত হয়েছে। ভগবান নিজে হয়েছেন শ্রোতা আর বক্তার আসনে বসিয়েছেন ভক্তপ্রবর রামানন্দ রায়কে। ভক্তের শ্রীমুখে শাস্ত্রকথা কত মধুক্ষরণ করে তাই শুনবার জন্য ভগবানের লোভ।

শ্রীপাদ রামানন্দ রায়ের কাছে শ্রীমন্মহাপ্রভুর যে প্রশ্ন এটি নিজের রস আস্বাদনের জন্য। রস আস্বাদন দু'রকমের হতে পারে। একটি কেবলমাত্র নিজের ভোগের জন্য যেমন দুধ বা অন্য কোন বস্তু (তজ্জাতীয়) আস্বাদন এটি কেবল মাত্র নিজের তৃপ্তি। আর একটি হল নিজের আস্বাদন কালে নিজের তৃপ্তিসাধন তো করেই আবার আনুষঙ্গে অনেকের তৃপ্তি সাধন করে। যেমন সঙ্গীতরস—এ রস তো একা একা আস্বাদন করা যায় না। একা আস্বাদন করতে গেলেও অর্থাৎ অন্যকে রসদানের সঙ্কল্প না থাকলেও আনুষঙ্গে কিন্তু অনেকের শ্রবণেন্দ্রিয় ও হৃদয়কে তৃপ্তি দান করে। তাই গোদাবরী তীরে শ্রীপাদ রামানন্দ সন্নিধানে শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে রস আস্বাদনে মগ্ন—কারণ এইটিই মহাপ্রভুর হার্দ্য তখন কলিজীবও গৌরের এ রস পেয়ে ধন্য হল। কলিজীবকে রসদান করা কিন্তু গৌরের সঙ্কল্প নয়। কিন্তু আনুষঙ্গে হয়ে গেল। রস আস্বাদনই মহাপ্রভুর হার্দ্য এ কথা বলা হল কেন?

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ বলেছেন—

কৈছন রাধাপ্রেমা কৈছন মধুরিমা
কৈছন সুখে তিহ ভোর
এ তিন বাঞ্ছিত ধন ব্রজে নহিল পূরণ
কি করিবে না পাইয়া ওর।
তখন ভাবিয়া দেখিলা মনে শ্রীরাধার স্বরূপ বিণে
এ বাসনা পূর্ণ কভু নয়
তাই রাধাভাব কান্তি ধরি রাধাপ্রেম গুরু করি
নদীয়াতে করল উদয়॥

তিন বাঞ্ছা—ব্রজে যা অপূর্ণ ছিল—সেই অপূর্ণ সাধ পূরণের অভিলাষেই তো গৌরের প্রকাশ। কিন্তু এ রস আস্বাদন এমন জিনিষ যে একা ভোগ

করতে পারে না। ভোগ করলেই ভোগ দেওয়া হয়ে যায়। তাই যে বস্তুটি ভগবানের নিজস্ব সেটি আনুষঙ্গে জীব পেয়ে গেল। শ্রীল বাবাজী মহারাজের শ্রীমুখের বাণী—লঙ্কার গাড়ী এক মহাজনের ঘর থেকে বেরিয়ে অন্য মহাজনের ঘরে যাবে এই তার সঙ্কল্প কিন্তু সে যখন রাস্তা দিয়ে যায় তখন রাস্তার লোককে সেই লঙ্কার ঝাঁঝে হাঁচান তার সঙ্কল্প নয়। কিন্তু আনুষঙ্গে সেটি হয়ে যায়। আতরের দোকানে আতর তার গরব নিয়েই থাকে। অন্য লোকের নাসিকা মাতান তার সঙ্কল্প নয়। কিন্তু আনুষঙ্গে সেটি হয়ে যায়। এ সব হল স্বভাবের ক্রিয়া। তেমনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিজ মাধুরী আস্বাদনের সঙ্কল্পে আনুষঙ্গে জীব উদ্ধার কাজটি হয়ে গেল। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রশ্নের মূলে তাঁর নিজ আস্বাদনের পরিপাটি।

শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রশ্ন করছেন তার উত্তরে রামানন্দ কথা বলছেন এটি মনে করলে ভুল হবে। কারণ সে সংশয় শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ নিজেই নিরাকরণ করেছেন তাঁর বন্দনা গীতিতে। রামানন্দকে মেঘ বলেছেন, মেঘের জল তো তার নিজস্ব নয়—সাগরের জলই মেঘরূপে সঞ্চারিত হয়। তেমনি গৌর প্রেমসাগরের তাঁরই নিজস্ব ভক্তিসিদ্ধান্ত-চয়ামৃতানি (ভক্তি সিদ্ধান্ত জলই) রামানন্দ মেঘ থেকে বর্ষিত হচ্ছে।

মহাপ্রভু যে স্বয়ং ভগবান শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ভাল করেই জানেন। তাঁর কোন সন্দেহই নেই। গৌরসুন্দরকে যে সার্ব্বভৌম বেদান্ত শিক্ষা দিচ্ছেন এও এক পরম কৃপা। মহাপ্রভু তাঁকে প্রথমে চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে পরে দ্বিভুজ মুরলীধর মূর্ত্তিতে দর্শন দান করেন। মহাপ্রভুর নামে সার্ব্বভৌম এতই শ্রদ্ধা জাগে যে কৃষ্ণনাম অথবা কৃষ্ণ উপাসনা পর্য্যন্ত তাঁর কাছে ব্যর্থ হয়ে যায়। এ সব তাঁর আর প্রয়োজন ছিল না। তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শচীসুত গুণধাম।
আমাদের এই জপ এই তপ এই লব নাম ॥

শ্রীপাদ রামানন্দ রায়ের সঙ্গে যে গৌরসুন্দরের সংবাদ এ ঘটনা সার্ব্বভৌম প্রেরিত এক প্রত্যক্ষদর্শী ব্যক্তি সার্ব্বভৌম ও মহারাজ প্রতাপরুদ্রের সামনে বর্ণনা করেছেন। সার্ব্বভৌম মহাপ্রভুর তত্ত্ব এবং স্বরূপ সম্বন্ধে জানেন না তা নয়। কিন্তু লীলা এমনই মধুর যে তার

মাঝে তত্ত্ব হারিয়ে যায়। এইখানেই লীলার বাহাদুরী। লীলা যদি তত্ত্বের ওপরে না দাঁড়াতে পারে তাহলে লীলার পরিপাটি হল না। শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত গ্রন্থে শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ বর্ণনা করেছেন শ্রীগোলোকধামেও শ্রীবৃন্দাবন লীলার সব অনুষ্ঠান হন। গোলোকে কালীয়দমন লীলার অনুষ্ঠান কালে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র যেমন কালিয় হ্রদে প্রবেশ করলেন,—কালিয় নাগের বিষের জ্বালায় চারশত হাত দূরেও কেউ যেতে পারত না। আকাশের পাখী উড়ে গেলে বিষের জ্বালায় অস্থির হয়ে মরে যেত। কৃষ্ণ জলে প্রবেশ করেছেন এ খবর পেয়ে নন্দবাবা, যশোদা মা এতই ব্যস্ত হয়েছেন যে ছুটে এসেছেন। সকল ব্রজবাসী কেঁদে আকুল। তাঁরা কৃষ্ণকে খুঁজবার জন্য জলে ঝাঁপ দেবেন ঠিক করেছেন—বলদেবের শত বাধা শত সান্ত্বনা সত্ত্বেও তাঁরা প্রবোধ মানছেন না। বলরাম তো তত্ত্বজ্ঞ কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তত্ত্বজ্ঞ (কৃষ্ণতত্ত্বজ্ঞ) বলরামও কেঁদে আকুল। কৃষ্ণচরণে প্রার্থনা জানালেন—'তুমি দেখা দাও! ব্রজবাসীর যে প্রাণ যায় তোমার অদর্শনে।' কৃষ্ণতত্ত্ব সম্বন্ধে বলদেবের কোন অজ্ঞতা না থাকলেও লীলার মাঝে তত্ত্ব হারিয়ে গেল। লীলার মাদকতায় তত্ত্ব থাকতে পারে না। তারপর কৃষ্ণ যখন দর্শন দিলেন তখন ব্রজবাসী শান্ত হলেন।

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যও মহাপ্রভুর তত্ত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিত। কিন্তু তত্ত্বের চেয়ে লীলা বড়। তাই মহাপ্রভুর দক্ষিণদেশ গমনকালে ভট্টাচার্য্য দুজন লোক মহাপ্রভুর সঙ্গে দিয়েছেন—যাতে মহাপ্রভুর কষ্ট না হয় এবং দক্ষিণদেশে যে মহাপ্রভুর পতিত উদ্ধার লীলা হবে তা স্বচক্ষে দর্শন করে এসে ভট্টাচার্য্যকে জানাতে পারবে। দৌবারিক মুখে রামানন্দ মিলন প্রসঙ্গ-আনন্দ ভট্টাচার্য্য ও মহারাজ প্রতাপরুদ্র উপভোগ করছেন।

ভগবান আজ শিষ্যের প্রশ্নকারীর আসনে বসেছেন। রাজা আজ প্রজার আসনে বসেছেন। ভগবান শ্রীগোবিন্দ নিজমুখে উদ্ধবজীর কাছে বলেছেন—আমিই গুরু, আমিই বন্ধু। সেই গুরু আজ শিষ্য হয়ে বসেছেন লীলার বিচিত্র পরিপাটি। শ্রীমন্মহাপ্রভু রামানন্দ রায়ের উত্তরে বড় প্রীত হয়েছেন।

তৃতীয় ধারা

প্রশ্নোত্তরের প্রথম পর্যায়

স্বয়ং ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর সর্ব্বরসের ভোক্তা—শুধু ভোক্তা নন অশেষ বিশেষ ভোক্তা। পরিপাটি করে ভোগ করেছেন। কারণ যিনি রস আস্বাদন করতে জানেন, রস আস্বাদনের পরিপাটি বোঝেন, তিনি নানাভাবে রস আস্বাদন করেন। একজন ব্যক্তি হয়ত দিনে আড়াই সের দুধ খেয়ে হজম করতে পারেন কিন্তু আস্বাদনের পরিপাটি না বুঝলে শুধু দুধই আড়াই সের খান। আর যিনি রস আস্বাদনের পরিপাটি জানেন তিনি কি শুধু দুধই খান—তা খান না। ঐ দুধ থেকে ছানা, ক্ষীর, দই, সর, সন্দেশ নানা পরিপাটি করে খান।

রসের সাগর রামানন্দ রায় সন্নিধানে আজ রসিকশেখর শ্রীগৌরসুন্দর বসেছেন। দুইজনেই রসধারায় স্নাত হচ্ছেন। এর মধ্যে একজন রসদাতা আর একজন রসভোক্তা। একজন রস যোগান দিচ্ছেন আর একজন আস্বাদন করছেন। একজন পরিবেষ্টা আর একজন ভোক্তা। কিন্তু আস্বাদন করে করে ভোক্তার যেন আর কিছুতেই তৃপ্তি হচ্ছে না। পেটুক লোকের যেমন হয়, কিছুতেই পেট আর ভরে না। পেটুক লোক যেমন বলে 'আরও দাও আরও দাও'—তেমনি রসপেটুক, রসলম্পট শ্রীমন্মহাপ্রভুও বলছেন—আরও বল, আরও বল।

নমস্কার কৈল রায়, প্রভু কৈল আলিঙ্গনে।
দুইজনে কৃষ্ণ কথা কয় রহঃস্থানে॥

প্রভু রামানন্দ সংবাদ—এর মূল কথা হল সাধ্যসাধন জিজ্ঞাসা। 'সাধ্য' বলতে বুঝায় যা পেতে হবে—আর 'সাধন' বলতে বুঝায় যা দিয়ে পেতে হবে। এই সাধ্য সাধন জিজ্ঞাসাতেই ধর্মজীবনের আরম্ভ।

প্রভু কহে,—'পড় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয়।'
রায় কহে,—'স্বধর্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি হয়॥

ভগবানের পাদপদ্মে শ্রদ্ধা ভক্তিই মানুষের জীবনে একমাত্র প্রয়োজন একেই সাধ্য বলা হয়েছে—ভক্তিরই পরিপাক দশার নাম প্রেম। যেমন দুধের ঘন অবস্থার নাম ক্ষীর। গৌরসুন্দর বলেছেন—'সন্ন্যাসে কি কাম মোর প্রেম প্রয়োজন।' এখন এই প্রেমলাভের উপায় কি এইটিই মহাপ্রভুর

প্রশ্ন। রামানন্দ বললেন—স্বধর্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি হয়। মানুষ যদি নিজ নিজ বর্ণধর্ম, আশ্রমধর্ম পালন করে তাহলে ভক্তিলাভ হয়। চারটি বর্ণ—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এবং চারটি আশ্রম—ব্রহ্মচারী, গৃহস্থী, বাণপ্রস্থী, সন্ন্যাসী—এঁদের নিজের নিজের যে ধর্ম পালন তার নামই স্বধর্মাচরণ। মহাপ্রভু প্রশ্ন করেছেন 'পড় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয়।' তার তাৎপর্য্য হল ভগবানকে সন্তুষ্ট করা যায় যা দিয়ে তাকেই সাধ্যবস্তু বলা হবে। রামানন্দ প্রভুর মর্ম বুঝে বললেন—মানুষ নিজ নিজ বর্ণধর্ম আশ্রমধর্ম—অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য শূদ্র এবং ব্রহ্মচারী, গৃহস্থী, বাণপ্রস্থী ও সন্নাসীর যে যে ধর্ম শাস্ত্র বলেছেন সেই সেই ধর্ম যদি ঠিক ঠিক আচরণ করে তাহলে ভগবান সন্তুষ্ট হন। এটি না করতে পারলে মানুষের জীবনে ব্যভিচারের ফলে প্রত্যবায় এবং নরকগমন হয়। পরমার্থ পথ ধরতে হলে প্রথমেই ধর্মজীবনের প্রয়োজন। ধর্ম পৃথক পৃথক স্বভাবের মানুষের জন্য স্বভাবতঃ পৃথক্ পৃথক্।

মানুষের জন্ম, সংসর্গ, শিক্ষা থেকে স্বভাবের প্রকাশ পায়। স্বভাব অনুসারে বর্ণ স্বীকার করতে হয়। ঈশ্বর এবং বিদ্যাই যাঁদের স্বভাবগত বিষয় তাঁরাই ব্রাহ্মণ, বীরত্ব ও রাজ্যশাসনই যাঁদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি তাঁরা হলেন ক্ষত্রিয়। কৃষি, পশুপালন, বাণিজ্য যাঁদের স্বভাবতগত ধর্ম তাঁরা বৈশ্য আর ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য—এই ত্রিবর্গের সেবামাত্রই যাঁদের স্বভাব তাঁরা হলেন শূদ্র। এইভাবে ব্রহ্মচারীর গুরুগৃহে বাস, গুরুসেবা, গৃহস্থীর গার্হস্থ্যধর্ম পালন, বানপ্রস্থীর বনবাসধর্ম পালন—এবং সন্ন্যাসীর সর্ব্বস্ব ত্যাগ করে সন্ন্যাসধর্ম পালন—এই স্বধর্মাচরণই বিষ্ণুভক্তি লাভের উপায়।

রামানন্দের এ সিদ্ধান্তে মহাপ্রভু সন্তুষ্ট হতে পারেন নি কারণ যত স্বধর্ম আচরণই হোক সবই প্রাকৃত—কোনটি ভগবৎসম্পর্কী হচ্ছে না—তাই তা দিয়ে কৃষ্ণভক্তি কি করে পাওয়া যাবে? তাই প্রভু বললেন—

প্রভু কহে, 'এহো বাহ্য, আগে কহ আর।'
রায় কহে, 'কৃষ্ণে কর্মার্পণ সর্ব্বসাধ্যসার॥'

প্রভু বললেন, স্বধর্মাচরণ—এতো বাইরের কথা এর উপরে আরও কিছু বল। তখন রামানন্দ প্রভুর মন বুঝে বললেন—সেই কর্ম যদি কৃষ্ণে সমর্পিত হয় তাহলে এইটিই সাধ্যসার।

শ্রীমদ্ভগবদগীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র অর্জ্জুনদেবকে উপলক্ষ্য করে বলেছেন—যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।

যত্তপস্যাসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥ গী ৯।২৭

ভগবান বললেন—অর্জ্জুন, তুমি যা কিছু করবে—যা ভোজন করবে, যে যাগযজ্ঞ করবে, যা দান করবে, যা তপস্যা করবে সে কর্মফল আমাতে সমর্পণ কর। ত্যাগধর্মে হরিতুষ্টি লাভ হয় এবং এই হরিতুষ্টি পরম ধর্ম—তাই রামানন্দ কৃষ্ণে কর্ম সমর্পণে বিষ্ণুভক্তি হবে এই সিদ্ধান্ত করলেন। মহাপ্রভু কিন্তু তাতে সন্তুষ্ট হতে পারেন নি—কারণ তাঁর লক্ষ্যস্থানে পৌছুতে এখনও অনেক দেরী তাই বললেন—

প্রভু কহে,—'এহো বাহ্য আগে কহ আর।'
রায় কহে,—'স্বধর্ম ত্যাগ, এই সাধ্যসার॥'

কারণ কেবল ফলত্যাগ করলেই শুদ্ধাভক্তি হয় না। স্বধর্ম ত্যাগ করে ভগবানের চরণে শরণাগতি নিতে পারলে সেইটি শুদ্ধাভক্তির প্রথম সোপান। স্বধর্ম ত্যাগ করে শরণাগতির কথা ভগবান গীতাবাক্যে অর্জ্জুনদেবকে উপলক্ষ্য করে বলেছেন—

সর্ব্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥
গীঃ ১৮।৬৬

নিজ নিজ বর্ণধর্ম আশ্রমধর্ম ত্যাগ করে আমার শরণাপন্ন হও—ভগবানের এই বাক্য অর্জ্জুনের মনে এক বিরাট সংশয়—প্রশ্ন করলেন, মানুষ যদি স্বধর্মত্যাগ করে তাহলে অকারণে প্রত্যবায় জনিত দোষ হবে না? পাপ হবে না? ভগবান বললেন—অর্জ্জুন, যদি স্বধর্ম ত্যাগ করে আমার শরণাপন্ন হয় তাহলে কোন পাপ হবে না। তবু যদি তুমি পাপ হবে বলে মনে কর তাহলে আমি কথা দিচ্ছি তাকে সকল রকম পাপ থেকে আমি উদ্ধার করব—তোমার কোন চিন্তা নেই। শুধু ফলত্যাগ নয় এর দ্বারা বুঝা গেল কর্মত্যাগই হল ত্যাগ—এইটিই ভগবানের অভিলষিত—কর্ম করে ফল ত্যাগ কর না, তাতেও কর্ম করার জন্য একটু অভিমান রইল তাই কর্মও ত্যাগ কর। তাতে আর অহংভাব অর্থাৎ আমিত্ব থাকবে না।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীগোবিন্দজী উদ্ধবজীর কাছেও বলেছেন—

আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্ম্মান্ সংত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ॥
ভাঃ ১১।১১।৩২

ভগবান বলছেন,—উদ্ধব, যে সাধক প্রকৃত কর্মের গুণ দোষ ভালভাবে জেনেছে শাস্ত্রে এ সব আদেশ আমারই তাও ভাল করে জানে, কিন্তু জেনেও যে সবধর্ম ত্যাগ করে আমার ভজনা করে তাকেই আমি প্রকৃতপক্ষে সাধু বলি।

তাই মূল কর্মত্যাগই ভগবানের হার্দ্য।

কিন্তু রসলোলুপ শ্রীগৌরসুন্দর এত সামান্যে সন্তুষ্ট হতে পারেন না। কারণ তাঁর লক্ষ্যস্থানে পৌঁছতে যে এখনও অনেক দেরী, এখানেই থামলে চলবে কেন? তাই বললেন—

প্রভু কহে,—'এহো বাহ্য, আগে কহ আর।'
রায় কহে,—'জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি সাধ্যসার॥'

রামানন্দ দেখলেন কর্মে যখন মহাপ্রভু সন্তুষ্ট হতে পারেন নি—তখন কর্মের উপরে তো জ্ঞান—তাহলে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি সাধ্যসার এটি বললে বোধহয় মহাপ্রভু সন্তুষ্ট হবেন। কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দর তাতেও সন্তুষ্ট নন। বললেন:—

প্রভু কহে,—'এহো বাহ্য, আগে কহ আর।'
রায় কহে,—'জ্ঞানশূন্যা ভক্তি সাধ্যসার॥'

শ্রীমহাপ্রভুর মন বুঝে রায় উত্তর দিলেন—জ্ঞানশূন্যা ভক্তি সাধ্যসার। কারণ শুদ্ধাভক্তি অর্থাৎ খাঁটি ভক্তিতে আবার জ্ঞানকন্টক কেন? শ্রীকৃষ্ণে সম্পূর্ণ শারণাগতিই শুদ্ধাভক্তির লক্ষণ—সেখানে জ্ঞানকর্ম কোন বাধাই তো থাকবে না।

বাক্‌পতি ব্রহ্মমোহনলীলার পরে শ্রীবালগোপালের স্তুতি প্রসঙ্গে বলেছেন—

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সম্মুখরিতাং ভবদীয় বার্ত্তাম্।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্‌মনোভি—
র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্॥
ভাঃ ১০।১৪।৩

ব্রহ্মা বলছেন,—'প্রভু তোমার যারা শুদ্ধ ভক্ত তারা বড় চতুর। কথাও আছে—"যেই জন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর।" এ চতুরতা কিসের চতুরতা? ভক্ত পথ ঘোরে না। তাহলে ভগবানের কাছে পৌঁছুতে দেরী হবে। তারা জ্ঞান বা যোগের পথে যায় না। তাতে পরিশ্রম আছে অথচ ফল নেই। তাই ভক্ত জ্ঞান বা যোগের পথে যায় না—'উদপাস্য' পদে শ্রীজীবগোস্বামিপাদ অর্থ করলেন—কিঞ্চিদপি অকৃত্বা। শুদ্ধভক্ত তোমাকে সহজে পাবার দুটি উপায় বেছে নিয়েছে—(১) অবিচারে কায়মনোবাক্যে সর্ব্বত্র মাথাটাকে নত করা অর্থাৎ প্রণাম আর (২) সাধুমুখে হরি এবং হরিভক্তের কথা শ্রবণকে জীবনধারণের উপায় করে নিয়েছে। ব্রহ্মা বেদবক্তা—তাঁর ভাণ্ডারে তো বাণীর অভাব নেই। হরি এবং হরিভক্তের কথা শ্রবণ শুধু বললেন না—বললেন জীবনধারণের উপায়। শ্রবণ এবং জীবনধারণের উপায়—এই দুটির মধ্যে তফাৎ আছে। শুধু শ্রবণ অর্থাৎ শুনলেও হয় না শুনলেও হয় কিন্তু জীবনধারণের উপায় বললে তা বুঝায় না—জীবনধারণের উপায় অন্নজল গ্রহণ যেমন একদিন না করলেই নয়—তেমনি ভগবানের কথা ভক্তের একদিন না শুনলেই নয়। এইটিকে লক্ষ্য করে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ বললেন—

কৃষ্ণনামামৃত বিনে খায় যদি অন্নপানে
তবু ভক্তের দুর্ব্বল জীবন।

ভক্ত যতই চর্ব্ব চোষ্য লেহ্য পেয় ভোজন করুক না কেন—যদি কোন একদিন ভবানের কথা শুনতে না পায় তাহলে তার প্রাণ যেন বাঁচে না। এর নাম হল কথাকে জীবনধারণের উপায় করে রাখা।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে—এ কথা কোথায় থেকে শুনবে? ব্রহ্মা বললেন—স্থানেস্থিতাঃ—স্থান বলতে নিজ নিজ আশ্রম—ব্রহ্মচারী ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে থেকে, গৃহস্থী তার গার্হস্থাশ্রমে থেকে, বাণপ্রস্থী তার নিজের আশ্রমে থেকে এবং সন্ন্যাসী তার সন্নাস আশ্রম থেকে হরিকথা শুনবে। শ্রীজীবগোস্বামিপাদ এর উপরে সূক্ষ্মভাবে বিচার করেছেন—যিনি যে আশ্রমে আছেন সেখানে থেকেই হরিকথা শুনতে পারেন বটে কিন্তু হরিকথা তো যেখানে সেখানে পাওয়া যায় না, হরিকথার একটাই জায়গা সেটি হল 'সতাং সঙ্গতিঃ।' সাধুসঙ্গ ছাড়া ভগবানের কথা মেলে না। তাই ভগবানের কথা পেতে হলে সাধুসঙ্গ করতে হবে। শ্রীল নরোত্তম

ঠাকুরমশাই বলেছেন—

বৈষ্ণব সঙ্গেতে মন আনন্দিত অনুক্ষণ
সদা হয় কৃষ্ণ পরসঙ্গ।

এখন ভগবানের কথা শ্রবণ কিভাবে হবে—তার প্রকারটি ব্রহ্মা বললেন—শ্রুতিগতাম্। কথা যদি কৃপা করে কানে প্রবেশ করেন তাহলেই শোনা যাবে নতুবা নয়। কারণ কথার কাছে বসলেই যে কথা কানে যাবে তা বলা যাবে না, ঘুম পাবে বা অন্যমনস্ক থাকবে। কথা হয়ে গেল কানে গেল না—হরিকথা হলেন মহাদেবী। তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে হবে—"হে হরিকথা মহাদেবী, তুমি কৃপা করে আমার কানে প্রবেশ করো।" কথা কানে প্রবেশ করা—এটি হল কথার স্বাতন্ত্র্য—যে শুনছে তার স্বাতন্ত্র্য নয়। আরও একটি প্রশ্ন এ বিষয়ে হতে পারে ব্রহ্মা ভবদীয়বার্ত্তা বললেন কেন? ভবদীয় বলতে ভগবানের নিজজনকে বুঝাচ্ছে। অর্থাৎ ভক্তজন। তাহলে তাৎপর্য্য হল ভগবানের কথা তো শুনতে হবেই তার সঙ্গে ভক্তকথাও শুনতে হবে। কেন? ভগবানের কথাই শুনতে হবে আবার ভক্তকথা কেন? তাতে মহাজন সিদ্ধান্ত করেছেন—ভগবানের কথা নাম পরম মহৌষধ কিন্তু ভক্তচরিত্র তাতে অনুপানের কাজ করে। যেমন কবিরাজী বড়ি শুধু খেলে হবে না তাতে অনুপান মিশিয়ে সেবন করলে তবে ফল। তেমনি ভগবানের কথা ঔষধ বটে কিন্তু ভক্তকথা তাতে অনুপান। কারণ ভগবানের লীলা অলৌকিকী—মানুষ শুনবে কিন্তু অনুকরণ করতে পারবে না। কিন্তু ভক্তের কথা মানুষ অনুসরণ, অনুসরণ করতে পারবে। ভক্তজীবনই তো আদর্শ। ভক্তও তো আমাদেরই মত মানুষ—তাঁরা কিভাবে ভজন করে ভগবানকে পেয়েছেন মানুষ জানতে পারলে সেইভাবে আচরণ করতে পারবে—এটি জীবের শিক্ষাস্থল।

ব্রহ্মা যে কায়মনোবাক্যে প্রণামের কথা বললেন সেটি কি রকম? শরীর দিয়ে প্রণাম আমরা জানি—পঞ্চাঙ্গ প্রণাম, সাষ্টাঙ্গ প্রণাম, দণ্ডবৎ প্রণাম। বাক্য দিয়ে প্রণাম—প্রণামের সময় আমি আপনাকে প্রণাম করছি এই কথাটি জিহ্বায় উচ্চারণ করবে। আর মন দিয়ে প্রণামের অর্থ হল আস্তিক্য বুদ্ধির দ্বারা গ্রহণ অর্থাৎ যাঁকে প্রণাম করছে তাঁকে শ্রদ্ধা করে প্রণাম—প্রকৃষ্টরূপে নত হওয়ার নাম প্রণাম। শুধু দেহকে নত করা নয় মনটিকেও নত করা।

যদি প্রশ্ন হয়, ভক্ত যে এইভাবে আচরণ করে—এই সহজ পন্থা দুটি বেছে নিল—তার ফল কি পায়? ব্রহ্মা ভগবানের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন, কাজেই এতে কোন ত্রুটি নেই। একে ব্রহ্মার সিদ্ধান্ত তার ওপর ভগবানের অনুমোদিত। কারণ ব্রহ্মার সিদ্ধান্তের ওপরে ভগবানের কোন প্রতিবাদ নেই। ব্রহ্মা বলছেন,—'প্রভুভক্ত যে এই দুটি পথ বেছে নিয়েছে তোমাকে পাবার উপায় স্বরূপ—তারা কি ফল পায় জান? তারা কায়মনোবাক্যে অর্থাৎ শরীর দিয়ে বাক্য দিয়ে এবং মন দিয়ে তোমাকে জয় করে। ব্রহ্মা ভগবানকে 'হে অজিত' বলে সম্বোধন করেছেন অথচ বললেন, 'তুমি ঐ ভক্তের কাছে কায়মনোবাক্যে জিত হও।' ভগবানের পক্ষ হয়ে টীকাকার গোস্বামিপাদ ব্রহ্মার বাক্যে দোষ ধরেছেন—'ব্রহ্মণ, তুমি যে আমাকে অজিত বললে—অর্থাৎ আমাকে কেউ জয় করতে পারে না অথচ আবার বলছ আমি ভক্তের কাছে কায়মনোবাক্যে জিত হই। এই কেমন তোমার কথা? আমি অজিত এবং জিত দুইই কি করে হব? হয় বল অজিত না হয় বল জিত।' ব্রহ্মা বলছেন, 'প্রভু আমি ভুল বলিনি তুমি অজিত আবার জিত দুইই। তুমি স্বরূপে অর্থাৎ তত্ত্বে অজিত এটি ঠিক, আবার লীলায় অর্থাৎ রসে তুমি ভক্তের দ্বারা জিত হও এও ঠিক। এত দোষ হবে না। কারণ তত্ত্বের ওপরে লীলার স্থান। তত্ত্বের ওপরে যদি লীলা না দাঁড়ায়, তাহলে লীলার গৌরব থাকে না। আর ভক্ত যে তোমাকে ভক্তি দিয়ে জয় করে সেই ভক্তিমহারাণীর স্বরূপ এবং তোমার স্বরূপ তো ভিন্ন নয়। কারণ ভক্তিমহারাণী সচ্চিদানন্দময়ী আর তুমিও তো সচ্চিদানন্দময়। তাই তোমার স্বরূপ দিয়েই তোমাকে জয়, এতে তোমার 'অজিত' নামের হানি হবে না। তুমি 'অজিত'ই রইলে আবার ভক্তও তোমাকে জয় করল। যেমন নিজের ডানহাত দিয়ে কেউ যদি নিজের বাঁ হাতখানি চেপে ধরে তাহলে কেউ যেমন বলে না তার বন্ধন ঘটেছে, কেউ তার বাঁধন খুলতে আসে না কারণ তার নিজেরই বাঁ হাত—এতে আবার বন্ধন কিসের? এখানেও তেমনি। ভক্তির দ্বারা ভগবানকে জয় করা অর্থাৎ ভগবানের নিজের স্বরূপ দিয়েই তাঁকে জয় করা—এতে ভগবানের 'অজিত' নাম বজায় থাকবে। এতে দোষ হবে না।'

এখানে জ্ঞান যোগ কর্ম বাদ দিয়ে যে ভক্তি—এরই নাম শুদ্ধা ভক্তি,

একা ভক্তি, নিষ্কামা ভক্তি, কেবলা ভক্তি, অহৈতুকী ভক্তি, অব্যবহিতা ভক্তি যা বলা যায়। শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ যার নাম দিয়েছেন উত্তমাভক্তি। লক্ষণে বললেন—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

অন্যাভিলাষিতাশূন্য বলতে যে ভক্তিতে অন্য কোন কামনা বাসনা থাকবে না—ধর্ম, অর্থ কাম বাঞ্ছা তো বটেই এমনকি মুক্তিবাসনাও থাকবে না। ধর্ম অর্থ কাম বাঞ্ছা থাকলেও তা ভোগ করে করে তার নশ্বরতা দেখে কোনদিন যদি তার ওপর সাধুগুরু বৈষ্ণবের কৃপা হয় তাহলে বাসনা ত্যাগ করে সে ভক্তি পথে আসতেও পারে কিন্তু যার হৃদয়ে মুক্তি বাসনা থাকে তার হৃদয়ে ভক্তিমহারাণীর আবির্ভাব কখনও সম্ভব হয় না। শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ বলেছেন—

ভুক্তি মুক্তি স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।

যে হৃদয়ে ভুক্তি মুক্তি বাসনা ধৃষ্টা চণ্ডালিনী থাকে সে হৃদয়ে শুদ্ধা সাধ্বী ব্রাহ্মণী ভকতিদেবী কখনও যান না। তাই শ্রীগোস্বামিপাদের শুদ্ধা বা উত্তমা ভক্তি লক্ষণে মুক্তিবাসনাকেও বাদ দেবার কথা বলা হয়েছে। কারণ সাধারণতঃ সকল দর্শনের মুক্তির লক্ষণ হল জন্ম এবং মৃত্যু বন্ধ হয়ে যাওয়া। জন্মমৃত্যু নিরোধের নাম মুক্তি এইটিই সকল আস্তিকদর্শন স্বীকার করেন। অবশ্য শ্রীমদ্ভাগবতদর্শনের মতে মুক্তির লক্ষণ একটু অন্যরকম। কারণ জন্মমৃত্যু নিরোধ রূপ যে মুক্তি তাতেও একটু ত্রুটি থেকে যাচ্ছে তাই শুদ্ধ ভক্ত এই মুক্তি চায় না তো বটেই—বরং নরকের মত ঘৃণ্য বোধ করে। কারণ এ মুক্তি পেলেও জীবের যে আসল রূপ 'জীব নিত্য কৃষ্ণদাস'—এ স্বরূপানুভূতি হচ্ছে না—এই দাস স্বরূপানুভূতিই যদি না হয় তাহলে জীব ভগবানের পাদপদ্মে সেবাসুখ পাবে কি করে? কারণ দাসই তো সেবা করবে এইটি হচ্ছে সাধারণের মতে মুক্তিতে ত্রুটি। তাই এই মুক্তি ঘৃণ্য। ভক্ত অর্থাৎ জন্মমৃত্যু বন্ধ চায় না, বরং প্রার্থনা করে—

আসিব যাইব চরণ সেবিব
তুমি আর নিত্যানন্দ বিহরিবে যথা।
এই কর জন্মে জন্মে ভৃত্য হই তথা॥

শ্রীমদ্ভাগবতদর্শন সাধারণের মতে মুক্তির লক্ষণের ত্রুটিটুকু সমাধান করে মুক্তির লক্ষণ করেছেন—"মুক্তিহিত্বাহন্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ।" আসল মুক্তি হল জীবের অন্যথারূপ ত্যাগ করে নিজের স্বরূপে ফিরে আসা। জীব যদি নিজের স্বরূপানুভূতি লাভ করে অর্থাৎ যদি নিজেকে নিত্য কৃষ্ণদাস বলে উপলব্ধি করতে পারে তাহলেই তার আসল মুক্তি হল। আর উত্তমা লক্ষণে যে বলা হল, 'জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্'—জ্ঞান এবং কর্মের আড়াল থাকবে না—অর্থাৎ শুদ্ধা ভক্তিতে জ্ঞান ও কর্মকে বাদ দিতে হবে। ব্রহ্মা বললেন—

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য

এ কোন জ্ঞান, কোন কর্ম? কারণ জ্ঞানের পরিপাকদশার নামই তো ভক্তি। জ্ঞান মানে জানা আর ভক্তি মানে ভালবাসা। ভালবাসা তো জানা ছাড়া হয় না। কারণ কাউকে ভালবাসতে গেলে তো জানতে হবে। তেমনি ভগবানকে ভালবাসা অর্থাৎ ভক্তি করতে হলে তাকে তো জানতে হবে—ভগবানকে না জানলে ভালবাসা যাবে কি করে? তখন মহাজন বলছেন—উত্তমা ভক্তি বা শুদ্ধা ভক্তি থেকে ভগবজ্জ্ঞান বাদ দেবার কথা বলা হয় নি। কারণ ভগবানে ভক্তিতে ভগবানের জ্ঞান তো থাকবেই। তবে এ কোন জ্ঞান? এ হল নির্ভেদ ব্রহ্মজ্ঞান যা অদৈত বেদান্তী প্রতিপাদন করেছেন—'অহং ব্রহ্মাস্মি (ঋগ্বেদ) তত্ত্বমসি (সামদেব) প্রজ্ঞানং ব্রহ্মা (যজুর্বেদ) এবং অয়মাত্মা ব্রহ্ম (অথর্ব্ববেদ) চারবেদের চারটি মহাবাক্যের প্রতিপাদন করেছেন—অদ্বৈতপক্ষে জীব ব্রহ্মের অভিন্নতা। তাঁদের মতে জীব (অনুচৈতন্য জীবাত্মা) দেহেন্দ্রিয়াদির দ্বারা পরিচ্ছিন্ন—সাধনের সিদ্ধিদশায় যখন তার দেহ ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি এই উপাধি চলে যাবে তখন ঐ অণুচৈতন্য জীবাত্মা বিভুচৈতন্য ব্রহ্মে লীন হয়ে যাবে তখন জীবই ব্রহ্ম হয়ে যাবে। এর নাম নির্ভেদ ব্রহ্মজ্ঞান। তাঁদের দৃষ্টান্ত হল ঘটির জল সাগরে ঢেলে দিলে যেমন ঘটির জলই সাগর হয়ে যায়। ভক্তিবাদী এ মত স্বীকার করেন না। তাঁরা বলেন ঘটির পরিমিত জল সাগরে মিশে যেতে পারে কিন্তু সে অপরিমিত সাগর হতে পারে না। তেমনি অনুচৈতন্য জীব বিভুচৈতন্য ব্রহ্মে লীন হতে পারে কিন্তু অণু বিভু হবে কি করে? অদ্বৈত বেদান্তীর গুরু আচার্য্য শঙ্করকেও স্বীকার করতে হয়েছে জীব যতই ব্রহ্ম হোক জীব জগতের সৃষ্টি স্থিতি

লয় কাজ করতে পারে না। বললেন—জগৎ ব্যাপারবর্জম। সুতরাং শুদ্ধাভক্তিতে এই নির্ভেদব্রহ্মজ্ঞান বাদ দিতে হবে—আর কর্ম বলতে বৈদিক ক্রিয়াকর্ম বেদবিহিত অনুষ্ঠানকে বুঝায়—যার ফল হল বন্ধন—স্বর্গ নরক প্রাপ্তি। কবিরাজ গোস্বামিপাদ বললেন—

কভু স্বর্গে উঠায় কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥

বেদবিহিত পুণ্য কর্মের ফল ঊর্দ্ধলোকে গতি দিতে পারে কিন্তু বন্ধন—তাতেও ভগবানের পাদপদ্মে পৌঁছুতে দিচ্ছে না। আর পাপের ফলে অধোগতি। সেটি তো বন্ধন বটেই। মহাজনের বাক্যে উপমা দেওয়া আছে—স্বর্ণশৃঙ্খল আর লৌহশৃঙ্খল দুইই যেমন বন্ধন। এও তেমনি। তাই শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরমশাই বললেন—পাপপুণ্য দুই পরিহরি। পাপ যেমন ত্যাজ্য পুণ্যও তেমনি ত্যাজ্য। শুদ্ধাভক্তিতে এই বেদবিহিত পাপজনিত এবং পুণ্যজনিত কর্ম বাদ দেওয়ার কথা বলা আছে। কিন্তু ভক্তিকর্ম বাদ দেবার কথা বলা নেই। ভক্তিকর্ম তো থাকবেই। ফুল তোলা, মালা গাঁথা, চন্দনঘসা, ভোগরাগ নিবেদন—এসব কর্ম ভগবৎ সম্বন্ধী তাই এর নাম কর্ম হয়—এটি কর্ম আখ্যা পায়নি এর নাম নৈষ্কর্ম্য। শ্রীগোপাল তাপনী শ্রুতি বললেন—ভক্তিরস্য (গোপালস্য) ভজনম্। তদিহামুত্রোপাধি-নৈরাস্যেন অমুষ্মিন্বেব মন কল্পনম্—এতদেব নৈষ্কর্ম্যম্।

শ্রীল ঠাকুরমশাই-এর শ্রীমুখের উক্তি আছে—

জ্ঞানকাণ্ড কর্মকাণ্ড কেবলি বিষের ভাণ্ড
অমৃত বলিয়া যেবা খায়।
নানা যোনি সদা ফিরে কদর্য্য ভক্ষণ করে
তার জন্ম অধঃপাতে যায়॥

শ্রীরূপগোস্বামিপাদ শুদ্ধাভক্তির লক্ষণে আর একটি কথা বললেন—যা সূত মুনির ভক্তির লক্ষণেও বলা হয়নি। 'আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা' কৃষ্ণ ভজতে হবে আনুকূল্যে অর্থাৎ ভালবেসে—প্রীতিতে ভজনের নামই ভক্তি। ভয়ে বা বিদ্বেষে ভজলে তার ভক্তি আখ্যা হবে না। কারণ ভক্তি হল ভগবানের সেবা। ভক্তির্ভগবতো সেবা—সেবা তো প্রীতিছাড়া হয় না। কংস কৃষ্ণাধ্যান করেছেন ভয়ে, শিশুপাল ধ্যান করেছেন বিদ্বেষে—কাজেই তার ভক্তি আখ্যা হয় নি। কংস শিশুপালকে

এইজন্য কোথাও ভক্ত বলা হয়নি। তাহলে শুদ্ধাভক্তি খাঁটি হয়ে দাঁড়ালেন—তাতে অন্য কোন বাসনা তো থাকবেই না এমনকি মুক্তিবাসনা পর্য্যন্ত থাকবে না—নির্ভেদ ব্রহ্মজ্ঞান এবং বেদবিহিত কর্ম যা গতাগতি করায়—সব বাদ দিতে হবে। আর অনুকূল্যে প্রীতিতে অর্থাৎ ভালবেসে তাঁকে ভজতে হবে—তবে তার নাম হবে শুদ্ধা ভক্তি, উত্তমা ভক্তি। এই জ্ঞানশূন্যাভক্তি সাধ্যসার রামানন্দ রায় মহাপ্রভুর অভিলষিত বুঝে প্রতিপাদন করলেন। রামানন্দের এ সিদ্ধান্তে মহাপ্রভু খুসী হয়েছেন—বললেন 'এহো হয়, আগে কহ আর।'

একে আর বাহ্য বললেন না—বললেন 'হয়'। অর্থাৎ ঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁচেছে রামানন্দ কিন্তু এখনও তো অনেক বাকী—এখানেই থেকে যেও না, আরও এগিয়ে বল।'

প্রভু কহে,—'এহো হয় আগে কহ আর।'
রায় কহে,—'প্রেম ভক্তি সর্ব্বসাধ্যসার ॥'

জ্ঞানশূন্যা ভক্তি সর্ব্বসাধ্যসার বলায় মহাপ্রভু সন্তুষ্ট হয়েছেন বুঝে রামানন্দ বললেন—এই ভক্তির যে পরিপাক দশা প্রেমভক্তি সেই প্রেমভক্তি সর্ব্বসাধ্যসার। ভক্তির পর পর স্তর বিচারে শ্রীরূপগোস্বামিপাদ বলছেন—

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া ততোঽনর্থ নিবৃত্তিঃ স্যাৎ।
ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততস্তথাসক্তিস্ততো ভাবঃ ততঃ প্রেমাভুদঞ্চতি ॥

প্রেমভক্তিরই অপর নাম সম্বন্ধলক্ষণা ভক্তি। এই ভক্তি জীবকোটিতে চরমসীমা। এই প্রেম পর্য্যন্ত জীবে হতে পারে তবে শুধু ভজনে নয়, ভজন যখন সাধকের দিক থেকে সম্পূর্ণ হবে এবং তাই দেখে যখন ভগবানের কৃপা তার প্রতি সম্পূর্ণ হবে তখনই প্রেমলাভ। তাই শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ তার শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত গ্রন্থে সিদ্ধান্ত করলেন—প্রেমা তু তৎপ্রসাদগম্যম্। ভগবানের প্রসাদ অর্থাৎ কৃপা হলে প্রেম লাভ। এই প্রেমের পরে পরে যে যে অবস্থার কথা শাস্ত্র বলেছেন সেগুলি জীবকোটিতে হয় না—সে সব থাকে ভগবানের নিত্য সিদ্ধ পরিকরকে আশ্রয় করে, প্রেমের পরে স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ অনুরাগ, ভাব, মহাভাব—এই মহাভাব স্বরূপিণী রাধাঠাকুরাণী।

প্রেম যে জীবকোটিতে চরমসীমা,—তার সোপান পরম্পরা শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ বললেন—সাধকের জীবনে প্রথমে শ্রদ্ধা জাগবে। শ্রদ্ধা বলতে বুঝায় শ্রীগুরুপাদপদ্মের উপদিষ্ট বাক্য ও শাস্ত্র বাক্যতে সুদৃঢ় বিশ্বাস। যে বিশ্বাস কোন আঘাতে টলবে না, টুটবে না। এই বিশ্বাসকে মূলধন করে শ্রীগুরু পদাশ্রয়—এর নাম সাধুসঙ্গ। সাধুসঙ্গ বলতে গুরুপদাশ্রয়কেই বুঝায়। তাই গুরুপদাশ্রয় ভক্তিঅঙ্গ যাজন থেকে কোনও রকমেই বাদ দেওয়া যাবে না। তাহলে ভক্তিমহারাণী বিকলাঙ্গা হবে যাবেন। অর্থাৎ একটি অঙ্গহানি হয়ে যাবে। সে তো কেউ চায় না। এর পরের সোপান হলেন ভজনক্রিয়া। শ্রীগুরুদেবই ভজন উপদেশ করবেন। শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, বন্দন প্রভৃতি সাধক তখন শ্রীগুরুপাদপদ্মের উপদেশে ভজন করবে। এই ভজনক্রিয়া আরম্ভ হলেই সাধকের জীবনে নানা অনর্থ আসে। ভজনে যা বাধা দেয় তার নাম অনর্থ। এই অনর্থ শাস্ত্র বললেন চার রকম। (১) সুকৃতোত্থ, (২) দুষ্কৃতোত্থ, (৩) অপরাধোত্থ, (৪) ভুক্ত্যুত্থ। সুকৃতি অর্থাৎ পুণ্য করলেও একরকমের অনর্থ—পুণ্যের বলে উর্দ্ধলোকে স্বর্গাদিলোকে গতি কিন্তু তাতেও ভগবানের পাদপদ্মে পৌঁছুনো যাচ্ছে না। সুতরাং এটিও বাধা। দুষ্কৃতি অর্থে পাপ—এর ফলে অধোগতি নরকে গমন, এতো বাধা বটেই। তৃতীয় হল অপরাধ—বিষ্ণু এবং বৈষ্ণবে পাপ লাগলে তাকে বলা হয় অপরাধ। এই অপরাধ ঘটলে সাধকের ভজন বন্ধ হয়ে যায়। এর পরের যে অনর্থ ভক্ত্যুত্থ অনর্থ—সেটি ঘটলে ভজন হয়ত বন্ধ হয় না কিন্তু আস্বাদন হয় না। ভক্ত্যুত্থ অপরাধ এড়ানো বড় কঠিন। ভজন করেও অভিমান—মনে হয় আমি তো কিছু করি—কিন্তু আর যাদের দেখি তারা তো কিছু করে না। এর থেকে একরকম অনর্থ ওঠে। এখন এই অনর্থ নিবৃত্তির কি উপায়? ভজন করা। ভজন করতে করতে অনর্থ নিবৃত্তি হবে। অনর্থ চার রকম, নিবৃত্তি পাঁচরকম। (১) একদেশবর্ত্তিনী, (২) বহুদেশবর্ত্তিনী, (৩) প্রায়িকী, (৪) পূর্ণা, (৫) আত্যন্তিকী। ভজন করতে করতে একটি অনর্থ চলে গেল—সেটি একদেশবর্ত্তিনী, তারপর অনেকগুলি অনর্থ চলে গেল—বহুদেশবর্ত্তিনী, এর পরে আর অনর্থ নেই বললেই হয় প্রায়িকী। এর পরে অনর্থ বলতে আর কিছু নেই, বেশ নির্ব্বিঘ্নে ভজন হচ্ছে অর্থাৎ পূর্ণা অনর্থনিবৃত্তি। কিন্তু গোস্বামিপাদ বললেন সাধক যেন বিশ্বাস না করে—অনর্থ আর

দেখা যাচ্ছে না—কিন্তু আবার আসতে পারে। দদ্রুবৎ পুনরুৎপদ্যতে। দাদের ঘা যেমন মানুষ বিশ্বাস করে না। ভাল হয়ে গেছে কিন্তু আবার যেমন পরে একটু দেখা যায়। তেমনি পূর্ণা অনর্থ নিবৃত্তির পরও যেন সাধক বিশ্বাস না করে—আবার অনর্থ আসতে পারে। তাই সাধককে আরও ঘন করে ভজন করতে হবে। এর পরে আত্যন্তিকী অনর্থ নিবৃত্তি অর্থাৎ অনর্থ আর কখনও আসবে না। সাধক নিশ্চিন্ত। এই আত্যন্তিকী অনর্থ নিবৃত্তি যখন হবে তখন তার নাম দিয়েছেন নিষ্ঠা। নিষ্ঠা হল ধ্রুবাস্মৃতি। ইষ্টপাদপদ্ম থেকে সাধকের ধ্যানশিখা টলবে না। নিবাত নিষ্কম্প হয়ে থাকবে। প্রদীপের শিখা যেমন ঠিকমত তেল সলতে দেওয়া থাকলে নড়ে না, টলে না। এই নিষ্ঠা ঘন হলে তার নাম রুচি—রুচি ঘন হলে তার নাম আসক্তি। রুচি এবং আসক্তি তো একরকম বলেই মনে হয়। তা নয়। রুচি হল ভজনবিষয়া আর আসক্তি হল ভজনীয় বিষয়া। ভজন শ্রবণ কীর্ত্তন যখন ভাল লাগছে তার নাম রুচি আর আসক্তি হল ভজনীয় বিষয়া অর্থাৎ যার ভজন গৌর গোবিন্দের তাঁদের যখন ভাল লাগে, মিষ্টি লাগে তার নাম আসক্তি। এই আসক্তি গাঢ় হলে তার নাম ভাব, ভাব গাঢ় হলে তার নাম প্রেম। ভাবকে বলা আছে কুসুম আর প্রেম হল ফল। ফুল পুষ্ট হলে ফলে পরিণত হয়। যেমন লাউ কুমড়ো—আগে ফুল হয়, পরে সেটি ফলে পরিণত হয়। তেমনি ভাবকুসুম এবং প্রেমফল। ভাবের যে কটি লক্ষণ শ্রীগোস্বামিপাদ বললেন—তার যে কোন একটিতেই তো আটকে যেতে হয়। বলেছেন—

ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তির্মানশূন্যতা
আশাবন্ধঃ সমুৎকণ্ঠা নামগানে সদারুচিঃ।
আসক্তিস্তদগুণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্‌বসতিস্থলে
ইত্যাদয়োঽনুভাবাস্যু র্জাতভাবাঙ্কুরে জনে॥

সাধকের হৃদয়ে ভাবের অঙ্কুর যখন জন্মাবে তখন তার প্রথম লক্ষণ হল ক্ষান্তি অর্থাৎ দুঃখ সহ্য করবার ক্ষমতা। যে কোন দুঃখ সে অনায়াসে সহ্য করতে পারে। তার ব্যর্থকাল যাবে না—অর্থাৎ একটি মুহূর্ত্তও বৃথা ব্যয়িত হবে না। ভজনবিহীন হয়ে একটি মুহূর্ত্তও যাবে না। সংসারে বীতস্পৃহভাব আসক্তিশূন্য অবস্থা হবে। নিজের সম্মানবোধ থাকবে না। আশাবন্ধ অর্থাৎ সর্ব্বদা দৃঢ়বিশ্বাস থাকবে প্রভু আমার রক্ষাকর্ত্তা—আমার

কোনও সময় কোনও বিপদ হতে পারে না। সর্ব্বদা ভগবদ্দর্শনের জন্য উৎকণ্ঠা, ভগবানের নামগানে সর্ব্বদা বিভোর। ভগবানের গুণগানে আসক্তি, তীর্থে, ধামে লীলাস্থলীতে বাস করবার জন্য সর্ব্বদা লালসা—এই কটি লক্ষণে বুঝা যাবে তার ভাব হয়েছে—এই ভাব পুষ্টিলাভ করলে তার নাম প্রেম। এই প্রেমে ইষ্টদর্শন এবং প্রেমে কৃষ্ণাস্বাদ হলে তবেই সংসারের বন্ধনের নিবৃত্তি। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ বলেছেন—

প্রেমে কৃষ্ণাস্বাদ হলে ভবনাশ পায়

শ্রীল রামানন্দ রায় যখন সিদ্ধান্ত করলেন—

প্রভু কহে,—'কহ রায় সাধ্যের নির্ণয়।'
রায় কহে,—'প্রেমভক্তি সর্ব্বসাধ্যসার ॥'

মহাপ্রভু বললেন, ঠিক হয়েছে রামানন্দ, কারণ প্রেমই জীবকোটিতে চরমসীমা। এইখানেই পৌঁছুতে হবে। এই প্রেমলাভ না হওয়া পর্য্যন্ত মানুষের জীবন সার্থক হবে না। কারণ মানুষের বাঁচবার একটাই প্রয়োজন—সেটি হল তত্ত্বজিজ্ঞাসা। সুত মুনি বলেছেন—'জীবস্য তত্ত্বজিজ্ঞাসা নার্থো যশ্চেহ্কর্মভিঃ। মানুষের বাঁচবার প্রয়োজন অন্য কিছু নয়। তত্ত্বকে জেনে যেতে হবে। এই তত্ত্ব বলতে ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবান—তিনজনকেই বুঝায়, তবু উৎকর্ষ হল ভগবানে। শ্রীশ্রীজীব গোস্বামিপাদ তাঁর তত্ত্বসন্দর্ভে সিদ্ধান্ত করেছেন—ভগবান্ এব তত্ত্বম্। কারণ ভগবানকে জানলে সকলকে জানা হয়ে যাবে। ভগবানের ভিতরেই ব্রহ্ম-পরমাত্মা অনুস্যূত হয়ে আছেন। ভগবানকে জানলে আর ব্রহ্ম পরমাত্মা আলাদা করে জানতে হবে না। তবে সাধনভেদে একই তত্ত্বের তিনটি নামকরণ হয়েছে। জ্ঞান সাধনে ব্রহ্মানুভূতি, যোগসাধনে পরমাত্মানুভূতি এবং ভক্তিসাধনে ভগবদনুভূতি। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ বললেন—

জ্ঞান যোগ ভক্তি তিন সাধনের বশে।
ব্রহ্ম পরমাত্মা ভগবান ত্রিবিধ প্রকাশে॥

প্রেমভক্তিই যে সর্ব্বসাধ্যসার এইটিই সিদ্ধান্ত—শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপারজ্জু রামানন্দকে আকর্ষণ করে এইখানে পৌঁছে দিয়েছেন—তাই রামানন্দ বলতে পেরেছেন—

প্রেমভক্তি সর্ব্বসাধ্যসার।

রামানন্দের এই উত্তরে মহাপ্রভু উল্লসিত—পরম তৃপ্তিতে তাঁর মনপ্রাণ ভরে গেছে কারণ ঠিক লক্ষ্যস্থানে পৌঁছে গেছেন—তবু রসলম্পট তো, তাই রসের ক্ষুধা তাঁর অসীম। পরিপাটি করে তাই ভোগ করতে চান। কারণ রসিক জন যিনি হবেন তাঁর একটুতে তো তৃপ্তি হবে না। রসের বিস্তার চাই। প্রেমলক্ষণা ভক্তি এই রসরাজ্যে পৌঁছেছেন কিন্তু তার পরিপাটি তো এখনও আস্বাদন হয় নি। তাই ক্ষুধাতুরের লোলুপতা নিয়ে এই প্রশ্ন—

প্রভু কহে,—'এহো হয়—আগে কহ আর।'
রায় কহে,—'দাস্যপ্রেম সর্ব্বসাধ্যসার॥'

চতুর্থ ধারা

দাস্য প্রেম

স্বয়ং ভগবান শ্রীগৌরসুন্দর রসলোলুপ হয়ে আজ শ্রীপাদ রামানন্দ রায়ের কাছে গোদাবরী তীরে বসেছেন এবং নিজেই প্রেরণা দিয়ে নিজের স্বভক্তি সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেছেন। অশেষবিশেষে রসভোক্তার আস্বাদন তো সীমাবদ্ধ হতে পারে না। সাধ তাই মেটে না কিছুতেই। মহাপ্রভু যখন শ্রীপাদ রামানন্দ রায়ের শ্রীমুখে সিদ্ধান্ত শুনলেন—

রায় কহে,—'প্রেমভক্তি সর্ব্বসাধ্যসার।'

তখন প্রভু বললেন—

প্রভু কহে,—'এহো হয় আগে কহ আর।'
রায় কহে,—'দাস্যপ্রেম সর্ব্বসাধ্যসার॥'

প্রেমভক্তি আস্বাদন করবেন ভগবান—আর তার যোগান দেবেন ভক্ত। তাই ভক্তি বা রস দ্বিনিষ্ঠ—একজন ভোক্তা আর একজন দাতা। যিনি ভোক্তা তিনি বিষয়তত্ত্ব আর যিনি দাতা তিনি আশ্রয়তত্ত্ব। এর মধ্যে একজনকে বাদ দিলে রসের অস্তিত্ব থাকে না। পাখী যেমন দুটি ডানার উপর ভর দিয়ে চলে—একটি ডানা বাদ দিলে পাখী আর উড়তে পারে না। তেমনি রসপক্ষীর দুটি ডানা—আশ্রয়তত্ত্ব ও বিষয়তত্ত্ব—একজন ভোগ করবেন আর একজন দান করবেন। এই দাতা বা আশ্রয়তত্ত্বকেই চারটি ভাগ করা হয়েছে—দাস, সখা, পিতামাতা এবং কান্তা। ভগবান সব রসেরই ভোক্তা—প্রেমরস চারটি পাত্রে ভগবান আস্বাদন করেন। এ যেন চারটি পাত্রে রস আস্বাদন। তাই প্রেমলক্ষণা ভক্তি বা সম্বন্ধলক্ষণা ভক্তির চারটি অবস্থা—দাস্যভক্তি, সখ্যভক্তি, বাৎসল্যভক্তি এবং মধুরভক্তি। দাস্যভক্তি হল ভগবান আমার প্রভু সর্ব্বেশ্বর, আমি তাঁর চরণে দাস—এই দাস প্রভু সম্পর্কে যে ভগবানকে ভালবাসা উপাসনা তার নাম দাস্যভক্তি। এরপরে ভগবান আমার সখা এবং আমি তাঁর সখা—এই বোধে যে উপাসনা তাঁর নাম সখ্যভক্তি। তারপর ভগবান আমার পুত্র এবং আমি তার পিতা বা মাতা এইভাবে যে উপাসনা তার নাম বাৎসল্য ভক্তি। আর ভগবান আমার কান্ত, প্রিয় দয়িত এবং আমি তার কান্তা, প্রিয়া দয়িতা এই বোধে যে উপাসনা তার নাম মধুরভক্তি। ভগবানের

সঙ্গে অর্থাৎ রসবস্তুর সঙ্গে এই চারটি রসের সম্বন্ধ। শ্রুতি বলেছেন, 'রসো বৈ সঃ।' রস তো তিনিই আর যিনি যে রসে ভগবানকে আস্বাদন করেন তিনি হলেন রসিক। সম্বন্ধলক্ষণা ভক্তির আরম্ভ তাই দাস্যভক্তি থেকে। শাস্ত্রে এর আগে আর একটি রসের উল্লেখ আছে—তার নাম শান্তরস। কিন্তু শান্তরসে ভগবানের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ বোধ নেই—শুধু ঈশ্বর জগদীশ্বর বোধে সেখানে উপাসনা—তাই সম্বন্ধলক্ষণা বা প্রেমলক্ষণাভক্তি থেকে শান্তরসকে বাদ দেওয়া হয়েছে। সম্বন্ধের প্রথম আরম্ভ দাস্যভক্তি থেকে। ভগবানের সঙ্গে জীবের নিত্যসম্বন্ধ তো দাসপ্রভু। জীব নিত্য কৃষ্ণদাস—জীব হরিদাস—হরিপাদপদ্মেই দাস—অন্য কোথাও দাসত্ব করলে তার শোভা হয় না। এখন প্রশ্ন হতে পারে ভগবানের সঙ্গে জীবের দাসপ্রভু সম্বন্ধ হল কোন সুত্রে। এটি যুক্তিতে হবে। কারণ ভগবান বিভু চৈতন্য ঈশ্বর আর জীবের স্বরূপ হল জীব অণু পরিমাণ। জীব অণু বলেই সে দাস আর ভগবান বিভু বলেই তিনি প্রভু। কারণ যিনি বিভু অর্থাৎ বড় তিনি তো প্রভু হবেনই আর যে অণু অর্থাৎ ছোট সে তো দাস হবেই। এটি তো স্বতঃসিদ্ধ। অনু কখনও প্রভু হতে পারে না এবং বিভু কখনও দাস হতে পারে না। তাই ভগবানের সঙ্গে জীবের নিত্য সম্বন্ধ দাস। এই দাসত্ব ভুললেই বিপদ লাঞ্ছনা, যন্ত্রণা। তাই শাস্ত্র বললেন—

জীব নিত্য কৃষ্ণদাস তাহা ভুলি গেল।
তে কারণে মায়া পিশাচী তার গলায় বাঁধিল॥

আরও বলা আছে—

কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুখ॥

এখন প্রশ্ন হচ্ছে জীব যদি নিত্য কৃষ্ণদাস হয় তাহলে জীব কৃষ্ণ ভুলল কি করে? জীব যে কৃষ্ণ ভুলেছে আজকে নয়—এটি অনাদি। অর্থাৎ যতদিন থেকে জীবের প্রকাশ ততদিন থেকেই জীবের এই কৃষ্ণবিস্মৃতি। শাস্ত্র কোন কারণ দেখাতে পারেন নি এই বিস্মৃতির—শুধু অনাদি কৃষ্ণ বিস্মৃতি বলেছেন। কোন কারণ নেই অথচ জীব গোবিন্দ ভুলে গেল—এ যেন কেমন মনে হয়। তাই মহাজন নিজে অনুভব করে একটি উদাহরণ দিয়েছেন। একটি বিরাট অগ্নিপুঞ্জ দাউ দাউ করে জ্বলছে—সে আপন

স্বভাবে জ্বলছে—কিন্তু ঐ অবস্থায় সেই অগ্নিপুঞ্জ থেকে কতকগুলি অগ্নিকণা যাকে স্ফুলিঙ্গ বলা হয় সেগুলি ঠিকরে ঠিকরে পড়ে এবং অগ্নিপুঞ্জ থেকে বাইরে পড়ে—এখন এই স্ফুলিঙ্গগুলি যতক্ষণ অগ্নিপঞ্জের ভিতরে ছিল ততক্ষণ তারা নিজের দিকে তাকাবার অবসর পায়নি—অগ্নিপুঞ্জে লীন হয়েছিল। এখন যখন অগ্নিপুঞ্জ থেকে বাইরে সরে এল তখন নিজের দিকে তাকাবার অবসর পেল—তখন নিজের দিকে চেয়ে দেখল—দেখল আমি তো বেশ সুন্দর—অগ্নিকণা তো বেশ জ্বলজ্বল করছে এই স্বরূপে মুগ্ধ হয়ে গেল—তখনই অগ্নিপুঞ্জকে ভুলে গেল। জীবের অবস্থাও তাই। অনন্তকোটি জীব ক্ষুদ্র চিৎকণা ঐ অগ্নিকণার মত ভগবানের শ্রীঅঙ্গে লীন হয়েছিল। ভগবান তাঁর নিত্য চিদ্বিলাসে নিত্য পরিকর নিয়ে নিত্যলীলায় মেতে আছেন—ঐ অবস্থায় অনন্ত চিৎকণা জীব ভগবানের স্বরূপ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল—তখনই ঐ জীব চিৎকণা ভগবানকে ভুলে গেল। এই একটি ঘটনা মহাজন অনুভব করে বললেন—জীবের অনাদিকাল থেকে ভগবৎ বিস্মৃতির অবস্থা। ভগবানের স্বরূপের সঙ্গে যতদিন জীব লীন হয়েছিল ততদিন সে নিজের দিকে তাকাবার অবসর পায়নি। এখন ভগবান থেকে বিচ্যুত হওয়ার ফলে ভগবানকে তো ভুললই—উপরোক্ত নিজের স্বরূপের দিকে চেয়ে দেখবার অবসর পেল, তখন দেখল আমি তো বেশ সুন্দর—ঐ সৌন্দর্য্যটি কি? আমি নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বরূপ, আমার ক্ষুধা পিপাসা, জন্মমৃত্যু, রোগ, শোক ভয় মোহ কিছু নেই। এরই নাম স্বরূপ স্মৃতি। জীব এই স্বরূপস্মৃতিতে মুগ্ধ হয়ে গেল। কিন্তু এই স্বরূপ জ্ঞান বা আত্মজ্ঞান মায়ার আক্রমণকে ঠেকাতে পারল না। ঐ অবস্থাতেই মায়া তাকে আক্রমণ করল—মায়া আক্রমণ করে জীবের এই স্বরূপ জ্ঞানকেও ভুলিয়ে দিল। জীব গোবিন্দকে তো আগেই ভুলেছে, এখন নিজেকেও ভুলল—তখন জীব পুরোপুরি মায়ার বশীভূত হয়ে গেল—আমি আমার এই বোধে সংসার বন্ধনে বাঁধা পড়ল—যার নাম দিয়েছেন যোগীন্দ্র 'বিপর্য্যয়'। কারণ মায়া একমাত্র কৃষ্ণজ্ঞান ছাড়া অন্য কোনও জ্ঞানের খাতির রাখে না।—তাই আত্মজ্ঞান থাকা অবস্থাতেই জীবের ওপরে মায়ার আক্রমণ। শুধু 'হা গোবিন্দ' বলে কাঁদতে পারলে—তার চরণে একান্তভাবে শরণাগতি নিতে পারলে মায়া তার কাছে যাবে না। শ্রীগোবিন্দজী তাই গীতাবাক্যে বললেন—

মামেব যে প্রপদন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে। গী ৭।১৪

ভগবানকে না জেনে নিজেকে জানার শাস্ত্র কোন দাম দেন নি। জানতে হয়তো গোবিন্দকে জান। গোবিন্দ আমার প্রভু, সর্ব্বেশ্বর আর আমি তাঁর চরণকমলে দাস—এই দাস প্রভু, সম্বন্ধ স্থির হলে—তার পরে অন্য সম্বন্ধ দাঁড়াবে। 'জীব নিত্য কৃষ্ণদাস'—এই সম্বন্ধই হল সাধনার প্রথম ভূমি, প্রথম স্তর। কারণ নিজেকে দাস বোধ না হওয়া পর্য্যন্ত সেবা বুদ্ধি তো আসবে না। এইটিই হল ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধের প্রথম সোপান। দাসের নিজস্ব বৃত্তি হল প্রভুর পাদপদ্মে অকপটে সেবা। এই সেবা বৃত্তি পরপর সব রসে সঞ্চারিত হয়। ভগবানের সঙ্গে এই সম্বন্ধ এই জন্মেই করে যেতে হবে। কারণ এই মানব দেহ যদি চলে যায় তাহলে আর সম্বন্ধ করার উপায় থাকবে না। মহাজন সাবধান করে বললেন—

এখনও জানিয়া সম্বন্ধ কর, নইলে মরিলে হইবে বিষম ফের।

এই ফেরটি কি? আবার চুরাশি লক্ষ যোনি ভ্রমিতে হবে। প্রেমভক্তি লাভের পর প্রথম সম্বন্ধের ভূমি হল দাস্য প্রেম। তাই রামানন্দ বললেন—

প্রভু কহে, 'এহো হয় আগে কহ আর।'
রায় কহে, 'দাস প্রেম সর্ব্বসাধ্যসার॥'

জীবের স্বরূপই হল ভগবানের পাদপদ্মে সে নিত্য দাস। এই সম্বন্ধ ভুলেছে বলেই জীবের উপরে মায়ার লঞ্ছনা। তাই এই মানুষ দেহেই একান্ত কর্ত্তব্য ভগবানে বিস্মৃতি দূর করে উন্মুখতা জাগিয়ে সম্বন্ধ বোধটি ফিরিয়ে আনা। যেই ভগবানে স্মৃতি জাগবে অর্থাৎ উন্মুখতা হবে তখন আর মায়ার যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে না। তখন জীব সুস্থির হতে পারবে। তা না হলে জীব কিছুতেই স্থির হতে পারবে না। জীব সর্ব্বদাই চঞ্চল—এ জগতে সব বস্তুই চঞ্চল—চঞ্চল বস্তুর সঙ্গে সম্বন্ধে চঞ্চলতাই বাড়বে। গৌর গোবিন্দ পাদপদ্ম একমাত্র অচঞ্চল তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধ করতে পারলে তবে জীব স্থির হতে পারবে। আর তাছাড়া শাস্ত্র বলেছেন—ভগবৎ বিস্মৃতিই হল মৃত্যু—'মৃত্যুরত্যন্তবিস্মৃতিঃ'। ভগবানকে ভুললেই মৃত্যু—আর ভগবৎ স্মৃতির নামই জীবন। ভগবানকে মনে থাকলেই তার নাম জীবন—ভক্তিপথে থাকার নামই বেঁচে থাকা আর ভক্তিপথ থেকে সরে আসার নামই মৃত্যু। ব্রহ্মাও বলেছেন—ভগবানের পাদপদ্মে যে স্মরণে থাকে সে-ই বেঁচে থাকে এবং সম্পত্তির অর্থাৎ প্রেম সম্পত্তির অধিকারী হয়।

জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্। ভাঃ ১০।১৪

ভগবানের সঙ্গে এই দাস প্রভু সম্বন্ধ যখন স্থির হল—যার নাম দাস্য প্রেম বা দাস্যভক্তি তখন মহাপ্রভু বললেন—এহো হয়—এখানে সম্বন্ধ হল কিন্তু এর পরেও তো কথা আছে সেটি হল—আগে কহ আর।

ভগবানের পাদপদ্মে যারা দাস হতে পেরেছে তারা পারে না এমন কোনও বস্তু নেই। কৃষ্ণদাসই কৃষ্ণের সৰ্ব্বৈশ্বর্য্যের অধিকারী। কারণ ভগবানের নাম শ্রবণের মহিমায় বলা আছে—

যন্নামশ্রুতিমাত্রেণ পুমান্ ভবতি নির্মলঃ।
তস্য তীর্থপদঃ কিংবা দাসানামবশিষ্যতে॥ ভাঃ ৯।৫।১৬

যাঁর নাম শ্রবণমাত্রে মানুষ নির্মল অর্থাৎ মালিন্যমুক্ত হয়, শুদ্ধ হয়, এখানে শুদ্ধি বলতে কি বুঝায়? জীবের সবচেয়ে বড় অশুদ্ধি হল ভগবানে অরুচি। তাহলে শুদ্ধি হল ভগবানে রুচি লাভ। ভগবানের নাম শ্রবণের এমনই মহিমা তার বিমুখতা অরুচিরূপ যে মালিন্য সেটি দূর হয়ে যায়— ভগবানে রুচি জাগে অর্থাৎ শুদ্ধি লাভ হয়। এটি হল নাম শ্রবণমাত্রের ফলশ্রুতি। তারপর যদি ভগবানে দাস প্রভু সম্বন্ধ বোধ হয় তাহলে তো কথাই নেই—এই সম্বন্ধ বোধ হলে তার আর পাবার কিছু বাকী থাকে না। এই কৃষ্ণদাস্যকে মহাজন বলেন সিংহাসন প্রাপ্তি। কৃষ্ণদাস্য হল সিংহাসন। এই কৃষ্ণদাস্য সিংহাসনে ভক্ত উপবেশন করে বলে কৃষ্ণভক্ত কৃষ্ণদাসকে বলা হয় মহারাজ। ভক্ত তাই ভগবানের পাদপদ্মে দাসত্ব ছাড়া আর কিছু চায় না। সালোক্যাদি পঞ্চবিধা মুক্তিসুখকে তুচ্ছ করে শুদ্ধভক্ত কেবল সেবাসুখ চায়—সেবাই তো দাসের বৃত্তি। শ্রীহনুমানজী বললেন—'প্রভু, ভববন্ধন ছেদন করে দিতে পারে যে মুক্তি সম্পদ তা আমি চায় না তো বটেই, চাইবার স্পৃহাও করি না। কারণ যে মুক্তি পেলে তুমি (রামচন্দ্র) আমার প্রভু সর্ব্বেশ্বর আর আমি তাঁর চরণকমলে দাস—এই সম্বন্ধ লুপ্ত হয়ে যায় সে মুক্তিতে আমার দরকার নেই। যত যত ভক্ত সকলের প্রার্থনার একই সুর—'তোমার চরণে যেন দাস হতে পারি।'

'আসিব যাইব চরণ সেবিব।'

আরও বলেছেন—

'তুমি আর নিত্যানন্দ বিহরিবে যথা।
এই করো জন্মে জন্মে ভৃত্য হই তথা॥'

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বলেছেন—

'অল্প করি না মানিহ দাস হেন নাম।
অল্প ভাগ্যে দাস নাহি করেন ভগবান॥'

আমি তো প্রভু হতে চাই। নিজেকে দাস বলতে লজ্জা বোধ করে। কিন্তু যাঁরা দাস হতে পেরেছেন—নিজেকে অকপটে প্রভুর চরণে বিকিয়ে দিতে পেরেছেন তাঁদের যে কি আনন্দ তা ভাষা দিয়ে প্রকাশ করা যায় না। ভগবান নিজেও কিঙ্করত্ব (দাসত্ব) করে আনন্দ পেয়েছেন। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র পাণ্ডববংশে দাসত্ব করেছেন, যা নিজ যদুবংশেও করেন নি। এটি পাণ্ডববংশের গৌরব। শ্রীশুকদেব তাই সেই গৌরবটি মহারাজ পরীক্ষিতের কাছে বলেছেন—

রাজন্ পতিগুরুবলং ভবতাং যদূনাম্
দৈবং প্রিয়ঃকূলপতিঃ ক্ব চ কিঙ্করো বঃ॥ ভাঃ ৫।৬।১৮

মহারাজ, কৃষ্ণচন্দ্র যদুবংশে এবং আপনাদের বংশের কি না নন! তিনি আপনাদের পতি (রক্ষক) গুরু দেবতা, প্রিয়—আর নিজবংশে যা করেননি আপনাদের বংশে অর্থাৎ পাণ্ডববংশে তাই করেছেন—কিঙ্করত্ব (দাসত্ব) করেছেন। অর্জ্জুনের রথের সারথি হলেন ভগবান। সারথি তো ভৃত্যই। অর্জ্জুন রথে রথী অর্থাৎ প্রভু আর ভগবান সারথি অর্থাৎ ভৃত্য। অর্জ্জুন রথী প্রভু হয়ে আদেশের সুরেই ভগবানকে বললেন—

সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত। গীঃ ১।২১

ভগবানও এই আদেশ পালন করে কুরুসেনা ও পাণ্ডবসেনা দুই সেনাদলের মাঝখানে অর্জ্জুনের রথখানিকে স্থাপন করে আবার অর্জ্জুনের মুখের দিকে চেয়ে আছেন—কি জানি আবার কি আদেশ হয়? এতে ভগবানের আনন্দ।

তাই রামানন্দ যখন মহাপ্রভুর কৃপাপুষ্টকণ্ঠে বললেন—'দাস্যপ্রেম সর্ব্বসাধ্যসার'—তখন মহাপ্রভু তা অনুমোদন করলেন—কিন্তু প্রেরণা দিয়ে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য বললেন—

প্রভু কহে,'এহো হয় কিছু আগে আর।'
রায় কহে,'সখ্যপ্রেম সর্ব্বসাধ্যসার॥'

পঞ্চম ধারা

সখ্য প্রেম

মহাপ্রভুর প্রশ্নের উত্তরে যখন রামানন্দ বললেন—

'সখ্যপ্রেম সর্ব্বসাধ্যসার।'

তখন সেই কথা শুনে মহাপ্রভু আস্বাদন করে সন্তুষ্ট হয়ে বললেন—

প্রভু কহে, 'এহো উত্তম আগে কহ আর।'

সখ্যপ্রেমকে মহাপ্রভু উত্তম বলে মন্তব্য করলেন। দাস্যপ্রেমের উপরে সখ্যপ্রেমের বা সখ্য রসের স্থান। কারণ রসের বিচারে পর পর রসের উৎকর্ষ। দাস্যপ্রেমের নিজস্ব বৃত্তি সেবা, এটি সখ্য প্রেমে আছে। সখারাও গোবিন্দের সেবা করে। কিন্তু সখ্যরসের যে নিজস্ব বৃত্তি নিঃসঙ্কোচ প্রীতি সেটি দাস্যে নেই। দাস্যরসে সঙ্কোচ আছে। দাস প্রভুর কাঁধে হাত দিয়ে বেড়াতে পারে না—সাধ্বস বোধ থাকে, সম্ভ্রম বোধ থাকে। কিন্তু সখার সে সম্ভ্রম বোধ নেই। সখা সখার কাঁধে হাত দিয়ে বেড়ায়। বরং বলে—'তুমি কোন্ বড়লোক—তুমি আমি সম।' এইখানেই সখ্যরস দাস্যরসের ওপরে দাঁড়িয়েছে। এই সখ্যপ্রেমের পরিকরের আবার স্তর আছে—অবশ্য সব রস সম্বন্ধেই এ কথা বলা যায়। সব রসেই ব্রজপরিকর সকলের ওপরে দাঁড়িয়ে আছে। ব্রজের সখা, মথুরার সখা এবং দ্বারকার সখা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের প্রকট লীলার তিনটি ভাগ—ব্রজলীলা (বৃন্দাবনলীলা) মথুরালীলা এবং দ্বারকালীলা। এর মধ্যে ব্রজের যে কোন রসই বিশুদ্ধ—তার মধ্যে কোন মিশ্রণ নেই। রসের আবার মিশ্রণ কি? যে রসে ঐশ্বর্য্যের মিশ্রণ যত বেশী সে রসের মর্য্যাদা তত কম। আর যে রসে মাধুর্য্য যত বেশী সে রস তত খাঁটি এবং সেই রসের মর্য্যাদা তত বেশী। ব্রজের যে কোন রস খাঁটি কারণ তাতে ঐশ্বর্য্যের গন্ধ মাত্র নেই। এমনকি ঐশ্বর্য্য দেখিলে ব্রজবাসী সম্বন্ধ না মানে। কিন্তু মথুরা দ্বারকার পরিকরে ঐশ্বর্য্য বোধ আছে। এখানে আমাদের আলোচ্য বস্তু সখ্যপ্রেম। ব্রজের সখা শ্রীদাম সুদাম দাম বসুদাম সুবল মধুমঙ্গল প্রভৃতি। তাদের বিশুদ্ধ সখ্যপ্রেম। একে তো দাস্যের সেবাবৃত্তি সখাতেও আছে। সখারাও গোবিন্দের সেবা করে। বনে কৃষ্ণ যখন গোচারণে যান সখারা বনের ফল ঝরণার জল নিয়ে এসে গোবিন্দকে সেবা করায়। গোচারণ করতে

করতে কৃষ্ণ ক্লান্ত হয়ে পড়লে পল্লব ভেঙে চামরের মত করে ভাই কানাইকে বাতাস করে। পাতা বিছিয়ে শয্যা রচনা করে তাতে কৃষ্ণকে শোওয়ায়, পাদসংবাহন করে ক্লান্তি দূর করে—এ সবই তো সেবা। তাদের কোন সঙ্কোচ নেই। বনফল খেতে খেতে মিষ্ট লাগলে ধড়ার অঞ্চলে বেঁধে রাখে—বলে—'এ যে বড় মিঠা ফল ভাই—আর তো খাওয়া হল না—আধ থাক ভাই কানাইকে দেব।' ভাই কানাই যখন আসে তখন বাম করে গলা জড়ায়ে ধরে চাঁদ বদনে তুলে দেয়—এঁটো বলে কোন সঙ্কোচ নেই। গোবিন্দেরও গৌরব বোধ এই নাম গ্রহণে—'শ্রীদামের উচ্ছিষ্টভোজী সুবোলের মরম সখা।'

এর ওপরেও নিঃসঙ্কোচভাব আছে—

বাল্যলীলা প্রসঙ্গে শ্রীশুকদেব শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রে বাহ্য বাহক ক্রীড়ার কথা উল্লেখ করেছেন। গোচারণে গিয়ে ছেলেদের মধ্যে খেলা হয়—আবার পণ রেখে খেলা। খেলায় যে হারবে সে, খেলায় যে জিতবে তাকে পিঠে করে বয়ে নিয়ে ঐ গাছতলা পর্য্যন্ত যাবে। খেলার প্রথম দানে শ্রীদাম সখা হেরে গেছে, কৃষ্ণ জিতেছেন। পণ অনুযায়ী শ্রীদাম কৃষ্ণকে পিঠে করে বয়ে নিয়ে গেছে সীমানা পর্য্যন্ত। এর পরের দানে আবার খেলা আরম্ভ হয়েছে। এখন খেলায় মারপ্যাঁচ তো! এবারে কিন্তু কৃষ্ণ হেরে গেছেন—শ্রীদাম ছাড়বে কেন? বলছে ভাই কানাই, তুমি এবার পিঠ পেতে বস—আমি তোমার পিঠে উঠব। আমাকে বয়ে নিয়ে যেতে হবে। কৃষ্ণ বলছেন,—'না ভাই আমি পিঠ পাততে পারব না।' এটি কি কৃষ্ণ নিজ ভগবত্তার বোধে বলছেন? না, এ যে ব্রজভূমি এখানে ভগবানের ভগবত্তা তো আছেই থাকবেই—কারণ ভগবান তো কখনও ভগবত্তাকে ছেড়ে থাকেন না—কিন্তু ব্রজভূমির এমনই মহিমা যে ভগবান তার ভগবত্তা ভুলে যান। এখানে ভূমির মর্য্যাদা, রসের মর্য্যাদা, ভগবানের ভগবত্তা অর্থাৎ তত্ত্ব ভুলিয়ে দেয়—রসের চাপ মাধুর্য্যের চাপ এত বেশী। এইটিই ব্রজভূমির গৌরব। তবে ভগবান বললেন কেন—'আমি পিঠ পাততে পারব না।' আকাশপথে দেবদেবীরা বিমানে করে যান—তাঁরা যদি কোনও রকমে দেখে ফেলেন কৃষ্ণ ভগবান শ্রীদাম সখাকে পিঠে করে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে তাহলে কি মনে করবে—তাই কৃষ্ণ বলছেন—'আমি বইতে পারব না।' কিন্তু নিঃসঙ্কোচ প্রীতিতে ব্রজের বিশুদ্ধ সখ্য

রসে শ্রীদাম সখা তো ছাড়ে নি—বলেছে—

'তুমি কোন বড়লোক—তুমি আমি সম।'

তখন কৃষ্ণকে পিঠ পেতে শ্রীদাম সখাকে বয়ে নিয়ে যেতেই হল। যে লীলা শুধু হৃদয়ে অনুভব করে নয়, নিজের চোখে দর্শন করে শ্রীশুকদেবকে বলতে হল—মহারাজ দেখুন দেখুন—আজকের লীলা কত মিষ্টি কত পরিপাটি—

'উবাহ ভগবান্ কৃষ্ণঃ শ্রীদামানাং পরাজিতঃ।'

আজ পরাজিত ভগবান শ্রীদাম সখাকে পিঠে করে বয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। শুকদেব তো দর্শন করছেনই, কৃপাবলে মহারাজ পরীক্ষিৎকেও দর্শন করাচ্ছেন। ভগবানের সম্বন্ধে শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ সর্ব্বত্র জয়ই ঘোষণা করেছেন। কিন্তু সে জয় হল তত্ত্বে—ভগবানের তত্ত্বে কখনও কোথাও পরাজয় হয় না। সেই ভগবানের সম্বন্ধে শুকদেব বললেন 'পরাজিতঃ ভগবান্'—এ পরাজয় কিসে? তত্ত্বে নয় এ হল রসের পরাজয়, ভাবের পরাজয়, প্রেমের পরাজয়। এ প্রেমের পরাজয়ে ভগবানের গৌরব।

ব্রজের রস তত্ত্ব বোঝে না—অবশ্য বোঝে না কথাটি বললেও ঠিক হবে না। কারণ সাধক (মানুষ—জীব) সাধন করে কৃপা হলে ভগবানের তত্ত্ব উপলব্ধি করে আর ব্রজের নিত্যসিদ্ধ পরিকর তারা বোঝে না এটি বললে সিদ্ধান্তে দোষ পড়ে। তারা তত্ত্ব জানে কিন্তু জেনেও ভুলে গেছে, মনের মধ্যে তত্ত্ববোধ জাগে না। যেমন এক কড়া দুধের মধ্যে একটা কুটো পড়লে তাকে যেমন যেখা যায় না—দুধটাই উথলে উথলে ওঠে। কিন্তু কুটোটি কড়ার মধ্যে নেই তাতো তো বলা যাবে না—আছে অথচ দুধের উচ্ছলনে সেটি দেখা যাচ্ছে না। তেমনি ব্রজবাসীর মনের মধ্যে ভগবানের তত্ত্ববোধরূপ কুটো আছে কিন্তু মাধুর্য্যের রসের এমনই উচ্ছলন যে তত্ত্বজ্ঞানরূপ কুটো তলিয়ে গেছে সেটি বোধের মধ্যে আসছে না। যা আস্বাদন হচ্ছে তা রসেরই আস্বাদন।

ব্রজের সখা চোখের সামনে দেখছে গোপালের ঐশ্বর্য্য তবু সম্বন্ধের বোধে মাধুর্য্যের চাপে তাকে ঐশ্বর্য্য বলে মানছেই না। এ হল ব্রজরস—ব্রজের সখ্যপ্রেম। বনের মাঝে কত লীলা—কৃষ্ণ যখন গোচারণে যান তখন সব দেবদেবী কৃষ্ণদর্শনেব লোভে সেখানে আসে, কৃষ্ণকে পূজা

করেন—চরণে পুষ্পাঞ্জলি দেন, স্তুতি করেন—এরকম ব্রহ্মা আসেন, শিব আসেন, দেবরাজ ইন্দ্র আসেন, জগজ্জননী মহামায়া আসেন। সখারা অবাক হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখে। শ্রীবলদেব কৃষ্ণতত্ত্ব মূর্ত্তিমান—তিনি তো সব জানেন—তিনি দেখেন, এ সব ঘটনা যদি মা যশোমতী জানতে পারেন, তাহলে অমঙ্গল আশঙ্কায় গোপালকে আর কখনও বনে আসতে দেবেন না। তাই বলাই দাদা—ছেলেদের মানা করে দেন—বলেন—'দ্যাখ, বনের কথা যেন ঘরে গিয়ে বলিস্ নে।' তারা তো দাদাকে খুব মানে। তাই বলে—'না দাদা, কখনও বলব না।'—কিন্তু ছেলেদের একটি স্বভাব আছে যা বলতে বারণ করা যায় সেই কথাটাই আগে বলে। তাই ঘরে ফিরেই মায়ের কাছে মাকে ঘিরে বসে মুখ চাওয়াচায়ি করছে। একজন ইসারা করছে 'এবার কথাটা বল না—' আর একজন আবার বলছে—'এই চুপ, দাদা মানা করছে না? বলিস্ নে।' তাদের রকম-সকম দেখে মা বুঝতে পেরেছেন, বলছেন—'তোরা যেন কিছু বলবি বলবি মনে হচ্ছে, কি বলবি বল না?' তারা তো তখন সাহস পেয়ে গেছে—'মা বলব?' মা বলছেন—'হ্যাঁ বল—আমার কাছে বলবি তা কি হয়েছে?' তখন একজন মুখপাত্র হয়ে বলছে—জানো মা বনে তোমার গোপালের কাছে কতজন আসে। তার মধ্যে একজন—তাঁর গায়ের রং লাল, চারটে মুখ—হাঁসের পিঠে চড়ে আসে—বিড় বিড় করে কত কি বলে। ইনি হলেন চতুরানন ব্রহ্মা, ছেলেরা তো নাম জানে না বর্ণনা করে করে বলে। আর একজন আসে মা ষাঁড়ের ওপর চড়ে, পরণে একটা বাঘছাল কানে দুটো ধুতরো ফুল, মুখে ব্যোম্ ব্যোম্ শব্দ করে গোপালের চরণে পড়ে। তবে দেখতে ঠিক যেন দাদা বলাই গো, শুধু তফাৎ হল মাথায় তার জটা—'জটা যদি না থাকত মা ঠিক দাদা বলাই গো।' আবার জটা নিংড়ে তোর গোপালের রাঙা চরণ দুখানি ধুইয়ে দেয়। ইনি হলেন দেবাদিদের শঙ্কর। আবার একজন আসে মা হাতীর পিঠে চড়ে, তার সারা গায়ে চোখের মত, হাতে আবার তার একটা বজ্র—সে কত মন্ত্র বলে—আবার তারা কি বোকা মা! তারা ফুল ভেঙ্গে এনে গোপালের চরণে দেয়—কেন মালা গাঁথতে জানে না, মালা গেঁথে গলায় পরালেই পারে। ইনি হলেন ইন্দ্র। আর একজন আসে সে হল বনের মা—সে যে দেখতে কত সুন্দর না দেখলে বোঝানো যায় না।

তুমি তো গোপালকে দুই হাতে ননী খাওয়াও—সেই বনের মা তোমার গোপালকে কোলে নিয়ে দশ হাতে ননী খাওয়ান—ইনি হলেন জগজ্জননী মহামায়া দেবী দুর্গা। সখার দল বর্ণনা করে করে সব ঠিক ঠিক বলে, কিন্তু তারা তো নাম জানে না। তাই নাম করে করে বলতে পারে না। যেমন বেদান্তদর্শন ব্রহ্মাকে নেতিমুখে বলেছেন—স্পষ্ট করে ভাষা দিয়ে ইনিই ব্রহ্ম—এরকম নাম করে বলতে পারেন নি। বললেন—তিনি অস্পর্শ, অরূপ, অগন্ধ, অরস অশব্দ-অদীর্ঘ, অহ্রস্ব-অস্থূল, এইরকম ন ইতি ন ইতি এটি নন এটি নন করে বললেন—কিন্তু ইনিই ব্রহ্ম এইরকম ভাষা দিয়ে স্পষ্ট করে বলতে পারেন নি—এইটিই বেদান্তের নেতিবাদ। ছেলেরাও তেমনি বর্ণনা দিয়ে ঠিকই বোঝাচ্ছে—কিন্তু নাম করে ইনি ব্রহ্মা, ইনি শিব, ইনি ইন্দ্র—এরকম করে বলতে পারছে না। তাহলে ব্রজে লীলায় সখারা ঐশ্বর্য্য চোখে দেখছে, কিন্তু মানতে পারছে না—এমনই তাদের প্রেমের প্রাবল্য। এ হল ব্রজের সখ্যরস। কিন্তু ব্রজ ছাড়া অন্য জায়গায় সখা—যেমন অর্জ্জুনদেব, উদ্ধবজী তারা তো সখা—সখ্যের নিঃসঙ্কোচ প্রীতি নিজস্ব বৃত্তি হলেও ব্রজ ছেড়ে অন্য জায়গায় সখ্য রসে সঙ্কোচ আছে—ঐশ্বর্য্যবোধ আছে কারণ সেখানকার সখ্যরস বিশুদ্ধ নয়। তাই অর্জ্জুন ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শন করে নিজ ব্যবহারে সঙ্কুচিত হয়েছেন, ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন—বলতে হয়েছে তাঁকে—

সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং
হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং
ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাহপি॥ গী ১১৪১

তোমার এই মহিমার কথা আমার জানা ছিল না—তাই তোমাকে কৃষ্ণ বলে ডেকেছি, যাদব বলে ডেকেছি, সখা বলে ডেকেছি। এক শয্যায় শয়ন করেছি, এক আসনে উপবেশন করেছি, এক পাত্রে ভোজন করেছি আমার এ ব্যবহারে আমি নিজেই সঙ্কুচিত। তুমি আমায় ক্ষমা করো। সখ্যপ্রেমে যদি সঙ্কোচ আসে, সম্ভ্রম বোধ আসে, তাহলে সখ্যরস মলিন হয়ে যায়। উদ্ধবজীও ভগবানকে ভগবত্তার বোধে ঐশ্বর্য্যসূচক সম্বোধনই করেছেন—'হে যোগেশ, যোগবিন্যাস, হে যোগেশ্বর।' অবশ্য অর্জ্জুনদেবের চেয়ে উচ্চস্তরের সখা উদ্ধবজী। কারণ উদ্ধবজীকেই ভগবান

ব্রজে তাঁর নিজের প্রতিনিধি করে পাঠিয়েছেন—অর্জ্জুনকে পাঠান নি। উদ্ধবজীর সম্বন্ধেই ভগবান বলেছেন—'উদ্ধব আমার চেয়ে কিছু কম নয়। উদ্ধব আমার প্রিয়তম, ভৃত্য, সখা, সুহৃদ।' তবু উদ্ধবজীর ওপরেও ব্রজের সখাদের স্থান।

তাই ব্রজলীলার সখ্যপ্রেমে ব্রজের সখাদের সৌভাগ্য সূচনা করে শ্রীশুকদেব বললেন—

ইত্থং সতাং ব্রহ্মাসুখানুভূত্যা দাস্যং গতানাং পরদৈবতেন।
মায়াশ্রিতানাং নরদারকেণ সাকং বিজহ্রুঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ॥

ভাঃ ১০।১২।১১

শ্রীগোবিন্দের বাল্যলীলা প্রসঙ্গে গোচারণলীলা দর্শন করতে করতে শ্রীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিৎকেও নিজ কৃপাবলে সেই লীলা দর্শন করাতে করাতে বলছেন—'মহারাজ যে সব গোপবালক গোবিন্দের সঙ্গে গোচারণ লীলায় আছেন তাঁরা অনেক অনেক পুণ্য করেছেন—এ পুণ্য বলতে কোন প্রাকৃত পুণ্য বুঝাচ্ছে না, কারণ প্রকৃত পুণ্যের ফলে ভগবানে প্রেম হয় না—এ পুণ্য হল মহৎ কৃপা। কার সঙ্গে এরা গোচারণ করছেন জানেন মহারাজ? যাঁকে জ্ঞানবাদীরা ব্রহ্মানন্দরূপে অনুভব করেন, জ্যোতিরূপে দর্শন করেন, প্রেমভক্তি লাভের অধিকারী হয়ে দাসভক্তগণ যাঁকে পরম-দেবতা পরমেশ্বররূপে জানেন, আবার ভগবানের মায়ায় মুগ্ধ হয়ে যারা সেই ভগবানকে শুধু মানুষ আকৃতি দেখে মানুষ বুদ্ধি মাত্র করে—তাঁর সঙ্গে এই গোপবালকেরা গোচারণ লীলায় আছেন। এই ব্রজবালকদের সৌভাগ্যের তুলনা হয় না।

শ্রীমন্মহাপ্রভু এই সখ্যপ্রেমের কথা শুনে এবং আস্বাদন করে আনন্দ পেয়েছেন। তাই বললেন—

প্রভু কহে, 'এহো উত্তম আগে কহ আর।'
রায় কহে, 'বাৎসল্য প্রেম সর্ব্বসাধ্যসার।।'

সখ্য প্রেমের উপরে বাৎসল্যপ্রেম—রামানন্দকে শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃপাপ্রেরণায় অগ্রসর করাচ্ছেন। স্তরে স্তরে এই ভক্তিরসের আস্বাদনে ভক্তিপেটুক রসলম্পট গৌরসুন্দরের আনন্দের অবধি নেই।

ষষ্ঠ ধারা

বাৎসল্য প্রেম

রসলোলুপ শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীপাদ রামানন্দ রায়ের শ্রীমুখে যখন কৃপা করে বলালেন—

'বাৎসল্যপ্রেম সর্ব্বসাধ্যসার'

তখন মহাপ্রভুর খুব ভাল লেগেছে—উত্তম খাদ্য পাতে পড়েছে। আস্বাদনের আধিক্যে গৌর ডগমগ হয়ে আছেন। ভগবানকে পুত্ররূপে ভালবাসা এবং নিজেকে মাতা বা পিতা মনে করা এ প্রেমের তুলনা হয় না। যেমন ব্রজে পিতা নন্দমহারাজ এবং বাৎসল্যবতী মাতা যশোমতী যাঁর কাছে গোপাল প্রেমরজ্জুতে বাঁধা পড়েছে। কারণ একমাত্র প্রেম ছাড়া ভগবানকে অন্য কিছু নিয়ে বাঁধা যায় না। মা যশোদার বিশুদ্ধ বাৎসল্য প্রেমই রজ্জু হয়ে গোপালকে বেঁধেছে। সখ্যভক্তির ওপরে এই বাৎসল্য ভক্তি। তাই বাৎসল্য প্রেম সর্ব্বসাধ্যসার বলাতে মহাপ্রভুর তৃপ্তি হয়েছে।

রসরাজ শ্রীগৌরাঙ্গ নটের কৃপা আকর্ষণে রামানন্দ সখ্য রস থেকে বাৎসল্য রসে পৌঁচেছেন—ভক্তিপেটুক গৌরসুন্দরের মনে ভক্তির ছোঁয়া লেগেছে। দাস্যভক্তি সখ্যভক্তিতে ভক্তির স্পর্শ হয়েছে—কিন্তু ঠিক আস্বাদন হয় নি। পেট যেন ঠিক ভরে নি। যার বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা দু'এক গ্রাসে তার কি হবে? তবে ভক্তিরাজ্যের প্রথম সোপানের স্পর্শ পেয়েই রসিকশেখর যেন একটু চমকিত হয়েছেন। ভাবছেন, পথে তো এসেছে দেখছি কিন্তু এখানেই তো থামলে চলবে না। উৎসাহ দিয়ে আকর্ষণ করে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। নিজে আস্বাদন করবার জন্য এবং ভূরিদাতা স্বরূপে সেই আস্বাদন রামানন্দকে দেবার জন্য প্রেরণা দিয়ে বলাচ্ছেন।

এই বাৎসল্য প্রেমের প্রসঙ্গে ব্রজপরিকর নিত্য পিতা নন্দ মহারাজ এবং নিত্য মাতা যশোমতী। নন্দ মহারাজ পুত্র গোপালকে দিয়ে নিজের পাদুকা বইয়েছেন, ভগবানও প্রেমবশীভূত হয়ে পাদুকা বয়েছেন। আর যশোদা মায়ের তো সৌভাগ্যের তুলনা হয় না—তাঁর সম্বন্ধে শ্রীশুকদেবের কাছে মহারাজ পরীক্ষিৎ বলেছেন, 'মহাভাগা'—মহাভাগ্যবতী জননী যশোদা। যিনি কোটি প্রাণপ্রিয় গোপালকে অফুরন্ত বাৎসল্য প্রেমের

প্রভাবে স্তন্য পান করিয়েছেন এবং বেঁধেছেন। মায়ের বাৎসল্য প্রেমই রজ্জু হয়ে গোপালকে বেঁধেছে। তা না হলে ভগবানকে তো প্রেম ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে বাঁধা যায় না। দেখতে সেটি দড়ি কিন্তু উপাদান হল মায়ের হৃদয় উজাড় করা বাৎসল্য প্রেম। তাই এই দামকে (দড়ি) পদ্মপুরাণের ঋষি শ্রীসত্যব্রতমুনি প্রণাম করেছেন—স্তুতি করেছেন—

'নমস্তেহস্তু দাম্নে স্ফুরদ্দীপ্তি ধাম্নে'—

ওগো দাম তোমাকে শতকোটি প্রণাম। মুনি প্রার্থনা করছেন—মাগো! যে রজ্জু দিয়ে তুমি গোপালকে বেঁধেছ সেই প্রেমরজ্জুর কণা যদি কৃপা করে আমাকে দান কর তাহলে আমি ধন্য হয়ে যাব।

রসের সাগর রামানন্দ সন্নিধানে আজ রসিকশেখর শ্রীমন্মহাপ্রভু বসেছেন লোলুপ হয়ে। একজন রসদাতা আর একজন রসভোক্তা। একজন রস যোগান দিচ্ছেন আর একজন রস আস্বাদন করছেন। আস্বাদন করে যেন তৃপ্তি হচ্ছে না। পেটুক লোকের যেমন কিছুতে পেট ভরে না। শ্রীগৌরসুন্দর রামানন্দকে তাঁর লক্ষিত বস্তুর দিকে একটু একটু করে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। অগ্রসর হতে হতে বাৎসল্য প্রেম পর্য্যন্ত এসে পৌঁছেছেন।

গৌরসুন্দর স্বয়ং ভগবান। এতে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। কারণ একবার অধর্ম (যিনি কলিরাজের সখা) কলিযুগরাজকে প্রশ্ন করেছিলেন—যুবরাজ! কোহসৌ কুমারকঃ—কিং কুৎসিতো মারকঃ কিং কোঃ পৃথিব্যামারকঃ? যুবরাজ এই কুমারটি কে? ইনি কুৎসিত মারক না কু অর্থাৎ পৃথিবীর মারক? কলি যুগরাজ যে মহাপ্রভুর কাছে ভয় পাচ্ছেন, তাতেই বুঝা যাচ্ছে মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান। আর তাঁর ভগবত্তার আর একটি দিক—তিনি সর্ব্বচিত্তাকর্ষক। মহাজন বললেন—

সকলজনের মন করিবারে আকর্ষণ
বিধাতা কি পাতিয়াছে ফাঁদ
একবার যেই হেরে সে আঁখি ফিরাতে নারে
মন উন্মাদন গোরাচাঁদ॥

কারণ সর্ব্বচিত্তাকর্ষকত্বই ভগবত্তা। ভগবানের অন্যান্য অবতারে দেখা যায় ভক্ত ভগবানের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করছেন কিন্তু গৌর লীলায়

দেখা যাচ্ছে ভগবান ভক্তের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করছেন। এ এক বিচিত্র লীলা—এটি—রস আস্বাদনের একটি অপূর্ব্ব দিক। গৌর হলেন ভক্তের পায়ে ধরা ভগবান।

'বাৎসল্য প্রেম সর্ব্বসাধ্যসার।'

এস সিদ্ধান্ত শুনে মহাপ্রভু পরম পরিতৃপ্ত। বললেন—'এহো উত্তম'। সখ্যরসের চেয়ে বাৎসল্যের উৎকর্ষ। সখ্যরসের নিঃসঙ্কোচ প্রীতি বাৎসল্যে আছে, কারণ সন্তান জ্ঞানে গুণে যতই বড় হোক পিতামাতা তাঁকে সঙ্কোচ করেন না। কিন্তু বাৎসল্যের যে দরদ এটি তাঁর নিজস্ব—এ দরদ সখাতে আশা করা যায় না। সখার জন্য সখার দরদ আছে কিন্তু পিতামাতার মত নয়। তাই বাৎসল্য রস সখ্যরসের উপরে দাঁড়িয়েছে। মহাপ্রভু তো সখ্যরসকে উত্তম বলেছেন—বাৎসল্য রসকেও তো উত্তমই বললেন। তাহলে সখ্য ও বাৎসল্য কি সম পর্য্যায়! সখ্যরসের ওপরে বাৎসল্য হবে কোন বিচারে? তখন মহাজন সিদ্ধান্ত করেছেন—সখ্যরসে তাড়ন ভর্ৎসনা লালন নেই—কিন্তু বাৎসল্যরসে যে তাড়ন ভর্ৎসন লালন এইটিতেই রসের বিচারে সখ্যরসের ওপরে বাৎসল্য। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ বললেন—

মাতা যৈছে পুত্ররূপে করেন পালন।
অতি হীন জ্ঞানে করেন তাড়ন ভর্ৎসন॥
আপনাকে বড় মানে আমাকে সম হীন।
তার প্রেমে বশ আমি হই ত অধীন॥

মহারাজ পরীক্ষিৎও এই বাৎসল্য রসের কথা শুনে মুগ্ধ হয়ে প্রশ্ন করেছেন—

নন্দঃ কিমকরোদ্‌ব্রহ্মণ্ শ্রেয় এবং মহোদয়ং।
যশোদা চ মহাভাগা পপৌ যস্যাঃ স্তনং হরিঃ।

ভাঃ ১০।৮।৪৬

কোন্ পুণ্যে নন্দ মহারাজ এবং যশোদা মা গোপালকে এইভাবে আস্বাদন করেছেন—যশোদা মা হরিকে স্তন্য পান করিয়েছে। মা তো গোপালকে বেঁধেই দিলেন—এইটুকু সঙ্কোচ থাকলে এ রকম আচরণ করা যায়?

মহাপ্রভু রামানন্দ রায়কে কৃপারজ্জুর আকর্ষণে বাৎসল্য রস পর্য্যন্ত এনে আস্বাদন করছেন এবং রামানন্দকেও আস্বাদন করাচ্ছেন। কারণ

প্রীতিরাজ্যের এইটিই স্বভাব—একা ভোগ করতে পারে না—তাছাড়া বিতরণে অর্থাৎ দানেই আস্বাদনের পরিপাটি—দান না করলে আস্বাদন সম্পূর্ণ হয় না। রামানন্দ বললেন—প্রভু, বাৎসল্য রসে মা যশোমতী গোপালকে যেভাবে আস্বাদন করেছেন—সে আস্বাদন আর কেউ করতে পারে নি। কারণ মা গোপালকে দড়ি দিয়ে বেঁধেছেন। বাঁধবার প্রকারটিও শ্রীশুকদেব সুন্দরভাবে বলছেন। গোপাল তো বড় দুরন্ত হয়েছে—কাজেই তাকে শাসন করতে হবে। অন্যদিন পরের ঘরে যখন দৌরাত্ম্য করে তখন প্রতিবেশীরা এসে মায়ের কাছে নালিশ করেন কিন্তু মা সে কথা কানেই তোলেন না—বরং তাদেরই আবার তিরস্কার করেন কিন্তু আজ তো গোপাল নিজের ঘরেই অপরাধ করেছে। দই-এর ভাঁড়টা ভেঙে রেখে এসেছে তাই তাকে শাসনের সুরে মা বলছেন—'ভোঃ গৃহলুণ্ঠাক, বানরবন্ধো, চঞ্চলগাত্র, আরে ঘর চোরা ছেলে, বানরের বন্ধু—অত্যন্ত চঞ্চল তোকে আজ পরের ঘরে যেতে দেব না, খেলতে দেব না, খেতেও দেব না, বেঁধে রাখব।' মা গোপালকে ভারী উদূখলের সঙ্গে একটি দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখবেন। আন্দাজমত দড়ি জোগাড় করেছেন কারণ গোপালের ক্ষীণকটি মায়ের মুঠিতে ধরা পড়ে তাই আন্দাজ কম হবার কথা নয়—উদূখলের সঙ্গে দড়িটা ঘুরিয়ে গোপালের কটিদেশের সঙ্গে বেঁধে দেবেন—এ আবার কি এমন কঠিন কাজ? কিন্তু বাঁধতে গিয়ে দেখলেন দুই মুখ জোড়া লাগছে না, মাঝখানে দু' আঙ্গুল ফাঁক থেকে যাচ্ছে। মা ভাবছেন, দড়ি কম পড়ায় তো কথা নয় তবে হয়ত আমার আন্দাজ ঠিক হয়নি—আর একটা দড়ি তার সঙ্গে জোড়া দিলেন, আবার ঘোরাতে গিয়ে দেখেন ঠিক সেই দু' আঙ্গুল কম। আবার দড়ি জোগাড় করে গিট দিয়ে লম্বা করে আবার বাঁধতে গেছেন—দেখলেন ঠিক সেই দু' আঙ্গুল কম। এই রকম করে যত দড়ি জোগাড় করছেন গিট দিচ্ছেন, লম্বা করছেন—প্রতিবারেই ঠিক দু' আঙ্গুল ফাঁক। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ বলেছেন—শত হস্ত পরিমিত রজ্জু দিয়েও মা গোপালকে বাঁধতে পারছেন না। মায়ের বিস্ময় হয়েছে—বিস্ময়ের দুটি কারণ—(১) প্রতিবারে ঠিক দু' আঙ্গুল কম—এক আঙ্গুল নয়, তিন আঙ্গুল নয়, চার আঙ্গুল নয়, আর (২) গোপালের উদর তো ফুলে ফুলে বড় হচ্ছে না এবং দড়ির তো একতিল কমছে না, তবে বাঁধা যাবে না কেন?

আর তা ছাড়া আমার পেটের ছেলে আমি বাঁধতে পারব না তা কখনও হয়? নিশ্চয়ই বাঁধব। এইভাবে মা কত চেষ্টা করছেন—জেদ চেপেছে যে যেমন করে হোক্ আজ গোপালকে বাঁধবই। এই রকম পরিশ্রম করার ফলে মা ঘেমে গেছেন। গোপাল লক্ষ্য করেছে, দেখছে মা আমাকে বাঁধবার জন্য এত পরিশ্রম করছে, আমি বাঁধা পড়লে মা সুখী হয়—মায়ের এত পরিশ্রম তো চোখে দেখা যায় না—তাহলে আমি বাঁধা পড়ি। শ্রীশুকদেব বললেন—

স্বমাতঃ স্বিন্ন গাত্রায়া বিস্রস্তকবরস্রজঃ।
দৃষ্টা পরিশ্রমং কৃষ্ণঃ কৃপয়াসীৎ স্ববন্ধনে॥

ভাঃ ১০।৯।১৮

মায়ের অতিরিক্ত পরিশ্রমে কেশ আলুলায়িত, কবরী বন্ধন খসে গেছে, ঘর্মাক্ত কলেবর তখন গোপাল ইচ্ছা করলেন আমি বাঁধা পড়ি—তখনই বন্ধন হয়ে গেল। আর দু' আঙ্গুল ফাঁক রইল না। দু' আঙ্গুলের যে ফাঁক তার তাৎপর্য্য শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ দেখিয়েছেন—ভক্তের দিক থেকে ভজনের পরিশ্রম যখন সম্পূর্ণ হবে এবং তাই দেখে ভগবানের কৃপা যখন সম্পূর্ণ হবে তখন আর দু' আঙ্গুল ফাঁক থাকবে না—ভরাট হয়ে যাবে অর্থাৎ তখনই বন্ধন হবে যাবে। ভক্তনিষ্ঠা ভজনোত্থা শ্রান্তিস্তদ্দৃষ্ট্বা স্বনিষ্ঠা কৃপা চ। মায়ের ক্ষেত্রে বন্ধন ভক্তের পক্ষে ভগবানকে বশীভূত করা। বন্ধন করা মানেই সম্পূর্ণ বশীভূত করা। ভক্ত ভগবানকে কখন বশীভূত করবে, যখন ভক্তের দিক থেকে ভজনের পরিশ্রম সম্পূর্ণ হবে এবং তাই দেখে ভগবানের কৃপাও যখন সম্পূর্ণ হবে তখন ভগবান ভক্তের কাছে সম্পূর্ণ বশীভূত হবেন। মাকে উপলক্ষ্য করে ভগবান জগতে দেখালেন কেমন করে তাঁকে বশীভূত করা যায়। তা না হলে মায়ের কাছে তো গোপাল বাঁধাই আছেন—মা আবার নূতন করে কি বাঁধবেন? তবে ভগবানের এই লীলা প্রকাশ ভক্ত জগতে কিছু শিক্ষা দেবার জন্য। যদি কোন ভক্ত মায়ের মত করে তাঁকে বাঁধতে চান তাহলে মা যেমন বাঁধবার জন্য পরিশ্রম করেছেন ভক্তকেও সেইভাবে ভজনে পরিশ্রম করতে হবে এবং সেই পরিশ্রম দেখে ভগবানের কৃপা যখন সম্পূর্ণ হবে তখনই বন্ধন হবে অর্থাৎ ভগবান বশীভূত হবেন। অবশ্য এখানে মায়ের সম্বন্ধে গোপলের 'কৃপা' কথাটি উল্লেখ করলেন—এতে একটু আলোচনার

আছে। কারণ মায়ের সম্বন্ধে গোপাল কৃপা করলেন এটি কি ঠিক বলা যায়? বললে যেন মানায় না—তবু কৃপা না বলেও তো উপায় নেই—কারণ 'কৃপা' ছাড়া অন্য কোন পদ তো অভিধানে পাওয়া যায় না। সিদ্ধান্ত তো বজায় রাখতে হবে।

স্বমাতঃ স্বিন্নগাত্রায়া বিস্রস্তকবরস্রজঃ।
দৃষ্টা পরিশ্রমং কৃষ্ণঃ কৃপয়াসীৎ স্ববন্ধনে॥ ভাঃ ১০।৯।১৮

শুকদেবের এ বাক্যে 'কৃপা' পদটি যেন কানে একটু বাজে। গোপাল তো পুত্র আর যশোমতী হলেন জননী। মা ছেলেকে কৃপা করলেন এটি বললে ঠিক মানায়—এখানে কিন্তু তার বিপরীত দেখা যাচ্ছে। গোপাল মাকে কৃপা করে মায়ের বন্ধনে ধরা দিলেন। ছেলে মাকে কৃপা করলেন বললে একটু আশ্চর্য্য মনে হয় না? ছেলে আবার মাকে কৃপা করবে কি? ছেলেই তো কৃপা গ্রহণ করবে। আর মা তো কৃপা করবেন। তবে শ্রীশুকদেব এখানে এভাবে 'কৃপা' পদটি উচ্চারণ করলেন কেন? আরও মন্তব্য করেছেন—

নেমং বিরিঞ্চো ন ভবো ন শ্রীরপ্যঙ্গসংশ্রয়া।
প্রসাদং লেভিরে গোপী যত্তৎ প্রাপ বিমুক্তিদাৎ॥
ভাঃ১০।৯।২০

গোপী যশোদা ভগবানের যে প্রসাদ (কৃপা) লাভ করেছেন সে প্রসাদ ব্রহ্মা পুত্র হয়েও পান নি, শঙ্কর অভিন্ন তনু হয়েও পান নি, এমনকি মহালক্ষ্মী ভগবানের অঙ্কশায়িনী বক্ষোবিলাসিনী হয়েও সে প্রসাদ পান নি। এখানেও সেই প্রসাদ বা কৃপা পদ। আমরা ভাবছি 'প্রসাদ' বা 'কৃপা' পদটি প্রয়োগ করা যক্তিসঙ্গত হয় নি। শ্রীশুকদেব কি এ বিষয়ে চিন্তা করেন নি? তিনি অনেক ভেবেছেন, কিন্তু দেখলেন এ 'কৃপা' বা 'প্রসাদ' পদ ছাড়া অন্য কোন পদ বসানো চলে না। কারণ এছাড়া অন্য কোন পদ তো অভিধানে নেই। কারণ সিদ্ধান্ত তো বজায় রাখতে হবে। সিদ্ধান্ত কি?

একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য।
যারে যৈছে নাচায় সে তৈছে করে নৃত্য॥

একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ অর্থাৎ কৃষ্ণ একমাত্র একক ঈশ্বর। ঈশ্বর একা তিনিই। আর সব ভৃত্য। আর সব বলতে কৃষ্ণ বাদ দিয়ে আর সব। এই সব

এর মধ্যে তাই মা যশোদাও তো পড়েন। ভৃত্য বলতে ভক্ত বুঝায়। শ্রীশুকদেব শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রে ভগবান শ্রীগোবিন্দের সম্বন্ধে একটি বিশেষণ দিয়েছেন—'ভৃত্যানুগ্রহকাতরঃ'—ভৃত্য অর্থাৎ ভক্তকে অনুগ্রহ করবার জন্য তিনি সর্ব্বদা কাতর। তাহলে মা যশোমতী ভক্তকোটিতে পড়েন। ভগবান যার প্রতি যা করবেন সেটি তাঁর 'কৃপাই' বলতে হবে। তাঁর কৃপা ছাড়া কিছুই সম্ভব নয়। তবে তো বলা ঠিক হবে—'যারে যৈছে নাচায় সে তৈছে করে নৃত্য।' তাই মা যশোদার প্রতি ভগবান যা করবেন সেটিকেও কৃপাই বলতে হবে। এছাড়া উপায় কি? তা নাহলে সিদ্ধান্ত দোষ পড়ে। মহাজন বললেন—

সিদ্ধান্ত করিতে কভু না কর অলস।
সিদ্ধান্তে লাগায় কৃষ্ণে সুদৃঢ় মানস॥

সুতরাং শ্রীশুকদেব যে 'কৃপা বা 'প্রসাদ' কথাটি উচ্চারণ করেছেন সেটি ঠিকই হয়েছে। কিন্তু এর মধ্যে একটু লক্ষ্য করবার বিষয় আছে—কথা দিয়ে 'কৃপা' বলা হয় বটে, কিন্তু ভগবানের আচরণটি দেখতে হবে। সেখানে কিন্তু অসামঞ্জস্য এতটুকু নেই। ভগবানের আচরণ কিন্তু নিখুঁত। শ্রীবালগোপাল মায়ের সঙ্গে যে আচরণ করেছেন তাতে মাকে তিনি অনুগ্রহ বা কৃপা করছেন এটি কখনও দেখা যায় নি। তাঁর আচরণে সর্ব্বদাই দেখা যাচ্ছে ভগবান অনুগ্রাহ্য আর মা অনুগ্রাহিকা। মা অনুগ্রহ করছেন এবং গোপাল সেই অনুগ্রহ আঁচল ভরে গ্রহণ করতেন। অনাদিরাদি শ্রীগোবিন্দ সর্ব্বকারণকারণম্ বলে ব্রহ্মা বাক্‌পতি যাঁকে স্তুতি করেছেন—'যাঁর প্রতি রোমকূপে অনন্ত কোটি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ত্রসরেণুর মত যাওয়া আসা করে সেই সর্ব্বেশ্বর অখিল ব্রহ্মাণ্ডের নাথ শ্রীবাল গোপাল মা যশোদার আঁচল ধরে ধরে ঘুরছেন, কাতরভাবে বলছেন, 'মা একটু ননী দেবে'—যেন মা একটু ননী না দিলে গোপালের পক্ষে ননী পাওয়ার কোন উপায়ই নেই। এমনই অনুগ্রহের ভিক্ষারী গোপাল। তাই দেখা যায় ভগবানের আচরণের দিক দিয়ে কোন ত্রুটি নেই। তবে কথা দিয়ে বলতে গেলে 'কৃপা' কথাটি ছাড়া অন্য কোন পদ বসান যায় না। তাই শুকদেব বাধ্য হয়ে 'প্রসাদ' বা 'কৃপা' পদটি উল্লেখ করেছেন।

এই বাৎসল্য প্রেমের কথা যখন শ্রীপাদ রামানন্দ রায় উচ্চারণ করলেন তখন মহাপ্রভুর ভাল লাগল—রামানন্দ রায় যে পর পর রসের

ধাপে ধাপে উঠেছেন, পরিবেশন করছেন এটি শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরেরই কৃপার আকর্ষণ। গৌরসুন্দর তাঁকে পরে পরে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন কিন্তু ঠিক লক্ষ্যস্থানে না পৌঁছানো পর্যন্ত তো রসভোক্তার তৃপ্তি হতে পারে না। অশেষ বিশেষ রসপিপাসু শ্রীমন্মহাপ্রভু আস্বাদনের লোভে ক্রমশঃ এগিয়ে যাচ্ছেন এবং লোভাতুর হয়ে রামানন্দকেও ক্রমশঃ এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। আমার পরমারাধ্য শ্রীগুরুদেব ১০৮ শ্রীল রামদাস বাবাজী মহারাজের শ্রীমুখে কীর্ত্তনের মাধ্যমে শুনেছি—

বড় ভোগী গৌর আমার
ভোগ ছাড়া রইতে নারে।

বাৎসল্য রসের আস্বাদনে গৌরের মন মজেছে—নিজের প্রতিজ্ঞা বাক্যেও সেটি ধরা পড়েছে।

'চারি ঠাঁই আমি থাকি সর্ব্বদাই।'

এই চারটি স্থান হল—শ্রীবাস অঙ্গন, রাঘব ভবন, নিত্যানন্দ নর্ত্তন এবং মাতা শচীদেবীর রন্ধন। মা শচীদেবীর অফুরন্ত বাৎসল্য প্রেমে গৌরগোপাল বাঁধা। মায়ের ডাকে ছেলে কি সাড়া না দিয়ে পারে? মায়ের কাছে ছেলে যে চিরদিনই বাঁধা। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু রামানন্দ রায়ের বক্যেকে উৎসাহিত করেছেন—

প্রভু কহে, 'এহোত্তম আগে কহ আর!'
রায় কহে, 'কান্তাপ্রেম সর্ব্বসাধ্যসার ॥'

সপ্তম ধারা

কান্তাপ্রেম

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাপুষ্ট কণ্ঠে রায় রামানন্দ সিদ্ধান্ত করলেন—

প্রভু কহে, 'এহো উত্তম, আগে কহ আর।'

রায় কহে, 'কান্তাপ্রেম সর্ব্বসাধ্যসার॥'

শ্রীমন্মহাপ্রভু রামানন্দের শ্রীমুখে পর পর রসের বিচারে আনন্দ পেয়েছেন—তবু যেন ঠিক লক্ষ্য স্থানে এখনও পৌঁছুন হয় নি—তাই যেন কিছু অতৃপ্তি—কিছু ক্ষুধা—পেট এখনও ভরে নি। তাই বললেন—'আগে কহ আর।'

লক্ষিত স্থানে না পৌঁছুন পর্য্যন্ত মহাপ্রভুর তৃপ্তি নেই। গৌরসুন্দর যেন বলতে চাইছেন—রসের বিচারে পর পর উত্তম হয়েছে বটে—কিন্তু এর ওপরেও আর একটি রস আছে যাকে সাধ্যসার বলতে পার। রায় মহাপ্রভুর মন বুঝে বললেন—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কান্তভাবই প্রেমের পরাকাষ্ঠা রূপ সাধ্যগণের সার। এর তাৎপর্য্য হল—সাধারণ প্রেমে সম্বন্ধের অভাব—যেটি শান্তরস আর সম্বন্ধের অভাব হলেই মমতারও অভাব বুঝা যাবে—এইজন্যই শান্তরসকে সম্বন্ধ লক্ষণা ভক্তি বা প্রেমলক্ষণা ভক্তি থেকে মহাজন বাদ দিয়েছেন। কারণ সম্বন্ধ বোধের ওপরেই তো মমতা। সম্বন্ধ যেখানে যত বেশী সেখানে মমতা তত বেশী। সম্বন্ধ বোধ না থাকলে মমতা আসে না। তাই ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র যখন ব্রজবাসীকে সান্ত্বনা দেবার জন্য উদ্ধবজীকে ব্রজে পাঠালেন—তখন জ্ঞানীতত্ত্বজ্ঞ উদ্ধব নন্দমহারাজের কাছে যখন গেলেন তখন তত্ত্ব কথা শুনিয়ে প্রথমেই নন্দমহারাজের যে শ্রীকৃষ্ণে পুত্র সম্বন্ধ এটি ভোলাতে চেয়েছেন। কারণ সম্বন্ধ না ভুললে মমতা (প্রীতি) কমবে না এবং প্রীতি না কমলে ব্যথা কমবে না। তাই উদ্ধবজী তত্ত্বকথার অবতারণা করছেন—'মহারাজ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র আপনার গোপাল স্বরূপে তো ভগবান—তিনি পরমাত্মা, উদাসীন, সাক্ষী। তাঁর সঙ্গে কোন সম্পর্ক হয়? তিনি কারও পুত্র হন না—সখা হন না—পতি হন না। তাঁকে পুত্র মনে করেই তো আপনি ব্যথা পাচ্ছেন। উদ্ধবজী চেষ্টা করেছেন সম্বন্ধ ভোলাবার কিন্তু নন্দমহারাজের গাঢ় বাৎসল্য প্রেমে এ তত্ত্বকথা কোন কাজ করতে পারে

নি। নন্দমহারাজের কানে তত্ত্বকথা প্রবেশ করলেও অন্তরে প্রবেশ করতে পারে নি—তাই কোন ক্রিয়া হয় নি। মহারাজ পুত্র সম্বন্ধে ভুলতে পারেন নি। তাই প্রেম তার হাল্কা হয় নি—সুতরাং ব্যথার মাত্রা এতটুকু কমে নি। এর পরে যখন সম্বন্ধ লক্ষণা ভক্তির প্রথম স্তর দাস্যভক্তি রামানন্দ বললেন তখন সম্বন্ধ স্থির হল বটে, সুতরাং মমতা (প্রীতি) হল কিন্তু তাতে নিঃসঙ্কোচ ভাবের অভাব। দাস্যপ্রেমে সাধ্বস আছে, সঙ্কোচ আছে—কাজেই কিছু অপূর্ণতা। এর ওপরে সখ্যপ্রেম—তাতে সম্বন্ধ তো আছেই—সুতরাং প্রীতি আছে—নিঃসঙ্কোচ ভাব তো তার নিজস্ব বৃত্তি—সে দিক দিয়ে কোন ত্রুটি নেই কিন্তু একান্ত দরদের অভাব—সখার জন্য সখার দরদ থাকে কিন্তু এর ওপরে আরও গাঢ় দরদ আছে যেটির অভাব সখ্য রসে—তাই সখ্য প্রেমেও কিছু অপূর্ণতা। সখ্য প্রেমের ওপরে বাৎসল্য প্রেম—বাৎসল্যে একান্ত দরদের অভাব পূর্ণ হল বটে—কারণ বাৎসল্যে (পিতামাতার) যে দরদ তার তুলনা হয় না; কিন্তু এখানেও একটা অভাব আছে, সেটি হল প্রণয় রস—কারণ বাৎসল্যের কাছে প্রণয় রস লজ্জিত। প্রণয় রস হল মধুর রসের অর্থাৎ কান্তা প্রেমের নিজস্ব বৃত্তি। এই বাৎসল্যে যায় না। তাই বাৎসল্যেও কিছু অপূর্ণতা, অভাব থেকে গেল। তাই সাধ্য প্রেমের পূর্ণতা দাস্য সখ্য বাৎসল্যে হতে পারে নি। কৃষ্ণে যখন কান্ত ভাবের উদয় হয় তখনই ঐ সকল অভাব আর থাকে না। তাই কান্তা প্রেমে মধুর রসে সকল সাধ্যের সার একটি অখণ্ড প্রেমতত্ত্ব পাওয়া যায়।

শ্রীমন্মহাপ্রভু রামানন্দ রায়কে নিজ শক্তিসঞ্চার করে কান্তাপ্রেম সর্ব্বসাধ্যসার এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে দিয়েছেন। গৌরসুন্দরের তৃপ্তি যেন লক্ষিত স্থানে পৌঁছুব পৌঁছুব হয়েছে। শাস্ত্রে পঞ্চ রস। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। কাব্যে যেমন নবধা রস—শাস্ত্রে তেমনি পঞ্চরস। পর পর রসের উৎকর্ষ। শান্ত রসকে বাদ দিয়ে সম্বন্ধলক্ষণা ভক্তির প্রথম স্তর দাস্য ভক্তি। শান্ত রসে কোন সম্বন্ধের বোধ নেই—শুধু ঈশ্বরবোধে উপাসনা। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীপাদ প্রাকৃত জগতের একটি উদাহরণ তুলে এই রসের বিচারে পর পর উৎকর্ষ দেখালেন।

আকাশাদির গুণ যেন পর পর ভূতে।
দুই তিন ক্রমে বাড়ে পঞ্চ পৃথিবীতে॥

পূর্ব্ব পূর্ব্ব রসের গুণ পরে পরে হয়।
দুই তিন গণনে পঞ্চ পর্য্যন্ত বাড়য়॥
গুণাধিক্যে স্বাদাধিক্যে বাড়ে প্রতিরসে।
শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্যের গুণ মধুরেতে বৈসে॥

ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ব্যোম—এই পঞ্চমহাভূতে যেমন পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভূতের গুণ পরপর ভূতে সঞ্চারিত হয়, রসের বিচারেও তাই। শ্রীকবিরাজ গোস্বামিপাদ দৃষ্টান্ত দিলেন—এখানে শেষ থেকে ধরতে হবে—ব্যোম্ অর্থাৎ আকাশের নিজস্ব গুণ শব্দ সেটি পরবর্ত্তী ভূত বাতাসে সঞ্চারিত হয়। বাতাসের নিজস্ব গুণ স্পর্শ তো আছেই উপরন্তু আকাশের গুণ শব্দ পেয়ে বাতাসের দুটি গুণ হল শব্দ ও স্পর্শ। এর পরে তেজ—তেজের নিজস্ব গুণ হল রূপ, এর সঙ্গে মিশেছে বাতাসের স্পর্শ গুণ, আকাশের শব্দ গুণ। তাহলে তেজের হল সবশুদ্ধ তিনটি গুণ শব্দ স্পর্শ রূপ। এর পরে অপ (জল), জলের নিজস্ব গুণ রস কিন্তু আকাশ, বাতাস এবং তেজের গুণ জলে সঞ্চারিত হয়—তাই জলের চারটি গুণ—শব্দ, স্পর্শ, রূপ এবং রস। সব শেষের মহাভূত হল ক্ষিতি অর্থাৎ মাটি—মাটির নিজস্ব গুণ গন্ধ—এর সঙ্গে মিশেছে আকাশ, বাতাস, তেজ এবং জলের গুণ, তাই ক্ষিতি অর্থাৎ মাটির সবশুদ্ধ পাঁচটি গুণ, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ। এখানে যেমন পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভূতের গুণ পরে পরে সঞ্চারিত হয়—রসের বিচারেও তাই। দাস্যরসের নিজস্ব বৃত্তি প্রভুর পাদপদ্মে অকপটে সেবা, এই সেবাবৃত্তি পরবর্ত্তী রসে অর্থাৎ সখ্যরসে সঞ্চারিত হয়। সখ্যরসের নিজস্ব বৃত্তি নিঃসঙ্কোচ ভাব—তার সঙ্গে দাস্যরসের সেবাবৃত্তি সঞ্চারিত হয়ে সখ্যরসের দুটি বৃত্তি সেবা এবং নিঃসঙ্কোচ প্রীতি। এর পরে বাৎসল্যরস—এর নিজস্ব বৃত্তি হল দরদ কিন্তু তাতে সখ্যের নিঃসঙ্কোচ প্রীতি এবং দাস্যের সেবাবৃত্তি দুটিই সঞ্চারিত হয়ে বাৎসল্যে সবশুদ্ধ তিনটি বৃত্তি হয়—দরদ, নিঃসঙ্কোচ প্রীতি আর সেবা। তাই সখ্যরসের ওপরে বাৎসল্য। এর পরে মধুরপ্রেম বা কান্তাপ্রেম। কান্তাপ্রেমের নিজস্ব বৃত্তি প্রণয় রস—কিন্তু পূর্ব্ব পূর্ব্ব রসের বৃত্তি সব মধুররসে সঞ্চারিত হয়। দাস্যের সেবা, সখ্যের নিঃসঙ্কোচ প্রীতি, বাৎসল্যের দরদ, তাই মধুর রসে সবশুদ্ধ চারটি বৃত্তি—সেবা, নিঃসঙ্কোচ প্রীতি, দরদ এবং প্রণয় রস। তাই

বিচারে রসজগতে মধুর রস সর্ব্বোপরি। শ্রীজীব গোস্বামিপাদ দার্শনিক ব্যক্তি, দর্শনের ভাষায় বললেন—সামগ্রী পরিপোষা পরিপোষন্যায়ে মধুর রস সকলের ওপরে। সামগ্রীর পরিপোষ এবং অপরিপোষটি কি রকম? দাস্যরসের সেবাবৃত্তি সখ্যরসে আছে—এটি পরিপোষ কিন্তু সখ্যরসের নিঃসঙ্কোচ ভাব দাস্যে নেই—এটি অপরিপোষ, আবার সখ্যরসের বৃত্তি নিঃসঙ্কোচ ভাব বাৎসল্যে আছে—এটি পরিপোষ কিন্তু বাৎসল্যের দরদ সখ্যে নেই—এটি অপরিপোষ। এর ওপরে মধুর রস। বাৎসল্যের দরদ মধুরে আছে—এটি পরিপোষ। কিন্তু মধুররসের নিজস্ব বৃত্তি প্রণয় রস বাৎসল্যে নেই—এটি অপরিপোষ। তাই শ্রীজীব গোস্বামিপাদ বললেন—সামগ্রী পরিপোষা পরিপোষন্যায়ে মধুরপ্রেম বা কান্তাপ্রেম সকলের ওপরে দাঁড়িয়ে আছে। শাস্ত্রে মধুর রসকে তাই বলা হয়েছে 'রস বিশেষ'। শ্রীগোবিন্দকে মধুররসে ভজনই সকলের ওপরে।

তাহলে তো প্রশ্ন হতে পারে—মধুররস যদি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয় রসবিচারে—তাহলে জগতে তো সকলেই ভগবানকে মধুর রসেই ভজনা করবে। কিন্তু তাতো করে না। কেন করে না? শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ বললেন—

কৃষ্ণ প্রাপ্তির উপায় বহুবিধ হয়।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি তারতম্য বহুত আছয়॥

প্রতিরসের নিজস্ব প্রাধান্য থাকলেও—

কিন্তু যাঁর যেই রস সেই সর্ব্বোত্তম।
তটস্থ হইয়া বিচারিলে আছে তরতম॥

যিনি যে রসে গোবিন্দকে আস্বাদন করেন, ভজনা করেন—তাঁর কাছে সেই রসই সর্ব্বোত্তম, যদিও রস বিচারে পরপর রসের উৎকর্ষ আছে। রসবিচারে যদি মধুর রস সর্ব্বোপরি হয় তাহলে অন্যরসে ভক্ত ভগবানকে ভজবে কেন? তার উত্তরে বলা যায়—'ভিন্নরুচি হি লোকঃ'—লোকের রুচি তো ভিন্ন। খাদ্যের বিচারে যেমন মধুর রসে তো শেষ—কিন্তু সবাই কি মিষ্টি খেতেই ভালবাসে? টক ঝালও তো লোকে ভালবাসে। তেমনি মধুর রস বা কান্তাপ্রেম রস বিচারে সর্ব্বোত্তম হলেও সকলেই গোবিন্দকে মধুররসে ভজবে না—কারণ লোকের রুচি ভিন্ন। কেউ দাস্যরসে, কেউ সখ্যরসে, কেউ বাৎসল্যে, আবার কেউ বা মধুর রসে ভজনা করে। কিন্তু এর মধ্যে একটি কথা আছে—শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ বললেন—

কিন্তু যাঁর যেই রস, সেই সর্ব্বোত্তম।
তটস্থ হইয়া বিচারিলে আছে তরতম॥

যিনি যে রসেই ভগবানকে ভজনা করুন, তাঁর কাছে সেই রসই সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ। সেই রসেই তিনি পূর্ণ হয়ে ডগমগ হয়ে থাকেন। তাঁর আস্বাদনে নিজের স্বরূপে কোন অপূর্ণতা অভাব আছে বলে মনে হয় না। তাই অন্য রসের রসিকের দিকে তার তাকাবার অবসর থাকে না। কারণ তিনি যে রসে আস্বাদন করছেন, তাতেই ভরপুর হয়ে আছেন—যেন সব আস্বাদন করে উঠতে পারছেন না—সুতরাং অন্য রসের দিকে তার তাকাবার অবসর কোথায়? তাই রসজগতে দাস কখনও সখা হতে চায় না—সখা কখনও পিতামাতা (বাৎসল্য) হতে চায় না—আবার পিতামাতা কখনও কান্তা হতে চায় না। যেমন একটা প্রাকৃত দৃষ্টান্ত দিলে কথাটি ভাল করে বুঝতে পারা যাবে। মহাপ্রসাদ পেতে বসেছেন অনেক ভক্ত—যাকে পঙ্গত বলে। তখন কেউ কারো দিকে তাকায় না—কার পাতায় বেশী মহাপ্রসাদ পড়ল সেদিকে কারো লক্ষ্য থাকে না। কারণ তার নিজের পাতায় পরিবেষ্টা যা দিচ্ছেন তাই তো প্রচুর। তার তো কোনও অভাব নেই—যা মহাপ্রসাদ তার নিজের পাতায় তাই তো পেয়ে উঠতে পারছে না—সে আবার অন্য পাতার দিকে তাকাবে কেন? তাছাড়া আর একটি কথা, সবাই যদি গোবিন্দকে মধুর রসে ভজনা করে তাহলে শ্রুতিবাক্য ব্যর্থ হয়ে যায়। শ্রুতি বললেন—'একেঃ দেবো নিত্য লীলানুরক্তঃ।' ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সর্ব্বদা সব লীলারস আস্বাদন করেন। তিনি লীলা পুরুষোত্তম। দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর সব রসের লীলা তিনি সর্ব্বদা আস্বাদন করেন। একটি 'নিত্য' শব্দ বসান আছে, অর্থাৎ কোনও রসের লীলা আস্বাদনে তাঁর কখনও বিরাম নেই। ভগবান গীতাবাক্যেও বলেছেন—'আমি সর্ব্বরসের ভোক্তা।' এখন ভোগ করতে গেলে কাউকে তো ভোগ্যবস্তু দিতে হবে। ভগবান না হয় ভোক্তা—ভোগ করেন কিন্তু সেই ভোগ দান তো করবেন ভক্ত পরিকর। পরিকর রসদাতা, ভগবান রসভোক্তা। তাই ভগবানের এই লীলারস আস্বাদনে দাস, সখা, পিতামাতা ও পরিকরের নিত্য থাকা চাই—তা না হলে ভগবানের লীলারস আস্বাদনের নিত্যতা থাকে না। কারণ ভগবান তো লীলারসের আস্বাদন একা একা করতে পারেন না। সেই হিসাবেও সব রসেরই ভক্ত

থাকবেন—যারা ভগবানকে রসের যোগান দেবেন।

এখন এই কান্তাপ্রেম বা মধুরপ্রেম যে বিচারে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তার ভাগবতীয় প্রমাণ শ্রীশুকদেবের শ্রীমুখের উক্তিতে এবং শ্রীউদ্ধবজীর বাক্যে পাওয়া যায়। শ্রীরাসস্থলীতে রাধা প্রভৃতি ব্রজরামার আকূতিভরা কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তনে যখন শ্রীগোবিন্দ রাসস্থলীতে আবার ফিরে এলেন—তখন শ্রীশুকদেব সেই দিকে দৃষ্টি দিয়ে বললেন—

তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মানমুখাম্বুজঃ।
পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ॥ ভাঃ ১০।৩২।২

রাসস্থলীতে গোপরামারা কৃষ্ণহারা হয়ে বনে বনে কৃষ্ণ খুঁজছেন—কিন্তু পান নি। কারণ খুঁজলে কৃষ্ণ মেলে না। খোঁজার পথ মানে জ্ঞানের পথ। সে পথে কৃষ্ণ নেই। তিনি আছেন প্রেমের পথে। তাই গোপরামারা কৃষ্ণ না পেয়ে ফিরে এলেন রাসস্থলীতে যমুনা পুলিনে যেখান থেকে তাঁরা কৃষ্ণকে হারিয়েছিলেন। সেখানে ফিরে এলেন কেন? রজোরাণীর কাছে প্রার্থনা করতে—ওগো রজোরাণী—তোমার কৃপায় একবার তো আমরা কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলাম—এখন আমরা কৃষ্ণ হারিয়ে ফেলেছি, কিন্তু কৃষ্ণ তো আমাদের চাই চাই। তাই তোমার কাছে প্রার্থনা, তুমি যদি কৃপা করো তাহলে আমরা আবার কৃষ্ণ পেতে পারি। যমুনা পুলিনে ফিরে এসে ব্রজরামাগণ অন্য কিছু করেন নি—সত্যযুগের তপস্যা, ত্রেতাযুগের যাগযজ্ঞ, এমন কি দ্বাপর যুগের পরিচর্য্যা (পূজা) কিছুই করলেন না—তাঁরা নিলেন কলিযুগের সাধন শ্রীনামসংকীর্ত্তন। শুকদেব বললেন—

সমবেতা জগুঃ কৃষ্ণং তদাগমনকাঙিক্ষতাঃ। ১০।৩০।৪৫

সমবেত হয়ে তাঁরা সুরতাল লয় যোগে শ্রীকৃষ্ণগুণ গান করেছেন, যার ফলে হারান কৃষ্ণ তাঁদের কাছে এসেছেন। একসঙ্গে অনেকে মিলে সুরতাললয় যোগে যে কৃষ্ণ গুণগান—তার নামই সংকীর্ত্তন। শ্রীজীব গোস্বামিপাদ বলেছেন—'বহুভির্মিলিত্বা গানসুখং সংকীর্ত্তনম্।' গোপরামাদের আচরণে এইটি সিদ্ধান্ত হয়ে রইল যে নাম করলে নামীকে পাওয়া যায়। এখন কথা হচ্ছে গোপরামারা তো গোবিন্দের নিত্যসিদ্ধ পরিকর—তাদের তো কৃষ্ণ হারানোর কথাই নয়। কারণ কৃষ্ণ পরমপুরুষ শক্তিমান আর রাধা আদি ব্রজরামা শ্রীগোবিন্দের হ্লাদিনীশক্তি মূর্ত্তিমতী

শক্তি এবং শক্তিমানের তো ছাড়াছাড়ি হয় না—এই প্রাকৃত জগতেই হয় না। চাঁদ জ্যোৎস্না, অগ্নি তার দাহিকা শক্তি, প্রদীপ প্রভা, দুগ্ধ তার শুভ্রতা কেউ তো কাউকে ছেড়ে থাকে না—তাহলে গোবিন্দ গোপরামাদের বা গোপরামারা গোবিন্দকে ছেড়ে থাকবেন কি করে? সম্ভব নয়, তবু হারিয়েছেন—পরস্পর ছাড়াছাড়ি হয়েছে লীলাসৌকর্য্যে অর্থাৎ লীলারস আস্বাদনের জন্য। কারণ শুধু মিলনে রসের বা প্রেমের আস্বাদন সম্পূর্ণ হয় না—মিলনের সঙ্গে বিরহ দরকার। শুধু মিলন টেঁকে না—বিরহ না থাকলে মিলনের রং পাকা হয়ে ধরে না। যেমন সাদা কাপড়ে রং পাকা করে করতে গেলে আগে কষ জলে সাদা কাপড়খানি ডুবিয়ে নিতে হয়—তারপরে রং জলে ডোবালে রং পাকা হবে। তেমনি চিত্তবসনে প্রেমের পাকা রং ধরাতে গেলে আগে বিরহের কষ জলে চিত্ত বসনকে ডুবিয়ে নিতে হবে—তবে মিলনের রং পাকা হয়ে ধরবে। তাই শ্রীরাসলীলায় দেখা যায় প্রথম পর্য্যায়ে গোপরামাদের সঙ্গে গোবিন্দের যে মিলন সেটি টিকল না—ভেঙ্গে গেল, মাঝখানে অনেকক্ষণ বিরহ—এই বিরহের পরে যখন আবার মিলন হল, তখন মিলন পাকা হল—সে মিলন আর ভাঙ্গে নি। গোপরামাদের তো সাধন করার কথা নয়। কারণ তারা তো নিত্যসিদ্ধ পরিকর—সাধন তো করবে জীব (মানুষ)। গোপরামাদের এটি সাধন নয় অথচ সাধনের মত দেখতে। কারণ সাধনে থাকে উপদেশের অপেক্ষা। শ্রীগুরুপাদপদ্মের উপদেশে জীব সাধন করে তখনই তার 'সাধক' আখ্যা হয়। এখানে গোপরামাদের কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তনে কোন উপদেশের অপেক্ষা নেই। তাঁরা করেছেন নিজেদের স্বাভাবিকতায়, স্বারসিকতায়, সাহজিকতায়। তাই একে সাধন বলা যাবে না। অথচ সাধনের মত দেখতে। এর থেকে ভক্তজগৎ সাধক জগৎ একটা দিক পেয়ে গেল। কারণ ভগবান যখনই লীলা করেন তাঁর স্বৈরআনন্দে স্বৈরবিলাসে তখনই ভক্ত জগৎ সাধক জগৎ তারা আঁচল পেতে বসে থাকেন—প্রভু, তুমি লীলা করছ আমাদের কিছু দেবে না? তাই এখানে গোপরামাদের স্বাভাবিক আচরণে জীবজগৎ দেখল যে, নাম করলে তো নামীকে পাওয়া যায়—গোপরামারা তো কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তনেই হারান কৃষ্ণ ফিরে পেয়েছেন—তাহলে আমরাও যদি কৃষ্ণ নাম করি তাহলে হারান কৃষ্ণকে ফিরে পাব। কলিজীব আমরা তো

অনাদি কাল থেকে কৃষ্ণহারা—কৃষ্ণহারা মানে কৃষ্ণপাদপদ্মে বিমুখতা—বিমুখতার (অরুচি) নামই হারান। কলিজীবের পক্ষে এটি সাধন। তাহলে নিত্যসিদ্ধ পরিকরের যেটি স্বাভাবিকতা সাধনজগতের সেটি সাধনতা। শ্রীমন্মহাপ্রভু কলিযুগাবতার প্রেমাবতার তাই এত নিশ্চিন্ত হয়ে কলিজীবের প্রতি এত দৃঢ় করে ত্রিসত্য করে বলতে পেরেছেন—

হরের্ণাম হরের্ণাম হরের্ণামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

এখন রাধারাণী এবং অন্যান্য গোপরামারা যে এই কৃষ্ণনামসংকীর্ত্তনের ফলে হারান কৃষ্ণকে ফিরে পেয়েছেন এ স্বীকৃতিবাক্য উচ্চারণ করলেন কে? ভাগবতী কথার যিনি বক্তা লীলাদ্রষ্টা আজন্মমায়াস্পর্শশূন্য শ্রীশুকদেব গোস্বামিপাদই স্বাক্ষর দিলেন—

তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মানমুখাম্বুজঃ।
পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ॥ ভাঃ ১০।৩২।২

শুকদেবের এই মন্ত্রে তো কৃষ্ণ ফিরে এলেন—এটি 'কৃষ্ণ' নাম করে তো বলা নেই। নাম করে না বললেও শুকদেব এমন বিশেষণ দিয়েছেন যাতে কৃষ্ণ ছাড়া আর কাউকে বুঝাবে না। তাসামাবিরভূৎ—তাসাং অর্থাৎ গোপীনাম্—গোপরামাদের কাছে ফিরে এলেন—কে ফিরে এলেন? শুকদেব কয়েকটি বিশেষণ দিয়েছেন—(১) সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ—মন্মথ বলতে প্রাকৃত মদনকে বুঝায়—যিনি তাঁর ফুলবাণ দিয়ে বিশ্বজগৎকে মুগ্ধ করে রাখেন, মনকে মথন করেন বলে তাঁর নাম মন্মথ। তাঁর ফুলবাণেরই এই প্রভাব, অস্ত্রবাণ হলে না জানি কি হোত! কামশরে জর্জ্জরিত হয় না এ জগতে এমন কে আছে—শিব ব্রহ্মা পর্য্যন্ত কামমুগ্ধ। শিবের ত্রিনয়নের বহ্নিতে মদনের দেহ ভস্মীভূত হয়েছে বটে, কিন্তু তার প্রভাব এতটুকু কমে নি—তাই বিশ্বকবি বলছেন—

পঞ্চশরে দগ্ধ করে করেছ এ কি সন্ন্যাসী
বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে।
ব্যাকুলতর বেদনা তার বাতাসে ওঠে নিঃশ্বাসি
অশ্রু তার আকাশে পড়ে গড়ায়ে।।

এই প্রাকৃত মদনের (মন্মথ) ওপরে যিনি, তিনি হলেন অপ্রাকৃত মদন তাঁকেই বলা হয় মন্মথ মন্মথ—ইনি হলেন প্রদ্যুম্ন—এই প্রদ্যুম্নের ওপরে

হলেন সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ—অর্থাৎ অপ্রাকৃত নবীন মদন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র। তাহলে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই যে গোপরামাদের কাছে ফিরে এলেন—এটি শুকদেবের বাক্যে পাওয়া গেল। তাঁরই আর চারটি বিশেষণ দিয়েছেন—(২) শৌরিঃ অর্থাৎ বীর। কৃষ্ণ এখানে কি বীরত্ব দেখিয়েছেন যে শুকদেব বীর বললেন? গোস্বামিপাদ বললেন—এই শৌরি বিশেষণটি কটাক্ষে। কৃষ্ণ আর বীরত্ব কোথায় দেখাবেন? রাসস্থলী হতে ব্রজরামাদের ত্যাগ করে দূরে সরে তাদের বিরহ বেদনা দিয়ে মনে করছেন খুব বীরত্ব দেখালাম। এইজন্য শৌরি বিশেষণ। (৩) স্ময়মানমুখাম্বুজঃ—গোবিন্দ যখন গোপরামাদের কাছে ফিরে এলেন তখন অধরে তাঁর মৃদু হাসি—স্ময় বলতে মৃদু হাসিকেই বুঝায়, উচ্চ অট্টহাস্য নয়। শ্রীশুকদেব লীলা দর্শন করতে করতে কথা বলছেন, তাই এত নিখুঁত—কারণ দর্শন না করলে এমন পরিপাটি করে বলা যায় না। শ্রীশুকদেব শুধু নিজে দর্শন করেছেন তাই নয়—নিজের কৃপাবলে শ্রোতা মহারাজ পরীক্ষিৎকেও দর্শন করাচ্ছেন। গোবিন্দের অধরে হাসি কেন? এটি কি পরিহাসের হাসি? বেশ হয়েছে গোপরামারা আমার বিরহে কষ্ট পেয়েছে—তাই পরিহাসের হাসি হাসছেন? গোস্বামিপাদ বললেন—না এটি পরিহাসের হাসি নয়—এটি সমবেদনার হাসি, সহানুভূতির হাসি। কৃষ্ণ যেন বলতে চাইছেন—গোপরামাগণ তোমরা আমার বিরহে বেদনা পেয়েছ, আমি সেটি ঠিক অনুভব করতে না পারলেও কিছু অনুমান করি। কিন্তু এই তো আমি তোমাদের কাছে এসেছি, এখন তো তোমাদের মনে কোন ব্যথা নেই। তাই কৃষ্ণ অধরে মৃদু হাসি নিয়ে এসে দাঁড়ালেন যেন হাসির প্রলেপ দিয়ে তাদের সকল জ্বালা মুছে দিতে চান—ব্যথার ওপর প্রলেপ দিলে যেমন ব্যথার উপশম হয়। (৪) পীতাম্বরধরঃ—গোবিন্দ পীতাম্বরটি গলায় জড়িয়ে গোপরামাদের কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন—গললগ্নীকৃতবাসে, গলবাসে করজোড়ে অপরাধী ব্যক্তির মত। মনে হতে পারে, পীতাম্বর যদি কেবলমাত্র বলা যেত তাহলে তো কৃষ্ণকেই বুঝাত—কারণ নিজের পরিচয় দিয়েছেন কৃষ্ণ—'কিশোরীদাস মুই পীতবাস ইহাতে সন্দেহ যার। কোটিজন্মে যদি আমারে ভজয়ে বিফল ভজন তার।।' গীতগোবিন্দ কাব্যে শ্রীজয়দেব কবি বললেন—

'পীতবসনবনমালী'

তাই পীতাম্বর বললেই যদি গোবিন্দকে বুঝায় তাহলে ধরঃ কথাটি শ্রীশুকদেব তো বেশী বললেন। ধরঃ পদটি বৃথা বললেন—না বৃথা নয়। কারণ বৃথা কথা বলবার মত অবসর শ্রীশুকদেবের নেই। মহারাজ পরীক্ষিৎ যাঁকে উপলক্ষ্য করে শ্রীশুকদেব ভাগবতী কথা পরিবেশন করছেন—তাঁর পরমায়ু তো সীমিত। তাঁর তো বৃথা কথা শুনবার মত রুচিও নেই, অবসরও নেই। শুকদেব তো মহারাজ পরীক্ষিতের পরিমিত পরমায়ুর দিকে চেয়ে চেয়ে কথা বলছেন—তাই তিনি খুব সাবহিত হয়ে কথা বলছেন—যার ফলে সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রে আঠার হাজার মন্ত্রে কোথাও একটি বৃথাপদ তো দূরে আছে, একটি নিরর্থক অব্যয় পদ যেমন চ, বা, তু, হি—এরকমও উচ্চারণ করেন নি—কারণ তাহলেও মহারাজ পরীক্ষিতের পরমায়ুর একটু খুচরো অংশও বৃথা ব্যয়িত হবে। তিনি একটা ধরঃ পদ বৃথা বলবেন তা তো হতে পারে না। এখানে ধরঃ পদটি সার্থক। গোস্বামিপাদ বলেছেন—কৃষ্ণ নিজের পীতাম্বরটি গলায় জড়িয়ে এসে দাঁড়িয়েছেন—কারণ এতক্ষণ গোপরামাদের কাছ থেকে দূরে গিয়ে তাদের বিরহ বেদনা দেওয়ার ফলে নিজেকে অপরাধী বলে বিবেচনা করেছেন। এই অপরাধ মার্জ্জনের জন্য গললগ্নীকৃতবাসে গলবাসে করজোড়ে এসে দাঁড়ালেন, সুতরাং এটি সার্থক। শুধু পীতাম্বর বলতে এই অপরাধমার্জ্জনটি বুঝাত না। আর সবশেষে আর একটি বিশেষণ দিলেন—স্রগ্বী। শ্যামসুন্দরের কণ্ঠে একটি মালা (স্রক্)। মালা গলায় দিয়ে কৃষ্ণ এসেছেন। এ মালা কৃষ্ণ নূতন করে কণ্ঠে ধারণ করে এসেছেন তা নয়। এ মালা তার কণ্ঠে ছিলই—এ মালা গোপরামারাই পরিয়ে দিয়েছিলেন। গোবিন্দের কণ্ঠে একটি মালা আছে এটিও শুকদেব লক্ষ্য করেছেন? শুকদেবের কত নিখুঁত দৃষ্টি। দেখলেন না হয় কিন্তু এটি আবার ঘটা করে বলবার কি দরকার হল? দরকার আছে। গোবিন্দ যেন ব্রজরামাদের বলতে চাইছেন ঐ মালাটি দেখিয়ে—'দেখ, তোমরা হয়ত মনে করতে পার—তোমাদের কাছ থেকে আমি দূরে ছিলাম তখন অন্য কোনও বালার সঙ্গ করেছ। না, অন্য কোনও বালার সঙ্গ করি নি। তোমাদের দেওয়া এই মালাই আমার বক্ষের সঙ্গিনী ছিল।' ব্রজরামারা যদি বলেন—'তোমার কথা বিশ্বাস করি না—তুমি তো ধূর্ত্ত, তুমি তো কপট—তুমি মুখে একরকম বল, মনের মধ্যে তোমার আর একরকম

ভাব।' কৃষ্ণ বলছেন—'কেন বিশ্বাস করবে না—এই মালার দিকে চেয়ে দেখ। অন্য কোন বালার সঙ্গ করলে তার গাঢ় আলিঙ্গনে বক্ষের মালা দলিত হত, পিষ্ট হত—কিন্তু তা তো হয় নি। মালা তো অম্লান আছে, তোমরা যেমনভাবে পরিয়ে দিয়েছিলে সেই রকমটিই আছে।' স্রগ্বী পদের এই তাৎপর্য্য আছে বলে এ পদটি সার্থক।

মধুর রসের যত লীলা আছেন তার মধ্যে লীলামুকুটমণি শ্রীরাসলীলা—সেই রাসস্থলীতে রাধারাণী এবং অন্যান্য ব্রজরামা অনাদিরাদি শ্রীগোবিন্দকে যেমন নাচায় তেমনি নাচে। গোবিন্দ কান্তাপ্রেমের কাছে সম্পূর্ণ বশীভূত। গোবিন্দ তার স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে ফেলেন। প্রেম মাত্রই ভগবানকে বশীভূত করেন, কিন্তু তার মধ্যে কান্তাপ্রেম চরম। তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ বললেন—

প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভর্ৎসন।
বেদস্তুতি হইতে তাহা হবে মোর মন॥

এমনিতেই মধুর রস সর্ব্বোপরি—তার মধ্যে আবার ব্রজের মধুর রস, এর তুলনা হয় না, রসের এ ধারা অনাবিল অচিন্তনীয়া।

সেইজন্য এই ব্রজের মধুর রসের কাছে বিজ্ঞ প্রাজ্ঞ তত্ত্বজ্ঞ বুদ্ধিমান উদ্ধবজীর মত ব্যক্তিও মাথা লুটিয়ে দিয়ে ব্রজরামাদের মহিমা কীর্ত্তনে পঞ্চমুখ হয়েছেন। তা না হলে শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদ তাঁর শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত গ্রন্থে যখন ভক্তপরীক্ষার প্রসঙ্গ করেছেন—জগতে সবচেয়ে বড় কৃষ্ণভক্ত কে এই পরীক্ষার ভূমিকা নিয়েছেন দেবর্ষিপাদ নারদ। তখন বিশ্লেষণ করে দেখালেন প্রয়াগের ব্রাহ্মণ, দাক্ষিণাত্যের রাজা, দেবলোকে দেবরাজ ইন্দ্র, ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মা, কৈলাসে কৈলাসপতি শঙ্কর, সুতলে প্রহ্লাদ, কিম্পুরুষবর্ষে শ্রীহনূমানজী, পাণ্ডবগণ, কংসপিতা উগ্রসেন মহারাজ সকলের ওপরে রয়েছেন বৃষ্ণিবংশের প্রধানমন্ত্রী, কৃষ্ণের পরম প্রিয় সখা, দেবগুরু বৃহস্পতির সাক্ষাৎ শিষ্য—সকল বুদ্ধিমানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ উদ্ধবজী। যে উদ্ধবজীকে দেবর্ষিপাদ নারদ দর্শন করে পাগলের মত হয়েছেন, উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। নারদের স্তুতি শুনে উদ্ধবজী তখন বলেছেন—দেবর্ষিপাদ, আপনি যে আমাকে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণভক্ত বলে স্তুতি করেছেন—এ অভিমান আমারও এতদিন ছিল—আমি সবচেয়ে বড় কৃষ্ণভক্ত এই গর্ব্বে আমার হৃদয় ভরা ছিল। আমার

ওপরে যে কোন ভক্ত হতে পারে এটি আমি ধারণা করতে পারি নি, কিন্তু সে গর্ব্ব আমার চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে দেবর্ষিপাদ যেদিন সখা আমাকে পরম কৃপা করে ব্রজে পাঠালেন। ব্রজবাসীকে বিশেষ করে ব্রজরামাদের যখন দর্শনের সৌভাগ্য হল তখন দেখলাম আমাতে ভক্তি কোথায়, প্রেম কোথায়? ভক্তির লেশও আমাতে নেই। কারণ ব্রজে ব্রজরামাদের দেখলাম, তারা কৃষ্ণপ্রেমের ঘনীভূত মূর্ত্তি। প্রেমের আস্বাদন তো মিলন ও বিরহ দুটি অবস্থা নিয়ে। তবু তো তাদের কৃষ্ণমিলনকালে দেখবার আমার সৌভাগ্য হয় নি। দেখেছিলাম তাদের কৃষ্ণবিরহদশায়। তাতেই অনুমান করলাম—বিরহে যদি এই বেদনা হয় তাহলে মিলনে না জানি তাদের কত সুখ, কত আনন্দ। এইটিই প্রেমের ধারা—বিরহে যদি বেদনা না হয় মিলনে আনন্দ হবে না। বিরহে যার যত বেদনা মিলনে তার তত বেশী আনন্দ। উদ্ধবজী বলছেন, দেবর্ষিপাদ কৃষ্ণবিরহ তো আমারও ভোগ করি, কৃষ্ণ কি সর্ব্বদা আমাদের কাছ থাকেন? তা তো নয়—কত সময় তিনি আমাদের কাছ থেকে কত দূরে চলে যান কাজের জন্য—আমরা বহুদিন হয়ত তাঁর দেখাই পাই না—কিন্তু কৃষ্ণবিরহে তো আমার এরকম অবস্থা হয় নি—দেবর্ষিপাদ, নিজের চোখে দেখে এলাম কৃষ্ণ বিরহে তাদের যে চেহারা, সে চেহারা তো আমার হয়নি দেবর্ষিপাদ। তারা অন্নজল ত্যাগ করেছে। তবে উদ্ধবজী যখন ব্রজগোপীদের কাছ গেছেন তখন তাদের বসনভূষণে সুসজ্জিতা অবস্থাতেই দেখেছেন। তারা দধিমন্থন করছেন—দধিমন্থনের তালে তালে তারা উচ্চৈস্বরে গান করছে, সেই ধ্বনি আকাশ মার্গে গিয়ে পৌঁছেছে—তাহলে তাদের দেখে মনে হচ্ছে তারা তো বেশ আনন্দেই আছে—কৃষ্ণবিরহের বেদনা তো বুঝা যাচ্ছে না—তাদের তো মলিন বেশ রুক্ষ্ম কেশ নয়। উদ্ধবজী ভাবছেন, তাহলে যা মনে করেছিলাম তা তো নয়—তখন রসিক টীকাকার শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ গোপারামাদের পক্ষ হয়ে বলছেন—উদ্ধব, তুমি এখানে এসেছ—ব্রজভূমিতে তুমি তো অতিথি। অতিথির কাছে তো প্রথমেই দুঃখের কথা বলা যায় না। গৃহস্থের দুঃখ বেদনা অনেক থাকতে পারে, কিন্তু অতিথি আসামাত্রই কি তার কাছে সেটি প্রকাশ করা যায়? যায় না। কিন্তু থাকতে থাকতে অতিথি গৃহস্থের ভিতরের সবটাই জানতে পারে। তেমনি উদ্ধব তুমি তো

অতিথি—অনেক দূর পথ পেরিয়ে সেই মথুরা থেকে এসেছ ব্রজে—তাই তোমার কাছে আমাদের বেদনার কথা এখনই বলা যায় না, কারণ তুমি পথশ্রমে ক্লান্ত। আমাদের ওপরটা দেখছ—না? আমরা নিজেদের অঙ্গকে সাজিয়ে রেখেছি—কেন জান? আশায় আশায়। কৃষ্ণ যখন ব্রজ থেকে মথুরায় চলে যান—তখন বলে গিয়েছিলেন সেখানে কাজ শেষ করে আবার খুব তাড়াতাড়ি ফিরে আসব। কৃষ্ণের কথা তো মিথ্যা হবে না। কৃষ্ণ ফিরে এসে যদি আমাদের মলিন বেশ রুক্ষ কেশ দেখেন তাহলে তো মনে ব্যথা পাবেন—তাই কৃষ্ণ এসে আমাদের বেশভূষা সুসজ্জা দেখলে সুখী হবেন, তাই নিজেদের সাজিয়ে রেখেছি। তাহলে গোপরামাদের যে দেহসজ্জা সেটিও কৃষ্ণকে সুখী করবার জন্য। নিজেরা সুখী হবে বলে সাজসজ্জা নয়—অন্তর তো তাদের কৃষ্ণকে সুখী করবার জন্যই সর্ব্বদা সচেষ্ট—বাইরের সাজসজ্জাও ঐ একই কারণে। তাদের মন প্রাণ দেহ—সব একাকার হয়ে আছে শুধু কৃষ্ণকে সুখী করবার জন্য—তাদের যা কিছু চেষ্টা সব কৃষ্ণ কৃষ্ণপ্রীতির জন্য। এর মধ্যে স্বসুখবাসনা বলে কিছু নেই—তাই কামনার গন্ধ নেই, এতটুকু খাদ নেই। এর নাম খাঁটি কৃষ্ণপ্রেম। যে প্রেমের লক্ষণ শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ করলেন—

আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি বাঞ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণপ্রীতি হেতু কার্য্য ধরে প্রেম নাম॥

ব্রজগোপীরা প্রেমের মূর্ত্তি—তারা কামিনী নয়—স্বসুখবাসনার লেশ তাদের নেই—তাদের প্রেম নিষ্কলুষ, নিরবদ্য, যে প্রেমের কাছে কৃষ্ণচন্দ্র পর্য্যন্ত হার স্বীকার করেছেন—বলেছেন অকপটে—তোমাদের এই প্রেমের ঋণশোধ করা আমার পক্ষে সম্ভব হল না।

ন পারয়েহহং নিরবদ্য সংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাভজন্ দুর্জ্জরগেহশৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা॥ ভাঃ ১০।৩২।২২

মহাজন এই সুত্র ধরে বললেন—

ঋণী হয় ভাগবতে কয়।

উদ্ধবজী এই কৃষ্ণপ্রেমের মূর্ত্তি দর্শন করে অভিভূত হয়েছেন, মুগ্ধ হয়েছেন, গোপরামাদের স্তুতি করে কূল পাচ্ছেন না, নীরবে প্রার্থনা করছেন—

গোপরামাদের চরণ রেণুকে বারে বারে প্রণাম করছেন।

শ্রীউদ্ধবজীর অনেকগুলি স্তুতিবাক্যের মধ্যে একটিকে শ্রীকবিরাজ গোস্বামিপাদ উল্লেখ করেছেন—

নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ।
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীত কণ্ঠ—
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ ব্রজসুন্দরীণাম্॥ ভাঃ ১০।৪৭।৬০

গোপরামাদের সৌভাগ্যের প্রশংসা করে উদ্ধবজী বলছেন—এই ব্রজরমনীই যথার্থ সুন্দরী। উদ্ধবজীর মত ব্যক্তির তো সুন্দরী দেখা অভ্যাস আছে। দ্বারকা মন্দিরে মথুরা নগরীতে তো উদ্ধবজীর বাস। দ্বারকার মহিষীরা মথুরা নাগরীরা কি সুন্দরী নন? কিন্তু তাদের সম্বন্ধে তো উদ্ধবজী সুন্দরী বলে উল্লেখ করেন নি। ব্রজের গোয়ালিনীরাই কি এত সুন্দরী? এ সৌন্দর্য্য কিসের সৌন্দর্য্য? এটি বাইরের অঙ্গ সৌন্দর্য্য নয়—এটি আন্তর সৌন্দর্য্য; আন্তর সৌন্দর্য্য হল কৃষ্ণানুরাগ। যার কৃষ্ণের প্রতি যত বেশী ভালবাসা, যত বেশী প্রেম, সে তত সুন্দর। রাধারাণী এবং অন্যান্য গোপরামাদের যে কৃষ্ণ ভালবাসা তার উপরে আর ভালবাসা হয় না—সকল গোপরামার মধ্যে আবার মুখ্যা রাধারাণী—এখানে কৃষ্ণপ্রেমের চরম সীমা। এই সৌন্দর্য্যকে লক্ষ্য করে উদ্ধবজী মন্তব্য করলেন—ব্রজসুন্দরীনাম্—যদি প্রশ্ন করা যায়—উদ্ধব, তুমি গোপরামাদের এই সৌন্দর্য্যের কি পরিচয় পেয়েছ? কোন লক্ষণে বুঝলে তারা সুন্দরী? উদ্ধবজী বলছেন—কোন লক্ষণে তাদের সৌন্দর্য্যের পরিচয় পেলাম জান? তারা লব্ধাশিষ—লব্ধাশিষ বলা হয় তাকে, যে যেমন করে ভগবানকে পেতে চায় সে যদি তেমনি করে তাঁকে পায়, তাহলে তাকে বলা হয় লব্ধাশিষঃ। গোপরামাদের বৈশিষ্ট্য—তারা প্রত্যেকে যে যেমন করে কৃষ্ণকে আস্বাদন করতে চেয়েছে, সে তেমনি করে কৃষ্ণকে আস্বাদন করেছে—তাই তারা লব্ধাশিষঃ। ভক্ত ভগবানের কণ্ঠ প্রেমে আলিঙ্গন করে এটি খুব বড় কথা নয়। এটি তো করবেই। কিন্তু গোপীপ্রেমের, ব্রজের এই কান্তাপ্রেমের বৈশিষ্ট্য কি? শ্রীরাসোৎসবে অর্থাৎ রাসস্থলীতে গোপীপ্রেমের ব্রজপ্রেমের রাধাপ্রেমের খরস্রোতে যেন গোবিন্দ ভেসে যাচ্ছেন—নিজেকে সামলাতে পারছেন না। তখন গোপীরা কৃষ্ণ কণ্ঠ

আলিঙ্গন করেন নি। কৃষ্ণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে নিজেকে বাঁচাবার জন্য গোপীকণ্ঠ আলিঙ্গন করেছেন। এইখানেই গোপীপ্রেমের বাহাদুরি, গোপীপ্রেমের মর্য্যাদা। যেমন খরস্রোতে কেউ যদি কখনো পড়ে যায় নিজেকে বাঁচাবার জন্য তখন একটি তৃণকুটোকেও আঁকড়ে ধরে তেমনি গোপীপ্রেমের খরস্রোতে পড়ে কৃষ্ণ যেন হাবুডুবু খাচ্ছেন—নিজেকে সামলাতে পারছেন না—তাই নিজেকে বাঁচাবার জন্য নিজে থেকে গোপীকণ্ঠ আলিঙ্গন করেছেন। এ মর্য্যাদা আর কোথাও নেই। এ প্রেমের সঙ্গে অন্য কোন প্রেমের তুলনা হয় না। উদ্ধবজী কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলেছেন। বৈকুণ্ঠের অধিশ্বরী মহালক্ষ্মী যাঁর শ্রীনারায়ণের শ্রীচরণেই নিতান্তরতি—অর্থাৎ নারায়ণের চরণ সেবা ছাড়া যাঁর অন্য কোথাও কোন আসক্তি নেই, তিনিও ব্রজরামাদের এ প্রেমের সন্ধান জানেন না। বৈকুণ্ঠধামের অনেক নীচে স্বর্গভূমি—সেই স্বর্গের দেববধূগণ যাঁদের অঙ্গে পদ্মের গন্ধ কিন্তু হলে কি হয়—তারাও এ ব্রজপ্রেমের সন্ধান জানেন না। কারণ মহালক্ষ্মীই যদি সে খবর না জানেন তাহলে দেববধূদের তো সে সন্ধান পাওয়ার কথাই নয়। যদি উদ্ধবজীকে প্রশ্ন করা যায়—উদ্ধব, ব্রজরমনীদের প্রেমের কি মহিমা তুমি অনুভব করলে? তখন উদ্ধবজী বলছেন—এই ব্রজগোপীরা হলেন লব্ধাশিষঃ—অর্থাৎ তাঁরা যিনি যেমনভাবে গোবিন্দকে আস্বাদন করতে চান তিনি তেমনিভাবে গোবিন্দকে আস্বাদন করছেন—তাঁদেরই বলা হয় লব্ধাশিষঃ। এইটিই ব্রজপ্রেমের মহিমা, এইটিই ব্রজপ্রেমের মর্য্যাদা, এখানকার নাগাল আর কেউ পাচ্ছে না। দ্বারকার মহিষীরাও কৃষ্ণকে মধুর রসে ভজনা করেন—কুরুনাগরী, মথুরানাগরীও কৃষ্ণকে মধুররসে ভজনা করেন—কিন্তু তাঁদেরও ব্রজরসে অধিকার নেই। মধুররসই রসবিশেষ। সকল গোপরামাই মহাভাবের গণ। এই মহাভাব আবার দুই রকম। রূঢ় মহাভাব আর অধিরূঢ় মহাভাব। রূঢ় মহাভাব দ্বারকার মহিষীদের আর অধিরূঢ় মহাভাব গোপিকার গণে। রূঢ় মহাভাব—যেখানে গোবিন্দকে বিধিবিধানে পাওয়া। দ্বারকার মহিষীরা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে পেয়েছেন বিধিবিধানে অর্থাৎ বিবাহিতা পত্নী হিসাবে। পত্নি সম্পর্কে তাঁরা গোবিন্দ ভালবাসেন। গোবিন্দ তাঁদের পতি তাই ভালবাসাই তো উচিত। তাদের প্রেমে এই একটি হেতু পাওয়া গেল। আরও কারণ আছে—তাঁরা কৃষ্ণ ভালবাসার আরও কারণ

দেখাবেন—কৃষ্ণ জগতের নাথ, জগদীশ্বর—তাঁকে জগতে সকলেই ভালবাসে, আমরা তো জগৎ ছাড়া নই—সুতরাং আমরাও ভালবাসি। তাহলে মহিষীদের প্রেমে দুটি কারণ পাওয়া গেল—কিন্তু গোপরামাদের যদি জিজ্ঞাসা করা যায় তোমরা কৃষ্ণ ভালবাস কেন? তাঁরা জবাব দিতে পারবেন না—কারণ সমাজে দাঁড়িয়ে তাঁরা বলতে পারবেন না—যে পতিপত্নী সম্পর্কে আমরা কৃষ্ণ ভালবাসি। পতিপত্নী সম্পর্ক হলে আর পরকীয়া রস থাকে না। আর অন্য কোনও কারণও তাঁরা দেখাতে পারবেন না। সুতরাং গোপরামাদের এ গোবিন্দপ্রেমে কোনও হেতু নেই। শাস্ত্র বিচার করে দেখিয়েছেন—যে প্রেমে কিছু হেতু আছে, অর্থাৎ কৃষ্ণভালবাসায় যেখানে হেতু আছে, কোন কারণ আছে, সে প্রেম কিছু নিন্দিত। আর যে প্রেমে কোনও হেতু থাকে না তাকে বলা হয় নির্হেতুক প্রেম, অনিন্দিত প্রেম—এই প্রেমকেই গোবিন্দ বললেন—'নিরবদ্য সংযুজাম্'—এ প্রেমের শ্রীগোবিন্দজী শুধু মর্য্যাদা দিয়েছেন তাই নয়—এ প্রেমের কাছে নিজে হার স্বীকার করেছেন অর্থাৎ ঋণ স্বীকার করেছেন—তাই কথা আছে 'ঋণী হয় ভাগবতে কয়'।

শ্রীপাদ রামানন্দ শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাপুষ্টকণ্ঠে যখন সিদ্ধান্ত বাক্য উচ্চারণ করলেন—রায় কহে, কান্তাপ্রেম সর্ব্বসাধ্যসার।

শ্রীগৌরসুন্দর এই সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট হয়েছেন লক্ষিতস্থানে পৌঁছেছেন, তাই সন্তোষ।

এইভাবে রায় রমানন্দ মিলন প্রসঙ্গে সাধ্যসাধনতত্ত্ব নির্ণীত হল। কান্তাপ্রেম সর্ব্বসাধ্যসার সাধ্যশিরোমণি—কিন্তু সবাই মধুররসে গোবিন্দকে ভজবে না—কারণ যার যেই ভাব সেই সের্ব্বোত্তম। যিনি যে রসে ভগবানকে আস্বাদন করেন তাঁর কাছে সেই রসই সকলের ওপরে। তিনি অন্য কোন রসে ভগবানকে আস্বাদন করতে চাইবেন না। তাঁর কাছে সেই রসই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ বলেছেন—

কিন্তু যাঁর যেই রস সেই সর্ব্বোত্তম।
তটস্থ হঞা বিচারিলে আছে তরতম॥

কান্তাপ্রেম বা মধুরপ্রেম যে সর্ব্বোপরি তার মহিমায় শাস্ত্র বললেন—

পরিপূর্ণ কৃষ্ণ প্রাপ্তি এই প্রেমা হৈতে।
এই প্রেমার বশ কৃষ্ণ কহে ভাগবতে॥

ভগবানের প্রতিজ্ঞা বাক্য আছে—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥ গীঃ ৪।১১

মহাজন বললেন—যে আমারে যৈছে ভজবে আমি তারে তৈছে ভজব—ভজনের প্রতিদান দেবে—এটি অনাদিরাদি শ্রীগোবিন্দের চিরকালের প্রতিজ্ঞা।

কিন্তু সিদ্ধান্তে দাঁড়াল—সব প্রেমেরই শ্রীগোবিন্দ প্রতিদান দিয়ে এসেছেন অর্থাৎ প্রতিজ্ঞা পালন করেছেন—কিন্তু ব্রজগোপিকার মধুররসের ভজনের কাছে হার মানলেন—এইখানটিতে প্রতিজ্ঞা ভেঙে গেল—বলতে হল 'ন পারয়েঽহম্'—পারলাম না। ব্রজগোপিকার ভজনে সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হল। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদের তাই শ্রীমুখের উক্তি—

এই প্রেমার অনুরূপ না পারে ভজিতে।
অতএব ঋণী হয় কহে ভাগবতে॥

শ্রীগোপীসমাজে শ্রীগোপীজনবল্লভের চরম পরম শোভা—যার ফলে শ্রীশুকদেব বললেন—'তত্রাতিশুশুভে তাভির্ভগবান দেবকীসুতঃ।' গোবিন্দের সর্ব্বত্র শোভা হলেও এখানকার (রাসস্থলীতে) শোভার তুলনা অন্য কোথাও নেই। চারিদিকে হেমবরণী গোরামাগণ যেন পদ্মরাগমণির মালা—আর মাঝে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নীলকান্তমণির পদক। কারণ ভাব অনুযায়ী মাধুর্য্যের প্রকাশ। তাই—

যদ্যপি কৃষ্ণ সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যের ধূর্য্য।
ব্রজদেবীর সঙ্গে তার বাড়য়ে মাধুর্য্য॥

অষ্টম ধারা

রাধাপ্রেম সাধ্যশিরোমণি

রস পেটুক, রসলম্পট, অশেষবিশেষে রসভোক্তা শ্রীগৌরসুন্দর রায় রামানন্দের শ্রীমুখে নিজেরই সিদ্ধান্ত আস্বাদন করেছেন—কিন্তু পেটুক ব্যক্তির পেট যেমন কিছুতেই ভরে না—রসলোলুপতার বলে আরও দাও, আরও দাও—তেমনি মহাপ্রভুও বলছেন—

প্রভু কহে, 'এই সাধ্যাবধি সুনিশ্চয়।
কৃপা করি কহ যদি আগে কিছু হয়॥'

গোপীপ্রেম সর্ব্বসাধ্যসার—সাধ্যশিরোমণি—ভাল লাগল এ সিদ্ধান্ত কিন্তু এর পরে যদি আর কিছু থাকে কৃপা করে বল—কত কাতরতা। শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ং ভগবান—তিনি তো তত্ত্বে পূর্ণ পূর্ণতম। পূর্ণ পূর্ণতম ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন। আর সেই ব্রজেন্দ্রনন্দনই তো শ্রীগৌরসুন্দর।

নন্দের নন্দন যেই শচীসুত হইল সেই
নন্দসুত বলি যারে ভাগবতে গাই।
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য গোঁসাই॥

এই তো শাস্ত্রবাক্য। তাহলে শ্রীমন্মহাপ্রভু পূর্ণ পূর্ণতম, তাঁর তো কাতরতার বাক্য হতে পারে না—মানুষ তো কাতর হয় অভাবে। পূর্ণ পূর্ণতম স্বরূপে তো কোন অভাব থাকতে পারে না। কিন্তু অভাবে পড়েই তো মহাপ্রভু বললেন—

কৃপা করি কহ যদি আগে কিছু হয়।

এ তো কাতরতার ভাষা—অর্থাৎ অভাবের ভাষা। এ অভাব কিসের অভাব? তত্ত্বশিরোমণির তো কোন অভাব হতে পারে না। মহাজন সিদ্ধান্ত করেছেন এটি তত্ত্বের অভাব নয়—এ হল রসের অভাব। তত্ত্বের পূর্ণ পূর্ণতমতা আজ রসসাগরে বিলীন হয়ে গেছে। রসের পাথারে আজ রসরাজ নিজেকে হারিয়ে ফেলেছেন, রসসাগরে হাবুডুবু খাচ্ছেন—সেই আস্বাদনে ভরপূর হয়ে আছেন—তার ওপরে আবার রসের সাগর রামানন্দের সঙ্গে মিলন প্রসঙ্গে রসের উত্তাল তরঙ্গ উঠেছে। যার সীমা পাওয়া যায় না। তাই কাতরতায় বলেছেন—

'কৃপা করি কহ যদি আগে কিছু হয়।'

শ্রীপাদ রামানন্দ বিস্ময়বিমুগ্ধ হয়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর এ আস্বাদন উপলব্ধি করছেন—আর মনে মনে ভাবছেন—

রায় কহে, 'ইহার আগে পুছে হেন জনে।
এতদিন নাহি জানি আছয়ে ভুবনে॥'

ব্রজপ্রেমের সীমা কান্তাপ্রেমে এইটিই সাধ্যাবধি—এর পরে যে আর কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা থাকতে পারে তা তো জানতাম না এবং এ সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন হতে পারে, এধারণাও ছিল না—তবে প্রশ্ন যখন উঠেছেন, তখন কৃপা করে উত্তরও তিনিই দেবেন। তাই নিশ্চিন্ত শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণযুগলে আত্মসমর্পণ করে রায় অপেক্ষায় আছেন। সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের ফল তো আছেই। আমি যে ফল পাই না, সেটি হল আমার আত্মসমর্পণের অভাব। রামানন্দ নিজেকে বিকিয়ে দেওয়ার ফল পেয়েছেন। তাই মহাপ্রভুর অভিলষিত সিদ্ধান্ত বলতে পেরেছেন—শ্রীরাধার কৃষ্ণপ্রেমই সাধ্যশিরোমণি। বললেন—

ইহার মধ্যে রাধার প্রেম 'সাধ্যশিরোমণি।'
যাঁহার মহিমা সর্ব্বশাস্ত্রেতে বাখানি॥

গোপীপ্রেম সাধ্যাবধি বটে কিন্তু গোপীমুখ্যা হলেন শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী। কারণ শ্রীমতী রাধারাণী হলেন সাগর আর অন্যান্য গোপরামা হলেন নদী। নদী কখনও সাগর হবে না। কিন্তু সাগর নিজ বৈশিষ্ট্যে নদী থেকে পৃথক যদিও জল অংশে নদী এবং সাগর দুই সমান। তাই গোপীপ্রেম সাধারণভাবে সব্বশ্রেষ্ঠ বটে কিন্তু তারমধ্যে বিশেষ শ্রীমতী রাধারাণীর প্রেম। তাই রাধাপ্রেমই সাধ্যশিরোমণি। এর অনুকূলে শ্রীলঘুভাগবতামৃতে পদ্মপুরাণের বচন আছে—শ্রীমতী রাধারাণীর মত রাধাকুণ্ডও শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের প্রিয়তমা—

যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা।
সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা॥

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের প্রিয়া যেমন রাধারাণী রাধাকুণ্ডও তাঁর সেইরকম প্রিয়। সকল গোপীর মধ্যে রাধারাণীই শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়া।

শ্রীমদ্ভাগবতেও শ্রীমতী রাধারাণীর প্রেমে অদ্বিতীয়ত্বে প্রমাণ বাক্য শ্রীশুকদেবের—

অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান হরিরীশ্বরঃ।

যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ ॥

ভাঃ ১০।৩০।২৮

শ্রীরাসস্থলীতে যখন রাধারাণীকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীগোবিন্দ অন্যান্য গোপরামাদের ত্যাগ করে অন্তর্হিত হলেন, তখন গোপরামারা বনে বনে কৃষ্ণ খুঁজেছেন—খুঁজতে খুঁজতে এমন একটি জায়গায় এসে উপস্থিত হয়েছেন—যেখানে দেখলেন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের ধ্বজবজ্রাঙ্কুশচিহ্নিত পদচিহ্ন—তারপরে আরও নিরীক্ষণ করে দেখলেন তার সঙ্গে বধূর পদচিহ্ন সুব্যক্ত। সেখানে রাধারাণীর নাম করা নেই বটে, কিন্তু এই বধূই হলেন রাধারাণী। যুগলের চরণচিহ্ন দর্শন করে গোপরামারা আর্ত্তিভরে বলেছেন—এই বধূই সার্থক কৃষ্ণ আরাধনা করেছেন, যার ফলে গোপনে তাকে নিয়ে আমাদের সকলকে ত্যাগ করে কৃষ্ণ রাসস্থলী ছেড়ে চলে এসেছেন। তাহলেই প্রমাণিত হল কৃষ্ণ অন্যান্য গোপরামার চেয়ে রাধারাণীকেই বেশী ভালবাসেন—রাধারাণীই তাঁর প্রিয়তমা। এখন প্রশ্ন হতে পারে শ্রীশুকদেব এখানে শুধু বধূ বললেন কেন? রাধারাণীর নাম করে বললেন না কেন? তার কারণ দুটি—শ্রীশুকদেব সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রে রাধাগোবিন্দের লীলা কথা বলেছেন—কিন্তু কোথাও শুধু রাধারাণী নয়, কোন গোপরামারই নাম করে বলেন নি। কারণ রাধারাণীর নিষেধ ছিল। এই শ্রীশুকদেবই নিকুঞ্জ মন্দিরের বিচক্ষণ নামে শুকপাখী। তিনিই রাধারাণীর আদেশে এসেছেন এ জগতে বেদব্যাসের স্ত্রী বিটিকার গর্ভে পুত্র হয়ে—জগতে রাধামাধবের লীলাকথা পরিবেশনের জন্য। কিন্তু আসার সময় রাধারাণী বললেন—'দেখ শুক,—তুমি আমাদের লীলাকথা বলবে কিন্তু সাবধান আমাদের নাম করে করে যেন বলো না—কারণ গোবিন্দের সঙ্গে আমাদের পরকীয়া রসের লীলা, নাম করে বললে আমরা লজ্জা পাব। রাধারাণীর করলালিত শুক রাধারাণীর নিষেধাজ্ঞা সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্রে পালন করেছেন—শুধু রাধারাণী নয় কোন গোপরামারই নাম শুকদেব করেন নি। ললিতা, বিশাখা, চিত্রা, চম্পকলতা, রঙ্গদেবী, তুঙ্গবিদ্যা, সুদেবী, ইন্দুরেখা কোন গোপরামার নাম শ্রীমদ্ভাগবতে নেই। অথচ মায়েদের নাম করেছেন—যশোদা মা, রোহিনী মা প্রভৃতি। আরও একটি কারণ আছে—শ্রীশুকদেবের জিহ্বা তো স্বচ্ছ, হৃদয় স্বচ্ছ, তাই রাধারাণীর নাম উচ্চারণ মাত্রে রাধারাণীর স্বরূপকে স্পর্শ করা হবে—

কারণ তাঁর কাছে নাম এবং স্বরূপ ভিন্ন নয়। আর নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে স্বরূপকে স্পর্শ করলে তিনি তো প্রেমে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়বেন—আর মূর্চ্ছিত অবস্থায় তো কথা বলা যাবে না। অথচ মহারাজ পরীক্ষিতের তো পরিমিত পরমায়ু—সেই পরমায়ুর দিকে চেয়ে চেয়ে শুকদেব কথা বলছেন। তাই শ্রীশুকদেব রাধা প্রভৃতি ব্রজরামার নাম করেন নি। ঈঙ্গিতে বলেছেন—সেই বধূ—আবার বলেছেন—একা কাচিৎ—গোপী, গোপ্যঃ প্রভৃতি।

শ্রীশুকদেব রাধারাণীর নিষেধাজ্ঞা পালন করে সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্রে কোথাও শ্রীমতী রাধারাণীর নাম করেন নি বটে, কিন্তু রাধারাণীর নাম তো স্বয়ং প্রকাশ—রাধারাণীর স্বরূপ যেমন স্বয়ং প্রকাশ নামও তেমনি স্বয়ং প্রকাশ—কারণ রাধারাণীর নাম এবং স্বরূপ অভিন্ন, যা এ জগতে হয় না। তাই এ জগতে নাম করলে যার নাম অর্থাৎ নামীকে পাওয়া যায় না। কিন্তু ও-জগতে নাম এবং নামী অভিন্ন বলে নাম করলে নামীকে পাওয়া যায়! তাই শ্রীশুকদেবের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও রাধারাণীর নামে রাধ্ ধাতুর প্রয়োগ আপনা থেকে হয়ে গেছে। শুকদেব বললেন—

অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।

রাধ্ ধাতুর অর্থ হল আরাধনা করা—আরাধনা রাধনা একই কথা। সার্থক আরাধনা করেছেন বলেই তাঁর নাম রাধিকা। বলা আছে—

কৃষ্ণবাঞ্ছাপূর্ত্তিরূপ করে আরাধনে।
অতএব রাধিকা নাম পুরানে বাখানে॥

আরও বলেছেন—কৃষ্ণের যতেক বাঞ্ছা রাধাতেই রহে।

রাধাপ্রেম সাধ্যশিরোমণি এই সিদ্ধান্তসার বাণী শ্রীপাদ রামানন্দ রায়ের শ্রীমুখে শুনে এবং আস্বাদন করে শ্রীমন্মহাপ্রভুর উল্লাসের সীমা নেই। তাই রামানন্দের প্রশংসা করে প্রভু বললেন—

প্রভু কহে, 'আগে কহ শুনিত পাই সুখে।
অপূর্ব্বামৃত নদী বহে তোমার মুখে॥'

রামানন্দ বললেন—শ্রীমতী রাধারাণীর প্রতি শ্রীকৃষ্ণের নিরপেক্ষ প্রেম। রাধারাণীকে যে কৃষ্ণ ভালবাসেন তাতে অন্য কারও অপেক্ষা নেই। এটি বুঝবার কি উপায়?

চুরি করি রাধাকে নিল গোগীগণের ডরে।

অন্যাপেক্ষা হইলে প্রেমের গাঢ়তা না স্ফুরে॥
অন্যের অপেক্ষা থাকলে প্রেম গাঢ় হয় না।

শ্রীরাধাতে কৃষ্ণের একনিষ্ঠ প্রেম

রাধারাণীর জন্য যদি কৃষ্ণচন্দ্র আর সকলকে ত্যাগ করতে পারেন তাহলে প্রমাণ হবে যে রাধাতে কৃষ্ণের গাঢ় অনুরাগ॥

রাধা লাগি গোপীরে যদি সাক্ষাৎ করেন ত্যাগ।
তবে জানি রাধায় কৃষ্ণের গাঢ় অনুরাগ॥

রামানন্দ বললেন—রাধাতে যে কৃষ্ণপ্রেম—এটি নিরুপম—এর উপমা কোথাও নেই।

রায় কহে,—'তবে শুন প্রেমের মহিমা।
ত্রিজগতে রাধাপ্রেমের নাহিক উপমা॥'

শ্রীকষ্ণচন্দ্র সেব্য—আর রাধারাণী হলেন একনিষ্ঠ সেবিকা। এই সেবিকার সেবা লাভের জন্য শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের এতই লোভ যে যখন রাসস্থলীতে রাধা-রাণীকে গোবিন্দ দেখতে পাচ্ছেন না—তাঁর অদর্শনে গোবিন্দ বিলাপ করছেন—

গোপীগণের রাসনৃত্য মণ্ডলী ছাড়িয়া।
রাধা চাহি বনে ফিরে বিলাপ করিয়া॥

রাধারাণীই শ্রীকৃষ্ণ প্রীতি সেবার মূর্ত্তি। শ্রীগীতগোবিন্দ কাব্যে শ্রীজয়দেব কবি বলেছেন—

কংসারিরপি সংসারবাসনাবদ্ধ শৃঙ্খলাম্।
রাধামাদায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরী॥

গীতগোবিন্দ ৩।১২

ইতস্ততস্তামনুসৃত্য রাধিকা-
মনঙ্গবাণব্রণখিন্নমানসঃ।
কৃতানুতাপ স কলিন্দনন্দিনী
তটান্তকুঞ্জে বিষসাদ মাধবঃ॥

কংসারি (শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র) যাঁকে রাধারাণীর প্রেমই একমাত্র শৃঙ্খলিত করে রাখতে পারে অর্থাৎ বেঁধে রাখতে পারে। কৃষ্ণ হলেন মদমত্ত কুঞ্জর (হস্তী) তাঁকে শৃঙ্খলিত করবার ক্ষমতা আর কারও নেই। সেই রাধাকে হৃদয়ে

ধারণ করে শ্রীগোবিন্দ অন্যান্য ব্রজরামাদের ত্যাগ করে গেছেন। কামশরে জর্জ্জরিত হৃদয় গোবিন্দ—এ কামনা প্রাকৃত কামনা নয়—কারণ কৃষ্ণ তো সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ—অপ্রাকৃত নবীন মদন। তিনিই তো মদনমোহন প্রাকৃত মদনকে মুগ্ধ করেন, বশীভূত করেছেন বলেই তো তাঁর নাম মদনমোহন। মদনের পঞ্চবাণ ভেঙে হল খান খান। কোটি মদন গোবিন্দের চরণে পড়ে মূরছিত হয়। মহাজন বললেন—

কামের রতি ছাড়ি পতি
বিকায় গোরার পদতলে।

তাই কৃষ্ণের কামনা বলতে ঘনীভূত প্রেমকেই বুঝায়—তাই জয়দেব কবি বললেন—অনঙ্গবাণব্রণখিন্নমানসঃ—শ্রীমতী রাধারাণীর অন্বেষণে ইতস্তত অনুসরণ করতে করতে কৃষ্ণচন্দ্র বিষন্ন হয়ে শ্রীযমুনাতটে এককুঞ্জে বসে পড়লেন। শ্রীজয়দেব কবির এই অপূর্ব্ব আস্বাদনে অমৃতের প্রবাহ রয়েছে। শ্রীরাসস্থলীতে শ্রীমদনমোহন শতকোটি গোপী নিয়ে রাস করছেন বটে—কিন্তু নিজে এক স্বরূপে শ্রীমতী রাধারাণীর পাশেই আছেন।

শতকোটি গোপী সঙ্গে রাস বিলাস।
তার মধ্যে এক মূর্ত্তে রহে রাধাপাশ॥

সাধারণ গোপরামাদের প্রেমে গোবিন্দের সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি—কিন্তু রাধারাণী কুটিল প্রেমে বাম্যভাব। রাধারাণী এই কৃষ্ণপ্রেমের কুটিলতা বাম্যভাব বুঝাতে গিয়ে শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে শ্রীরূপগোস্বামিপাদ শৃঙ্গার ভেদ কথনে উপমা দিয়েছেন—

অহেরিব গতিঃ প্রেম্নঃ স্বভাবকুটিলা ভবেৎ।
অতো হেতোরহেতোশ্চ ঘূনোর্মান উদঞ্চতি॥

অহি (সর্প) যেমন কখনও সোজা হয়ে চলে না—তার গতি হল জঙ্গমাকুটিলা এঁকেবেঁকে চলে তেমনি প্রেমের গতি হল কুটিলা—কারণ থাক আর নাই থাক—কান্তা এবং কান্তে মান। প্রসঙ্গতঃ একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

প্রিয় সখী শ্রীললিতাজীর সঙ্গে রাধারাণী যাচ্ছেন, যেতে যেতে হঠাৎ থেমে গেলেন—আর যাচ্ছেন না। ললিতাজী বলছেন—কি হল? থামলি যে? চল, এই তো বেশ যাচ্ছিলি। ঠাকুরাণী বলছেন—দেখছিস্ না? ললিতাজী বলছেন, কি দেখব? রাধারাণী বললেন, ঐ দ্যাখ, একটি

তমালতরুকে বেষ্টন করে স্বর্ণলতিকা (সোনালী লতা) উঠেছে। তাই দেখেই রাধারাণীর মান হয়ে গেছে। এখানে মানের কোন হেতু (কারণ) নেই। অকারণেই মান। তমালতরুকে রাধারাণী কৃষ্ণ ভাবছেন আর তাকে আলিঙ্গন করে আছে স্বর্ণলতিকা নয় অন্য কোন গোপরামা। এইটি মনে করেই মান। ললিতাজী যখন সেটি জানতে পারলেন, তখন ভাবছেন এ প্রেমের তো থৈ পাওয়া যায় না—এ কেমন অনুরাগ। মনে মনে বলছেন, রাধে! তোর এই প্রেম না হলে কি আমি তোর চরণে দাসী হয়ে থাকি?

রাধারাণী রাসস্থলী পরিত্যাগ করে গেলেন—মান করে—তখন কৃষ্ণ তাঁকে খুঁজতে গেলেন—

ক্রোধ করি রাস ছাড়ি গেলা মান করি।
তাঁরে না দেখিয়া ব্যাকুল হৈল শ্রীহরি॥
সম্যক্‌সার বাসনা কৃষ্ণের রাসলীলা।
রাসলীলা বাসনাতে রাধিকা শৃঙ্খলা॥
তাঁহা বিনু রাসলীলা নাহি ভায় চিত্তে।
মণ্ডলী ছাড়িয়া গেলা বাধা অন্বেষিতে॥
ইতস্ততঃ ভ্রমি কাহাঁ রাধা না পাঞা।
বিষাদ করেন কামবাণে খিন্ন হঞা॥

শ্রীরাধিকার প্রেম যে অসমোর্দ্ধ অর্থাৎ রাধারাণীর প্রেমের সমানই তো কোথাও নেই—সুতরাং উর্দ্ধ অর্থাৎ বেশী তো কোথাও থাকবেই না—তার প্রমাণ—

শতকোটি গোপীতে নহে কাম নির্ব্বাপণ।
তাহাতেই অনুমানি শ্রীরাধিকার গুণ॥

তাহলে সিদ্ধান্ত হল রাধারাণীর প্রেম সাধ্যশিরোমণি—এ প্রেমের নাগাল কেউ পাচ্ছে না। জীবকোটি তো নয়ই, দ্বারকার মহিষীরাও পাচ্ছেন না, এমন কি অন্যান্য গোপরামার পক্ষেও সম্ভব হচ্ছে না। গোপীমুখ্যা রাধারাণীর প্রেম সকলের ওপরে। একে লক্ষ্য করেই শ্রীরূপগোস্বামিপাদ তাঁর শ্রীবিদগ্ধমাধব নাটকের মঙ্গলাচরণে ইষ্টবন্দনায় রাধাপ্রেমের একটি বিশেষণ দিলেন—'উন্নতোজ্জলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্'—স্বভক্তিশ্রী বলতে নিজের ভক্তিসম্পদ। দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর—এই

চার রকমের ভক্তি সবই তো গোবিন্দের নিজস্ব সম্পদ্—তাহলে রাধাপ্রেমকে কি করে বুঝাবে? সেজন্য বিশেষণ দিলেন উজ্জ্বলরসাং—উজ্জ্বলরস বলতে মধুররস, শৃঙ্গার রস আদিরসকে বুঝায়—তাতেও ঠিক রাধাপ্রেমকে বুঝানো গেল না। কারণ শৃঙ্গাররসে গোবিন্দকে অনেকেই ভজনা করেন—দ্বারকার মহিষীরা, কুরুনাগরীরা, মথুরানাগরীরা। কিন্তু রাধাপ্রেমের দিকে লক্ষ্য রেখে শ্রীরূপ শ্রীগোস্বামিপাদ আর একটি বিশেষণ দিলেন—উন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্। রাধারাণীর প্রেম শুধু উজ্জ্বলরস নয়, উন্নত উজ্জ্বলরস। উন্নত অর্থাৎ রাধারাণীর প্রেম এমন উঁচুতে রয়েছে যার নাগাল কেউ পাচ্ছে না। এই উন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্ বলতে একমাত্র রাধাপ্রেমকেই বুঝানো হয়েছে—যে প্রেম দান শুধু নয়, প্রেম সমর্পণ লীলায় শ্রীগৌরসুন্দরের কলিযুগের আবির্ভাব।

রাধারাণীর প্রেম সাধ্যশিরোমণি—এই পর্য্যন্ত শ্রীপাদ রামানন্দ পৌঁছেছেন—এ সিদ্ধান্তে মহাপ্রভু আনন্দে বিভোর। বক্তা রামানন্দ রায়ের কাছে শিষ্যত্ব বরণ করে উল্লসিত হয়ে মহাপ্রভু বললেন—

প্রভু কহে, 'যে লাগি আইলাম, তোমা স্থানে।
সেই সব তত্ত্ব বস্তু হৈল মোর জ্ঞানে॥'

শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপে ভক্তভাবের প্রাবল্য। কারণ রাধারাণীর ভাবকান্তি অঙ্গীকার করেই গোবিন্দ গৌর হয়েছেন। তাই ভক্তভাবে কৃষ্ণভজন কি রকম সেটি শুনবার জন্য তাঁর লোভ। তাই বললেন—

'এবে সে জানিলু সাধ্যসাধন নির্ণয়।
আগে আর আছে কিছু শুনিতে মন হয়॥'

সাধ্য সাধন নির্ণয় তো জানলাম—এর ওপরে আর যদি কিছু থাকে কৃপা করে বল। আমার সে সব তত্ত্ব শুনবার জন্য বড় সাধ। মহাপ্রভুর অন্তরের এ ব্যাকুলতা রস পিয়াসীর রস আস্বাদনের ব্যাকুলতা। মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবানের প্রশ্ন এবং ভক্তপ্রবর রামানন্দ রায়ের উত্তর দান। এ বড় বিচিত্র লীলা।

নবম ধারা

কৃষ্ণ, রাধা, রস, প্রেম, স্বরূপ তত্ত্ব

স্বয়ং ভগবান গৌরসুন্দর রসলোলুপ হয়ে আজ শ্রীপাদ রামানন্দ রায়ের কাছে গোদাবরী তীরে নিজেই প্রেরণা দিয়ে নিজের স্বভক্তি সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেছেন। অশেষবিশেষ রসভোক্তার আস্বাদন তো সীমাবদ্ধ হতে পারে না। তাই সাধ যেন মেটে না কিছুতেই। রাধাপ্রেম সাধ্যশিরোমণি এই সিদ্ধান্তে রাধাভাবে ভোরা গোরা—রাধাপ্রেমরসঘনাকৃতি শ্রীগৌরসুন্দর এতক্ষণে বুঝি লক্ষ্যস্থানে পৌঁছেছেন। তাই বললেন—

প্রভু কহে, 'যে লাগি আইলাম তোমা স্থানে।
সেই সব তত্ত্ববস্তু হৈল মোর জ্ঞানে॥
এবে সে জানিলুঁ সাধ্য সাধননির্ণয়।
আগে আর আছে কিছু শুনিতে মন হয়॥

প্রভু প্রশ্ন করছেন—

'কৃষ্ণের স্বরূপ' কহ 'রাধার স্বরূপ'
'রস' কোন তত্ত্ব, 'প্রেম' কোন তত্ত্বরূপ।
কৃপা করি এই তত্ত্ব কহ তো আমারে।
তোমা বিনা কেহ ইহা নিরূপিতে নারে॥'

কৃষ্ণের স্বরূপ, রাধার স্বরূপ, রস কোন তত্ত্ব, প্রেম কোন তত্ত্বরূপ—প্রভুর প্রশ্নের পর প্রশ্ন। রামানন্দ, একমাত্র তুমি ছাড়া এ তত্ত্ব নির্ণয়ের সামর্থ বা অধিকার আর কারও নেই।

রামানন্দ মহাপ্রভুকে যন্ত্রী ও নিজেকে যন্ত্র এই অনুভব করে অতি বিনীত ভাবে উত্তর দিলেন—

রায় কহে, 'ইহা আমি কিছুই না জানি।
তুমি যেই কহাও, সেই কহি আমি বাণী॥
তোমার শিক্ষায় পড়ি যেন শুকপাঠ।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি, কে বুঝে তোমার নাট॥
হৃদয়ে প্রেরণ কর, জিহ্বায় কহাও বাণী।
কি কহিয়ে ভাল মন্দ, কিছুই না জানি॥'

রামানন্দ মহাপ্রভুর শ্রীচরণে নিজেকে সঁপে দিয়েছেন, তাই বললেন—আমি যা বলছি, তা আমি জানি না, এতে আমার কোন কর্ত্তৃত্বই নেই।

তুমি যা বলাচ্ছ, তাই বলছি। শুকপাখী মিষ্টি মিষ্টি বুলি বলে—কিন্তু সে তো নিজে নিজে কথা বলে না, তাকে যেমন শেখান হয় সেই রকম বলে। তেমনি প্রভু, তুমিও হৃদয়ে প্রেরণা দিয়ে জিহ্বায় যা উচ্চারণ করাচ্ছ—তাই বলছি তার ফলে এ বাণীর ভাল মন্দ আমি কিছু জানি না। আমি তোমার নাটের পুতুল—তুমি সূত্রধার, তুমি সাক্ষাৎ ঈশ্বর। যে কথা জিহ্বায় উচ্চারিত হচ্ছে এ আমার কথা নয়, এ তোমারই কথা—রামানন্দের কাছে মহাপ্রভু ধরা পড়ে গেছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু এখানে নিজেকে মায়াবাদী সন্ন্যাসী কৃষ্ণবিমুখ ও দীন বলে উল্লেখ করে রামানন্দকে ছলনা করবার চেষ্টা করছেন—

প্রভু কহে, 'মায়াবাদী আমি ত সন্ন্যাসী।
ভক্তিতত্ত্ব নাহি জানি, মায়াবাদে ভাসি'॥

মায়াবাদী ভক্তিতত্ত্ব জানে না। কারণ ভগবানের বিগ্রহ এবং ভগবান অভিন্ন স্বরূপ—যদাত্মকো ভগবান্ তদাত্মিকা ব্যক্তিঃ—বিগ্রহ এব ভগবান্ এব বিগ্রহঃ—এটি ভক্তিতত্ত্বের মূল কথা। বিগ্রহে চিন্ময়বুদ্ধি—এটি বৈষ্ণবধর্মের স্তম্ভ। মায়াবাদী অর্থাৎ জীবই ব্রহ্ম, এই জীবব্রহ্মের অভিন্নতা যারা প্রতিপাদন করেন তাদেরই মায়াবাদী বলা হয়—এঁদের সোঽহংবাদ—অহং ব্রহ্মাস্মি (ঋগ্বেদ) তত্ত্বমসি (সামবেদ) প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম (যজুর্বেদ) অয়মাত্মা ব্রহ্ম (অথর্ব্ববেদ) এই চারবেদের চারটি মহাবাক্যকে মায়াবাদী অদ্বৈতবেদান্তী জীবব্রহ্মের অভিন্নতায় প্রতিপাদন করেন, তাঁরা ব্রহ্মের বিগ্রহ স্বীকার করেন না। ব্রহ্মকে নিরাকার বলেন কারণ যা কিছু আছে সবই আকারবান—সকল বস্তুরই রূপ অর্থাৎ আকার আছে। তাই ব্রহ্ম তত্ত্ববস্তু তারও যদি আকার স্বীকার করা যায়, তাহলে ব্রহ্মও প্রাকৃত হয়ে পড়েন—এই আশঙ্কায় অদ্বৈতবেদান্তী ব্রহ্মকে (তত্ত্ববস্তুকে) বলেন নিরাকার এবং অরূপ। কিন্তু ভক্তিবাদীর কথা, তা কি করে হবে। ব্রহ্মে অর্থাৎ তত্ত্ববস্তুতে আকার আছে—শুধু আকার নয় তার অনন্তরূপ, তবে সে রূপ তো প্রাকৃত হতেই পারে না। কারণ তত্ত্বে মায়ার কোন বস্তু অর্থাৎ প্রাকৃত কোন বস্তু পৌঁছুয় না। তত্ত্বকে মায়া স্পর্শ করতে পারে না। তাই ব্রহ্মের যে আকার বা রূপ সেটি অপ্রাকৃত। কিন্তু মায়াবাদী এটি মানে না। তাই মহাপ্রভু নিজেকে আবরণ দিয়ে বললেন—আমি তো মায়াবাদী সন্ন্যাসী (কেশব ভারতীর কাছে সন্ন্যাসমন্ত্রে দীক্ষা) তাই ভক্তিতত্ত্ব কিছু বুঝি না। মহাপ্রভু আরও বললেন—

'সার্ব্বভৌম সঙ্গে মোর মন নির্ম্মল হইল।
'কৃষ্ণভক্তিতত্ত্ব কহ', তাঁহারে পুছিল।'
তেঁহো কহে, 'আমি নাহি জানি কৃষ্ণকথা।
সবে রামানন্দ জানে তেঁহো নাহি এথা॥'

শ্রীধাম নীলাচলে সার্ব্বভৌমের সঙ্গলাভ করে আমার মন শুদ্ধ হয়েছে—তিনি ব্রাহ্মণ। সার্ব্বভৌম বললেন—আমি তো কৃষ্ণকথা জানি না, জানেন একমাত্র রামানন্দ—কিন্তু তিনি তো এখানে নেই। রামানন্দ জাতিতে তো ব্রাহ্মণ নন, শূদ্র কিন্তু কৃষ্ণতত্ত্ব জানেন এবং পরম বৈষ্ণব। তাই গৌরসুন্দর বললেন—

তোমার ঠাঞি আসলাঙ তোমার মহিমা শুনিয়া।
তুমি মোরে স্তুতি কর সন্ন্যাসী জানিয়া॥'

এখানে ব্রাহ্মণ শূদ্রের কোন জাতিবিচার নেই—যিনি কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা তিনিই গুরু পদবাচ্য—তাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখের উক্তি—

'কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শুদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা, সেই গুরু হয়॥'

মহাপ্রভু বললেন—দেখ রামানন্দ, আমি ব্রাহ্মণঘরে জন্মগ্রহণ করে সন্ন্যাস নিয়েছি, সুতরাং শূদ্রের কাছে কোন ধর্মশিক্ষা গ্রহণ করা চলবে না—এটি নে করো না। কারণ বর্ণাশ্রমরূপ ধর্মশিক্ষা এবং দীক্ষার সম্বন্ধেই ব্রাহ্মণগুরুর প্রয়োজনীয়তা কিন্তু কৃষ্ণতত্ত্বজ্ঞান সর্ব্বজীবের পরমার্থ। এই তত্ত্বজ্ঞানের 'গুরু' হবার অধিকার বিচারে এইটিই একমাত্র সিদ্ধান্ত আছে যে জাতিতে ব্রাহ্মণই হোক, আর সন্ন্যাসীই হউক, যিনি কৃষ্ণতত্ত্ব জানেন তিনিই গুরু হতে পারেন। শ্রীহরিভক্তি বিলাসে যে কথা আছে, উচ্চবর্ণের যোগ্য পুরুষ থাকতে হীনবর্ণ ব্যক্তির কাছে কৃষ্ণমন্ত্র নেওয়া উচিত নয়—সেটি লোকাপেক্ষি বৈষ্ণবপর। কারণ ব্যবহারিক শাস্ত্র এবং পারমার্থিক শাস্ত্র এই দু'রকমের শাস্ত্র আছে। তাই সংসারে যাঁরা প্রচলিত বিধিমতে কিছু পরমার্থের উদ্দেশ করতে ইচ্ছা করেন এটি হল তাঁরে পক্ষে। এটি হল ব্যবহারিক শাস্ত্র। আর যাঁরা বৈধী ও রাগানুগা ভক্তির তাৎপর্য্য জেনে বিশুদ্ধ কৃষ্ণভক্তি পেতে ইচ্ছা করেন তাঁদের সম্বন্ধে উপযুক্ত কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা যে কোন বর্ণে বা যে কোন আশ্রমেই পাওয়া যান তাঁকেই গুরু বলে বরণ করাই বিধি। কারণ শ্রীহরিভক্তিবিলাস পদ্মপুরাণের একটি বচন তুলেছেন—

ন শূদ্রাঃ ভগবদ্ভক্তাস্তেঽপি ভাগবতোত্তমাঃ।
সর্ব্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে॥

আরও বলা আছে—

ষটকর্মনিপুনো বিপ্রো মন্ত্রতন্ত্রবিশরদঃ।
অবৈষ্ণবো গুরুর্ন স্যাদ্বৈষ্ণবঃ শ্বপচো গুরুঃ॥
মহকুলপ্রসূতোঽপি সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
সহস্রশাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃ স্যাদবৈষ্ণবঃ॥
বিপ্রক্ষত্রিয়বৈশ্যাশ্চ গুরবঃ শূদ্রজন্মনাম্।
শূদ্রাশ্চ গুরবস্তেষাং ত্রয়াণাং ভগবৎপ্রিয়াঃ॥

শূদ্র জাতি কিন্তু সে যদি ভগবদ্ভক্ত হয় তাহলে সেও উত্তম ভাগবত, সে শূদ্র হবে না। আর যে কোন বর্ণের হোক তার যদি ভগবানে ভক্তি না থাকে তাহলে তাকেও শূদ্রই বলা হবে।

যজন যাজন কর্মে নিপুণ মন্ত্রতন্ত্র বিশারদ এমন যে ব্রাহ্মণ তিনিও যদি বৈষ্ণব না হন তাহলে তিনি গুরুপদবাচ্য হবেন না। কিন্তু জাতিতে চণ্ডাল হীন তিনি যদি বৈষ্ণব হন তাহলে তাঁকেও গুরুপদে বরণ করা যাবে। উচ্চবংশে জন্ম, সর্ব্বযজ্ঞে দীক্ষিত, বেদের সহস্র শাখা অধ্যায়ন করেছেন—কিন্তু তিনি যদি বৈষ্ণব না হন তাহলে তাঁকে গুরুপদে বরণ করা যাবে না। আর জাতিতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য—কিন্তু তাঁরাও জাতিতে শূদ্রকেও গুরুপদে বরণ করতে পারবেন যদি সেই শূদ্র বৈষ্ণব অর্থাৎ ভগবানের প্রিয় (ভক্ত) হন। তাই এখানে কোন জাতির বিচার নেই।

রামানন্দ রায়কে মহাপ্রভু রাধাতত্ত্ব, কৃষ্ণতত্ত্ব কীর্ত্তন করবার জন্য কাতরে অনুনয় করছেন, অত্যন্ত লোলুপতায় রস আস্বাদনের একটি দিক্।

'সন্ন্যাসী বলিয়া মোরে না করিহ বঞ্চন।
কৃষ্ণরাধা তত্ত্ব কহি পূর্ণ কর মন॥'

ভগবানের মায়া প্রায় সকলকেই মুগ্ধ করে—এই মায়ার নাট থেকে কেউ নিষ্কৃতি পায় না—তাই সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা, দেবাদিদেব শঙ্কর, দেবর্ষিপাদ নারদ, দেবরাজ ইন্দ্র সবাই এই মায়ার ফাঁদে জড়িয়ে পড়েছেন—কিন্তু এর মধ্যে যিনি প্রকৃত কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা তাঁর কাছে এই মায়া ঘেঁসবে না। কারণ ভগবান শ্রীগোবিন্দজী শ্রীমুখে বলেছেন—

মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে। গীঃ ৭।১৪

তাই প্রকৃত কৃষ্ণরসবিদ্ শ্রীপাদ রামানন্দ রায় ধীর স্থির, অচল অটল।

যদ্যপি রায় প্রেমী, মহাভাগবতে।
তাঁর মন কৃষ্ণমায়া নারে আচ্ছাদিতে॥

প্রভুর ইচ্ছাশক্তিতেই সেবক চলে— ভগবদ্ভক্ত মায়ার দাস নয়। তাই এখানে প্রভুর প্রবল ইচ্ছা শক্তিই রামানন্দকে চালিত করছে—

তথাপি প্রভুর ইচ্ছা পরম প্রবল।
জানিলেহ রায়ের মন হইল টলমল।
রায় কহে, 'আমি নট, তুমি সূত্রধার।
যেইমত নাচাও, তৈছে চাহি নাচিবার॥
মোর জিহ্বা-বীণাযন্ত্র, তুমি বীণাধারী।
তোমার মনে যেই উঠে তাহাই উচ্চারি॥'

রামানন্দ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণে নিজেকে সঁপে দিয়ে বললেন—আমি নট, আর তুমি হলে সূত্রধার—আমি তোমার খেলার পুতুল যেমন নাচাবে তেমনি নাচব, আমার নিজের কোন স্বাতন্ত্র্য নেই।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা প্রেরণায় রামানন্দ কৃষ্ণতত্ত্ব—কৃষ্ণের স্বরূপের পরিচয় দিচ্ছেন—

'পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
সর্ব্ব-অবতারী, সর্ব্বকারণ প্রধান॥
অনন্ত বৈকুণ্ঠ, আর অনন্ত অবতার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ইঁহা—সবার আধার॥
সচ্চিদানন্দতনু ব্রজেন্দ্র নন্দন।
সর্ব্বৈশ্বর্য্য সর্ব্বশক্তি, সর্ব্বরসপূর্ণ॥'

ব্রহ্মসংহিতায় ব্রহ্মার বাক্য—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ং ভগবান—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ থেকেই সকল ভগবানের প্রকাশ। বলা আছে স্বয়ং ভগবানের লক্ষণ—

যাঁর ভগবত্তা হইতে অন্যের ভগবত্তা।
স্বয়ং ভগবান্ শব্দের তাঁহাতেই সত্তা॥

শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্রের পরিভাষা বাক্য—এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্। এই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ। সৎ, চিৎ এবং

আনন্দই তাঁর স্বরূপের উপাদান, যদিও মানুষের মতই আকৃতি তবু তাঁকে মানুষ বলা যাবে না—কারণ মানুষের দেহের যে উপাদান রক্ত মাংস মেদমজ্জা অস্থি চর্ম তা কৃষ্ণ স্বরূপে নেই। তাই শাস্ত্র বারে বারে বলেছেন—'কপটমানুষঃ।' ক্রীড়ামানুষরূপিণঃ। দেবর্ষিপাদ নারদ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের কাছে বললেন—

'গূঢ়ং পরং ব্রহ্ম মনুষ্যলিঙ্গম্'। ভাঃ ৭।১০।৪৮

দেখতে মানুষের মত, কিন্তু স্বরূপে শুধু ব্রহ্ম নন—পরং ব্রহ্ম অর্থাৎ ঘনীভূত ব্রহ্ম। ভগবান অর্জ্জুনদেবকে উপলক্ষ করে নিজের তত্ত্ব কথা বললেন—অর্জ্জুন, যারা আমার এই মানুষ আকৃতি দেখে আমাকে মানুষ বুদ্ধি করে তারা আমাকে অবজ্ঞা করে, আমার প্রকৃত তত্ত্ব জানে না। তবে যে পিতামহ ভীষ্মের নিশিত বাণে ক্ষত হয়ে কৃষ্ণ অঙ্গে রক্তধারা দেখা গেছে সেটি কৃষ্ণ অঙ্গের উপাদান নয়—ওটি হল অসুরমোহন লীলা। কৃষ্ণ অঙ্গে রক্তধারা দেখলে যারা ভগবানের পাদপদ্মে বিমুখ (অসুর) তারা ভাববে কৃষ্ণ তাহলে মানুষই, ভগবান নন। ভগবানও তাই চান। কারণ সবাই যদি ভগবানের তত্ত্ব বুঝে নেয় তাহলে তো সংসার থাকে না—সৃষ্টিও তো ভগবানের এক লীলা। ভগবান নিজের স্বরূপ সকলের কাছে প্রকাশ করেন না। গীতাবাক্যে বললেন—

নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়া সমাবৃতঃ। গী ৭।২৫

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই একমাত্র পরম ঈশ্বর—অর্থাৎ পরমেশ্বর। তাঁর অধীনে সকলে। শিব ব্রহ্মা ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ সবাই তাঁর অধীনে কাজ করেন। ব্রহ্মা সৃষ্টি কাজ করেন, শিব রুদ্ররূপে সংহার কাজ করেন—ইন্দ্র বৃষ্টি দেন বাতাস প্রবাহিত হয়, অগ্নি দহন করে, সূর্য্য তাপ দেয়—সব গোবিন্দের আদেশে। এমন কি বনস্পতি, লতা, গুল্ম, বৃক্ষ নিজ নিজ ফুলফুল প্রতি ঋতু অনুযায়ী দেয় সব ভগবানের আদেশে। তাই বললেন—

একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য।
যারে যৈছে নাচায় সে তৈছে করে নৃত্য॥

এই কৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ং ভগবান অনাদি এবং আদি দুইই। তাঁর আর কেউ আদি অর্থাৎ কারণ নেই, তাই তিনি অনাদি অর্থাৎ অন্য কোন কিছু থেকে কৃষ্ণ ভগবান এসেছেন তা বলা যাবে না—আর সকলের তিনি আদি অর্থাৎ তাঁর থেকে সকলের প্রকাশ। বলেছেন—'মত্তঃ সর্ব্বং

প্রবর্ত্ততে।' জগতে যেখানে যত কারণ আছে সকলের তিনি কারণ তাই বলা হল সর্ব্বকারণকারণম্।

ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই সর্ব্বোপরি তত্ত্ব। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ বললেন—'অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন।' সেই মদনমোহনের স্বরূপ—

বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন।
কামগায়ত্রী কামবীজে যাঁর উপাসনা॥

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র অপ্রাকৃত নবীন মদন। প্রাকৃত বা জড় আর তার বিপরীত হল অপ্রাকৃত বা চিন্ময়। প্রাকৃত যে কামনা সেটি কালের দ্বারা ক্ষুব্ধ হয় অর্থাৎ প্রকাশ কালেই অনুভব হয় এবং পরক্ষণে মলিন হয় এবং ক্রমে তা আর থাকে না। কিন্তু অপ্রাকৃত কাম এরই নাম প্রেম—এটি নিত্যনবনবায়মান অর্থাৎ কালবেগে তার সমাপ্তি হয় না, সর্ব্বদাই উজ্জ্বল থাকে। সাক্ষান্মন্মথমন্মথ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নিত্য নবীন স্বয়ং রূপবিগ্রহ। কামগায়ত্রী বলতে বুঝায় যে বস্তু গানকারীকে ত্রাণ করে বা গান দ্বারা ত্রাণ করায়। তাই বলা আছে কামগায়ত্রী মন্ত্ররূপ হয় কৃষ্ণস্বরূপ। এই কামগায়ত্রী অপ্রাকৃত। অপ্রাকৃত অনুভূতিতে অপ্রাকৃত বচনের দ্বারা সাধক কৃষ্ণের উপাসনা করেন। কামবীজ হল অপ্রাকৃত ক্লীং। ব্রহ্মসংহিতা বললেন

প্রেমানন্দ মহানন্দ রসেনাবস্থিতং হি যৎ।
জ্যোতিরূপেন মনুনা কামবীজেন সঙ্গতম॥

ব্রহ্মসংহিতা ৫।৩

অপ্রাকৃত কামবীজ সংযুক্ত অপ্রাকৃত কামগায়ত্রী দ্বারা অপ্রাকৃত নিত্য নূতন মদনমোহন বিগ্রহের অপ্রাকৃত উপাসনা হয়। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ ক্লীং বীজের টীকা করলেন—'জলং ককারঃ তদ্বাচিত্বাৎ, ভূমির্লকারঃ লকর বীজত্বাৎ তথা ঈ দীর্ঘ ঈকারঃ অগ্নিঃ কৃতসন্ধিত্বাৎ ইন্দুরনুস্বারঃ তদাকারত্বাৎ। তেষাং সম্পাতো মিলনং তেন জাতং যৎ কামবীজং তদাদিকং কৃষ্ণায়েত্যেকপদমিত্যর্থঃ। অর্থাৎ 'ক্লীং' এই বীজটি জল (ক) ভূমি (ল) অগ্নি (ঈ) এবং ইন্দু অনুস্বার—এদের মিলনে প্রকটিত। এই ক্লীং বীজকে আদিতে যোগ করে কৃষ্ণমন্ত্রে কৃষ্ণনামে পরব্রহ্মের রসন অর্থাৎ সন্তোষমূলক উপাসনা হয়েছে।

কৃষ্ণমাধুর্য্য সকলকে আকর্ষণ করে—
পুরুষ যোষিৎ কিবা স্থাবর জঙ্গম।
সর্ব্বচিত্তাকর্ষক—সাক্ষাৎ মন্মথ মদন॥

আরও বললেন—শৃঙ্গার রসবাজময় মূর্ত্তিধর।
এতএব আত্মপর্য্যন্ত সর্ব্বচিত্তহর॥

কৃষ্ণ নিজের মাধুর্য্য আস্বাদন করবার জন্য নিজেই লোভী। এ আস্বাদনে তাঁর নিজের মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয় দিয়ে নয়। রাধারাণী তাঁর মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয় দিয়ে যেভাবে কৃষ্ণমাধুর্য্য আস্বাদন করেন, আজ কৃষ্ণচন্দ্র সেইভাবে নিজের মাধুর্য্য আস্বাদন করতে চান। কৃষ্ণ যখন রাধারাণীর মত করে নিজের মাধুরী আস্বাদন করতে চান বা আস্বাদন করেন তখন তিনিই তো গৌর। এইটিই গৌরস্বরূপের বীজ।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের মাধুর্য্য নারায়ণ এবং লক্ষ্মীঠাকুরাণীকেও আকর্ষণ করে।
লক্ষ্মীকান্তাদি অবতারের হরে মন।
লক্ষ্মী আদি নারীগণের করে আকর্ষণ॥

শ্রীগোবিন্দজী নিজের মাধুর্য্যে নিজেই মুগ্ধ—
আপন মাধুর্য্যে হরে আপনার মন।
আপনা আপনি চাহে করিতে আলিঙ্গন॥

শ্রীললিতমাধব নাটকে শ্রীরূপগোস্বামিপাদ বলেছেন—
অপরিকলিতপূর্ব্বঃ কশ্চমৎকারকারী
স্ফুরতি মম গরীয়ানেষ মাধুর্য্যপূরঃ।
অয়মহমপি হন্ত প্রেক্ষ্য যং লুব্ধচেতাঃ
সরভসমুপভোক্তুং কাময় রাধিকেব॥

রায় রামানন্দ বললেন—
'এই ত সংক্ষেপে কহিল কৃষ্ণের স্বরূপ।
এবে সংক্ষেপে কহি শুন রাধাতত্ত্বরূপ॥'

কারণ শ্রীগৌরসুন্দর আজ অসীম ক্ষুধা ও পিপাসা নিয়ে আকুল হয়ে বসেছেন আস্বাদনের জন্য। তাই কৃষ্ণতত্ত্ব কৃষ্ণস্বরূপ আস্বাদনের পরেও রাধাতত্ত্ব জানতে চেয়েছেন।

কৃষ্ণের অনন্তশক্তির মধ্যে তিনটি প্রধান চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি এবং জীবশক্তি। এদেরই বলা হয় অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা এবং তটস্থা শক্তি। এদের মধ্যে. আবার অন্তরঙ্গা শক্তি অর্থাৎ স্বরূপাশক্তি সকলের উপরে। এই স্বরূপা শক্তির আবার তিনটি রূপ।
সচ্চিদানন্দময় কৃষ্ণের স্বরূপ।
অতএব স্বরূপশক্তি হয় তিনরূপ॥

আনন্দাংশে হলাদিনী, সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সংবিৎ-যারে জ্ঞান করি মানি॥

সদংশে সন্ধিনী, চিদংশে সংবিৎ এবং আনন্দ অংশে হলাদিনী বা আনন্দিনী।

হ্লাদিনী সন্ধিনী সংবিৎ ত্বয্যেকা সর্ব্বসংশ্রয়ে।
হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জিতে॥

কৃষ্ণকেও যিনি আনন্দ দেন, আহ্লাদিত করেন তাই তাঁর নাম হলাদিনী। সেই শক্তি দ্বারে নিজেও সুখ আস্বাদন করেন।

কৃষ্ণকে আহ্লাদে তাতে নাম 'হলাদিনী'।
সেই শক্তি দ্বারে সুখ আস্বাদে আপনি॥
সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন।
ভক্তগণে সুখ দিতে 'হলাদিনী' কারণ॥

এই হ্লাদিনী শক্তির ঘনীভূত স্বরূপ শ্রীমতী রাধারাণী—

হ্লাদিনীর সার অংশ তার 'প্রেম' নাম।
আনন্দচিন্ময়রস প্রেমের আখ্যান॥
প্রেমের পরম সার মহাভাব জানি।
সেই মহাভাবরূপা রাধাঠাকুরাণী॥

শ্রীমতী রাধারাণীর স্বরূপ ও দেহ ভিন্ন নয়—একই—তা সম্পূর্ণ কৃষ্ণ প্রেমময়।

এখন এখানে একটি প্রশ্ন হতে পারে প্রেম বা রস বস্তু তো তরল—তা দিয়ে গঠন কি করে হবে? তরল বস্তুতে কোন গঠন হয় না। যেমন আখের রস দিয়ে তো শিল্পী কোন মূর্ত্তি তৈরী করতে পারে না। না, রস দিয়ে মূর্ত্তি হয় না, তবে রসকে ঘন করলে তা দিয়ে মূর্ত্তি তৈরী করা যায়। আখের রসকে জ্বাল দিয়ে ঘন করলে গুড় হয়, তাকে ঘন করলে চিনি, চিনিকে ঘন করলে মিছরি, মিছরিকে আরও সুন্দর করলে সিতা মিছরি—এই সিতা মিছরি দিয়ে শিল্পী এক সুন্দর পুতুল তৈরী করে দিতে পারে। তেমনি 'প্রেম' বা 'রস' দিয়ে গঠন হয় না কিন্তু তাকে ঘন করলে তাই দিয়ে মূর্ত্তি তৈরী হতে পারে। এই প্রেম ঘন হলে স্নেহ, স্নেহ ঘন হলে মান, মান হলে প্রণয়, প্রণয় ঘন হলে রাগ, রাগ ঘন হলে অনুরাগ, অনুরাগ ঘন হলে ভাব, ভাব ঘন হলে মহাভাব—

সেই মহাভাবরূপা রাধাঠাকুরাণী।
প্রেমের 'স্বরূপ দেহ'—প্রেম বিভাবিত।
কৃষ্ণের প্রেয়সী শ্রেষ্ঠা জগতে বিদিত॥

শ্রীমতী রাধারাণীর কাজ হল কৃষ্ণবাঞ্ছা পূর্ণ করা। কৃষ্ণবাঞ্ছাপূর্ত্তিময়ী শ্রীমতী রাধারাণী।

কৃষ্ণের যতেক বাঞ্ছা রাধাতেই রহে।
কৃষ্ণ বাঞ্ছা পূর্ত্তিরূপ করে আরাধনে।
এতএব রাধিকা নাম পুরানে বাখানে॥
সেই মহাভাব হয় 'চিন্তামণি সার'।
কৃষ্ণ বাঞ্ছা পূর্ণ করে এই কার্য্য তাঁর॥

এর পরে শ্রীল রামানন্দ শ্রীমতী রাধারাণী যে কৃষ্ণপ্রণয়ের মূর্ত্ত বিগ্রহ—রাধারাণীর বলতে যা কিছু সবই কৃষ্ণপ্রেমের স্বরূপ তা পরিপাটি করে বর্ণনা করলেন। রাধারাণীর সর্ব্বদাই কৃষ্ণধ্যান। রাধারাণীর কৃষ্ণধ্যানের এমনই মহিমা যে এই ধ্যানের মূর্ত্তি দর্পনে প্রতিবিম্বিত হয়েছে—এ এক অভিনব সংবাদ প্রেমের। এ দৃষ্টান্ত আর কোথাও নেই—ধ্যানের মূর্ত্তি যে দর্পণে প্রতিবিম্বিত হতে পারে এ জগতে কেউ ভাবতে পারে না। তাই রাধারাণীর স্বরূপের তুলনা জগতে নেই।

কৃষ্ণনাম গুণ যশ—অবতংস কানে।
কৃষ্ণনাম গুণ যশ প্রবাহ বচনে॥
কৃষ্ণকে করায় শ্যামরস মধুপান।
নিরন্তর পূর্ণ করে কৃষ্ণের সর্ব্বকাম॥
কৃষ্ণের বিশুদ্ধ প্রেম রত্নের আকর।
অনুপম গুণগণ পূর্ণ কলেবর॥

শ্রীমতী রাধারাণীই কৃষ্ণপ্রেমের মূল আকর—

কা কৃষ্ণস্য প্রণয়জনিভূঃ শ্রীমতী রাধিকৈকা।
কাস্য প্রেয়স্যনুপমগুণা রাধিকৈকা ন চান্যা॥
জৈহ্ম্যং কেশে দৃশি তরলতা নিষ্ঠুরত্বং কুচেঽস্যা।
বাঞ্ছাপূর্ত্ত্যৈ প্রভবতি হরে রাধিকৈকা ন চান্যা॥

গোবিন্দ লীলামৃত ১১।১২২

শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের মূল হলেন রাধারাণী। প্রেমের অনুপমগুণ রাধারাণীতেই আছে অন্য কোথাও নেই। কুটিলতা আছে কুঞ্চিতকেশপাশে, তরলতা

সরলতা আছে দর্শনযুগলে (নয়নে) আর নিষ্ঠুরত্ব বক্ষোজযুগলে। এককথায় শ্রীকৃষ্ণের বাঞ্ছাপূরণকারী শ্রীমতী রাধারাণীই—তিনি ছাড়া এ জগতে আর কেউ নেই।

এই রাধারাণীর সৌভাগ্যগুণ দ্বারকামহিষী দেবী সত্যভামাও কামনা করেন। রাধারাণীর কাছেই কলাবিলাস সকল ব্রজরামা শিক্ষা করেন। বৈকুণ্ঠের অধিশ্বরী মহালক্ষ্মী, শিবঘরণী পার্ব্বতী যাঁর সৌন্দর্য্যাদি গুণ বাঞ্ছা করেন। রাধারাণীর পাতিব্রত্য দেবী অরুন্ধতী পাবার অভিলাষ করেন। এককথায় বলা যায় রাধারাণীর গুণ গণনা কৃষ্ণ নিজেও করতে পারেন না। সুতরাং জীব ক্ষুদ্রবুদ্ধি সে তো গণনা করতেই পারে না।

এইভাবে রামানন্দ কৃষ্ণতত্ত্ব, রাধাতত্ব শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাপ্রেরণায় প্রকাশ করেন। কিন্তু শুধু তত্ত্বে তো মন ভরে না। তাই মহাপ্রভু বললেন—

প্রভু কহে, 'জানিলুঁ কৃষ্ণরাধা প্রেম তত্ত্ব।
শুনিতে চাহিতে দুঁহার বিলাস মহত্ত্ব॥'

মহাপ্রভুর এই প্রশ্নে উৎসাহিত হয়ে রামানন্দ ব্রজের কিশোর কিশোরীর চরিত বর্ণন আরম্ভ করলেন।

রায় কহে, 'কৃষ্ণ হয় ধীরললিত।
নিরন্তর কামক্রীড়া যাঁহার চরিত॥'

রামানন্দ বললেন—কৃষ্ণ ধীরললিত। এর লক্ষণ করেছেন শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ—

বিদগ্ধো নবতারুণ্যঃ পরিহাস-বিশারদঃ।
নিশ্চিন্তো ধীরললিতঃ স্যাৎ প্রায়ঃ প্রেয়সীবশঃ॥

বিদগ্ধ অর্থাৎ রসিক, নবযৌবনযুক্ত, পরিহাস করাতে খুবই পটু, নিশ্চিন্ত অর্থাৎ যার কোনকিছুতে উদ্বেগ নেই এবং যিনি প্রেয়সীর সর্ব্বদা বশীভূত তাঁকে বলা হয় ধীরললিত। রাধারাণীর সঙ্গে কৃষ্ণ নিত্য বিলাসে রত!

রাত্রিদিন কুঞ্জে ক্রীড়া করে রাধাসঙ্গে।
কৈশোর বয়স সফল কৈল ক্রীড়ারঙ্গে॥

রাত্রিদিন কুঞ্জে রাধারাণীর সঙ্গে ক্রীড়া করে কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর কিশোর বয়সকে সফল করেছেন।

রাধাগোবিন্দের বিলাসের এই আস্বাদনেও শ্রীগৌরসুন্দরের পেট ভরে নি—অর্থাৎ আস্বাদন পরিপূর্ণ হয়নি। তাই বললেন—

প্রভু কহে, 'এহ হয় আগে কহ আর।'
রায় কহে, 'ইহা বই বুদ্ধি নাহি আর॥'

মহাপ্রভুর প্রশ্ন শুনে রামানন্দ আশ্চার্য্যান্বিত হয়ে ভাবছেন—এর ওপরে প্রশ্ন হতে পারে বলে তো আমার জানা ছিল না—এ তো বুদ্ধির অগোচর। তবে মহাপ্রভুরই কৃপাপ্রেরণায় বললেন—

'যে বা প্রেমবিলাস বিবর্ত্ত এক হয়।
তাহা শুনি তোমার সুখ হয় কিনা হয়॥'

এই প্রেমবিলাস তত্ত্বে দু'রকম ভাব আছে। সম্ভোগ এবং বিপ্রলম্ভ— অর্থাৎ মিলন এবং বিরহ। বিরহ ছাড়া মিলনের পুষ্টি হয় না। বিরহ বা বিচ্ছেদের নামই বিপ্রলম্ভ। সেইটিই প্রেমবিলাসের বিবর্ত্ত অর্থাৎ বিচ্ছেদকালে অধিরূঢ়ভাবে মিলনের অভাবেও মিলনের স্ফূর্ত্তি। রায় রামানন্দ নিজকৃত ঐ রসের একটি সঙ্গীত গান করতে না করতেই মহাপ্রভু ভাবে বিহ্বল হয়ে তাঁর মুখ আচ্ছাদন করলেন। গীতটি শ্রীমতী রাধারাণীর উক্তি—সুতরাং বিরহদশায় মিলনের স্ফূর্ত্তি।

এত বলি আপনকৃত গীত এক গাহিল।
প্রেমে প্রভু স্বহস্তে তার মুখ আচ্ছাদিল॥

রামানন্দ রায়ের স্বকৃত গান—

পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গে ভেল।
অনুদিন বাঁঢ়ল, অবধি না পেল॥
না সো রমণ, ন হাম রমণী।
দুঁহু-মন মনোভব, পেষল জানি॥
এ সখি! সে সব প্রেমকাহিনী।
কনুঠামে কহবি, বিছুরল জানি॥
না খোঁজলুঁ দূতী, না খোঁজলুঁ আন্।
দুঁহুকোরি মিলনে মধ্য ত পাঁচবাণ॥
অব সোহি বিরাগ, তুঁহু ভেলি দূতী।
সুপুরুখ প্রেম কি ঐছন রীতি॥

রাধাগোবিন্দের নিষ্কলুষ প্রেমে কোন হেতু নেই। কোন কারণে কিছুকে অপেক্ষা করে তাঁদের প্রেম নয়—এইজন্য এ প্রেম নির্হেতুক যাকে শ্রীগোবিন্দজী নিজেই প্রশংসা করে রাসস্থলীতে বললেন—নিরবদ্য প্রেম—অনিন্দিত প্রেম। অবশ্য প্রশ্ন হতে পারে প্রেমে আবার নিন্দা কি?

প্রেমে নিন্দা হয়। যেখানে কোন কারণে ভালবাসা হয়, কোনও কিছুকে অপেক্ষা করে ভালবাসা হয় সেখানে প্রেম কিছু ন্যূন হয়ে যায়ই। কিন্তু রাধাকৃষ্ণের প্রেমে এতটুকুও হেতু নেই। এমনকি স্ত্রী পুরুষ ভেদজ্ঞানও নেই। রমণীকে রমণ ভালবাসে আবার রমণকে রমণী ভালবাসে। কিন্তু কৃষ্ণ যে রমণ সে বোধ রাধারাণীর নেই আবার অন্যদিকে রাধারাণী যে রমণী সে বোধও কৃষ্ণের নেই। তাঁদের পরস্পরের মিলনে দূতীরও অপেক্ষা নেই। প্রেম শুধু প্রেমেরই জন্যে। এরই নাম নির্হেতুক প্রেম। এর মধ্যে কুল শীল, মান, মর্য্যাদা, রূপ গুণ কিছুরই অপেক্ষা নেই। নাম শুনে আত্মদান এ হল রাধাগোবিন্দের প্রেমের প্রথম স্তর। এর পরে যত অবস্থা—সুতরাং এ প্রেমের কথা কে বলবে আর কে শুনবে? এ হল সুজন প্রেমের রীতি।

শ্রীমন্মহাপ্রভু আজ আস্বাদনের চরম সীমায় পৌঁছেছেন। যেন লক্ষ্যস্থানে এসে গেছেন। স্বয়ং ভগবানের নিজের সিদ্ধান্ত কৃপা প্রেরণায় রামানন্দকে সেই জায়গায় পৌছে দিয়েছেন—কিন্তু নিজে যে রাধারাণীর ভাবকান্তি অঙ্গীকার করে এসেছেন অর্থাৎ ভক্তভাবের প্রবাল্য গৌরস্বরূপে সেটি এতটুকু ম্লান হয় নি। ভক্তভাব সম্পূর্ণ বজায় রেখে ভগবান বললেন রামানন্দকে—

প্রভু কহে, 'সাধ্যবস্তুর অবধি এই হয়।
তোমার প্রসাদে ইহা জানিলুঁ নিশ্চয়॥'

এইটিই সাধ্যের অবধি অর্থাৎ সাধ্যের সীমা। কিন্তু সাধ্যবস্তু তো সাধন ছাড়া মেলে না। কারণ সাধন দ্বারাই সাধ্যের প্রাপ্তি।

'সাধ্যবস্তু' 'সাধন' বিনু কেহ নাহি পায়।
কৃপা করি কহ রায় পাবার উপায়॥'

দশম ধারা

সাধ্যবস্তু পাবার উপায় সাধন

প্রভু কহে, 'সাধ্যবস্তুর অবধি এই হয়।
তোমার প্রসাদে ইহা জানিলু নিশ্চয়॥'
কিন্তু 'সাধ্যবস্তু সাধন বিনু কেহ নাহি পায়।
কৃপা করি কহ রায় পাবার উপায়॥'

শ্রীমন্মাহাপ্রভুর এই প্রশ্নে রায় রামানন্দ শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীচরণে নিজেকে সঁপে দিয়েছেন—তাঁর নিজের স্বাতন্ত্র্য কিছু নেই। প্রভুর ইচ্ছার কাছে তিনি সম্পূর্ণ বশ্যতা স্বীকার করেছেন। তাই বলছেন—

রায় কহে, 'যেই কহাও সেই কহি বাণী।
কি কহিয়ে ভাল মন্দ কিছুই না জানি॥
ত্রিভুবন মধ্যে ঐছে হয় কোন ধীর।
যে তোমার মায়া নাটে হইবেক স্থির॥'

রায়ের মুখে প্রভু নিজেই বক্তা আবার নিজেই শ্রোতা।

'মোর মুখে বক্তা তুমি, তুমি হও শ্রোতা।
অত্যন্ত রহস্য শুন, সাধনের কথা॥'

মধুর রস অর্থাৎ রাধাগোবিন্দের যে প্রেম—কান্তাপ্রেম যাকে সাধ্য শিরোমণি বলা আছে সেটি পাবার যে সাধন—সেই সাধন রহস্য বলছেন।

রাধাকৃষ্ণের লীলা এই অতি গূঢ়তর।
দাস্য বাৎসল্যাদিভাবে না হয় গোচর॥

মধুর প্রেম কান্তাপ্রেম প্রেমরাজ্যের চরম সীমা। এটি পাবার যে উপায় তাতে শাস্ত্র বলছেন—যাঁরা দাস্য, সখ্য বাৎসল্য প্রেমে ভগবানকে ভজনা করেন তাঁরা কিছুতেই পেতে পারেন না। কারণ দাস্য সখ্য বাৎসল্য প্রেমের যে সব বৃত্তি—দাস্যের অকপটে সেবা, সখ্যের নিঃসঙ্কোচ প্রীতি এবং বাৎসল্যের দরদ—এ সব মধুর রসে আছে, কিন্তু মধুর রসের যে নিজস্ব বৃত্তি প্রণয় রস তা কিন্তু দাস্য সখ্য বাৎসল্যে যায় না। তাই, দাস্য সখ্য বাৎসল্য প্রেম যদি মধুর রসের বৃত্তি না পায় তাহলে তারা অর্থাৎ দাস সখা বা পিতামাতা মধুর রসের লীলা আস্বাদন করবেন কি

করে—এটি তাই সম্ভব হচ্ছে না। একমাত্র অনুগত সখীগণ যাঁরা রাধাকৃষ্ণের মধুর রস আস্বাদন করবেন—কারণ তাঁরা গোবিন্দকে মধুর রসেই আস্বাদন করেন। তাই একমাত্র অনুগতা সখীগণের পক্ষেই এই লীলা আস্বাদনের অধিকার। তাই রামানন্দ সিদ্ধান্ত করলেন—শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায়—

সবে এক সখীগণের ইহাঁ অধিকার।
সখী হৈতে হয় এই লীলার বিস্তার॥
সখী বিনা এই লীলা পুষ্ট নাহি হয়।
সখী লীলা বিস্তারিয়া সখী আস্বাদয়॥
সখী বিনা এই লীলার অন্যের নাহি গতি।
সখীভাবে যে তাঁরে করে অনুগতি॥
রাধাকৃষ্ণ কুঞ্জ সেবা সাধ্য সেই পায়।
সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায়॥

এই সখীদের যে অধিকার—সেটি তাদের আনুগত্যের ফল। তারা কেমন অনুগত রামানন্দ বলছেন—তাদের নিজেদের কোন স্বাতন্ত্রবোধ নেই।

সখীর স্বভাব এক অকথ্য কথন।
কৃষ্ণসহ নিজ লীলায় নাহি সখীর মন॥

তারা সকলে রাধারাণীর এমনই অনুগতা যে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে নিজেদের মিলনের কথা ভাবে না এবং সে মিলনের জন্য নিজেদের কোন চেষ্টাও নেই; অর্থাৎ 'কামনা' বলে যে বস্তু—কাম শব্দের লক্ষণ হল স্বসুখবাসনা—নিজেকে সুখী করবার চেষ্টা সেটি তাদের বিন্দুমাত্র নেই। তাদের যা কিছু চেষ্টা সব হল রাধাগোবিন্দকে সুখী করার চেষ্টা। এর নামই প্রেম।

আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম।
আর কৃষ্ণপ্রীতি হেতু কার্য্য ধরে প্রেম নাম॥

সখীগণ তারা কামিনী নন—তারা প্রেমিকা। তাই ওদের প্রতিটি চেষ্টা শুধু রাধাকৃষ্ণ কি করে সুখী হবেন।

কৃষ্ণ সহ রাধিকার লীলা যে করায়।
নিজসুখ হৈতে তাতে কোটি সুখ পায়॥

রাধারাণীর সঙ্গে গোবিন্দের মিলন ঘটিয়ে, লীলা করিয়েই তাদের আনন্দ—এতে নিজের সুখের প্রতি দৃষ্টিই নেই। রাধিকার সঙ্গে সখীদের

শুধু প্রেম সম্পর্ক। এই সম্বন্ধে একটি উপমা দিয়ে রামানন্দ বলছেন—

'রাধার স্বরূপ কৃষ্ণপ্রেম কল্পলতা।
সখীগণ হয় তার পল্লব পুষ্প পাতা॥'

পল্লব, পুষ্প পাতা যেমন লতা ছাড়া নিজেকে ভিন্ন বোঝে না—তারা লতার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভূত হয়ে আছে এবং লতা সঞ্জীবিত প্রফুল্লিত হলে পল্লব পুষ্প পাতা সব আপনা থেকেই প্রফুল্লিত সঞ্জীবিত হয়—তেমনি রাধাগোবিন্দের মিলনে যে সুখ হয় তাতেই সখীগণ সুখী হন—তাঁদের আলাদা করে কোন সুখ ভোগের চেষ্টা থাকে না—প্রয়োজনবোধও নেই।

কৃষ্ণলীলামৃত যদি লতাকে সিঞ্চয়।
নিজসুখ হৈতে পল্লবাদ্যের কোটি সুখ হয়॥

সখীগণ নিজেরা কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হলে যে সুখ পান তার থেকে কোটি গুণ সুখ পান গোবিন্দের সঙ্গে রাধারাণীর মিলন করিয়ে। এরই নাম নির্হেতুক প্রেম, নিষ্কপট প্রেম—যাকে কৃষ্ণচন্দ্র নিজে বললেন—নিরবদ্য প্রেম। এখন প্রশ্ন হতে পারে সখীদের না হয় এইরকম মনোবৃত্তি কিন্তু তারা কি তাহলে শ্রীকৃষ্ণমিলন হতে বঞ্চিত হবেন? না, তা নয়—শ্রীমতী রাধারাণী অত্যন্ত যত্নে তাদের সঙ্গে মিলন ঘটান। তাই রামানন্দ বললেন—

'যদ্যপি সখীর কৃষ্ণসঙ্গমে নাহি মন।
তথাপি রাধিকা যত্নে করান সঙ্গম॥
নানাচ্ছলে কৃষ্ণে প্রেরি সঙ্গম করায়।
আত্মকৃষ্ণ সঙ্গ হৈতে কোটি সুখ পায়॥

সখীদের প্রতি রাধারাণীর এমনই প্রীতি যে রাধারাণী নিজেই যত্ন করে চেষ্টা করে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সখীদের মিলন করান। তার ফলে নিজের কৃষ্ণের সঙ্গে মিলনে যে আনন্দ তার থেকে কোটিগুণ সুখ পান। রাধারাণীর যে সখীদের প্রতি এই প্রীতি কৃষ্ণও অত্যন্ত সুখী হন। রামানন্দ বললেন—

'অন্যোন্যে বিশুদ্ধ প্রেমে করে রস পুষ্ট।
তা সবার প্রেম দেখি কৃষ্ণ হয় তুষ্ট॥
সহজ গোপীর প্রেম নহে প্রাকৃত কাম।
কামক্রীড়া সাম্যে তার কহি 'কাম' নাম॥

কারণ নিজেন্দ্রিয়সুখহেতু কামের তাৎপর্য্য।
কৃষ্ণসুখ তাৎপর্য্য গোপীভাববর্য্য ॥'

গোপরামাদের কৃষ্ণভালবাসা যদি কামনা হত তাহলে শ্রীরাসলীলার শেষে শ্রীশুকদেব এ ফলশ্রুতি দিতেন না—যে কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে ব্রজগোপীদের যে বিক্রীড়া—অর্থাৎ মধুর রসের ক্রীয়া—রাসবিহার যারা শ্রদ্ধা করে নিজ নিজ শ্রীগুরুপাদপদ্মের আনুগত্যে শ্রবণ কীর্ত্তন করে আস্বাদন করবে তাদের ভগবানে পরাভক্তি অর্থাৎ বিশুদ্ধা ভক্তি, নিষ্কামা ভক্তি লাভ হবে, যার ফলে তাদের হৃদ্রোগ অর্থাৎ কামনা রোগ তখুনি চিরতরে চলে যাবে। প্রেমের দ্বারাই কামনা নির্মূল হয়। কামনার দ্বারা কামনার বিনাশ হতে পারে না। কারণ জল দিয়ে পাঁক ধোওয়া যায়—পাঁক দিয়ে তো পাঁক ধোওয়া যায় না। আলো দিয়েই অন্ধকার দূর করা যায়, অন্ধকার দিয়ে তো অন্ধকার দূর করা যায় না। তাহলে গোপরামাদের গোবিন্দ ভালবাসার কথা শুনলে বা জিহ্বায় উচ্চারণ করলে জীবের প্রকৃত কামনা দূর হয়ে যায়। তাহলে গোপরামাদের গোবিন্দ ভালবাসা প্রাকৃত কামনা নয়—সমজাতি নয়। ভিন্নজাতি। প্রেমের দ্বারাই কামনার বিনাশ হয়— কামনার দ্বারা কামনার বিনাশ সম্ভব নয়। প্রেম আলো, আর কামনা হল অন্ধকার। কিন্তু গোপরামাদের গোবিন্দ ভালবাসা দেখলে বা সে কথা শুনলে প্রাকৃত জগতের নায়ক নায়িকা, কান্ত কান্তার আচরণের মতই মনে হয়। তাই বললেন—কামক্রীড়া সাম্যে তার কহি 'কাম' নাম। কোন গোপরামারই নিজের সুখের দিকে দৃষ্টি নেই—শুধু কৃষ্ণকে সুখ দেবার জন্য তাদের যা কিছু চেষ্টা।

নিজেন্দ্রিয়সুখবাঞ্ছা নাহি গোপিকার
কৃষ্ণে সুখ দিতে করে সঙ্গম বিহার॥

তাদের যা কিছু চেষ্টা সব কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্য্য। একটি দৃষ্টান্ত দিলে—কথাটি আরো পরিষ্কার হবে। শ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়ের গোপীগীতের শেষ মন্ত্র—

যত্তেসুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষু
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু।
তেনাটবীমটসি তদ্বৎথতে ন কিংস্বিৎ
কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ॥ ভাঃ ১০।৩১।১৯

কৃষ্ণহারা গোপরামাগণ যখন শ্রীযমুনাপুলিনে রাসস্থলীতে সমবেত হয়ে কৃষ্ণগুণকীর্তন করেছেন, যার নাম গোপীগীত—কৃষ্ণাকর্ষকগীতি—এটি তাঁর শেষ মন্ত্র। কৃষ্ণভাবনাময়ী মহাভাবস্বরূপিণী রাধা আদি ব্রজরামা ভাবনার তন্ময়তায়, ধ্যানের গভীরতায় যেন কৃষ্ণকে সামনে দর্শন করছেন, এই অনুভবে কথা বলছেন—কৃষ্ণ, তুমি সারাদিন গোচারণ লীলায় থাকার পর যখন গোধূলি লগ্নে শ্রীধাম বৃন্দাবনে ফিরে আস, যখন আমরা তোমার বহুক্ষণ বিরহের পর কাছে পাই তখন তোমার চরণ যুগল অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে ধীরে ধীরে আমাদের বক্ষে ধারণ করি। কৃষ্ণ যদি বলেন এতই যদি ভয়, এতই যদি শঙ্কা, তাহলে আমার চরণ তোমরা বক্ষে ধারণ না করলেই পার। ধারণ কর কেন? তোমাদের বক্ষে আমার চরণ রাখ তো নিজেরা সুখী হবে বলে। গোপরামারা বলছেন—না কৃষ্ণ, আমারা সুখী হব বলে তোমার চরণ ধারণ করি—তা নয় তোমাকে সুখী করব বলে ধারণ করি। কারণ আমরা তো কামিনী নই—আমরা প্রেমিকা। নিজেদের সুখের দিকে আমাদের দৃষ্টি নেই—তোমাকে সুখী করাই আমাদের কাজ। কৃষ্ণ বলেন—আমার চরণ তোমরা বক্ষে ধারণ করলে এতে আমার কি সুখ? এতে তো তোমাদেরই সুখ। গোপরামারা বলেন—না কৃষ্ণ, এতে আমাদের সুখ নয়—তোমারই সুখ—কথাটা ভাল করে বুঝিয়ে দিই। তুমি তো সারাদিন গোচারণে থাক। বনের পথ তো ফুলে ফুলে ছাওয়া নয়—তাতে কাঁটা আছে কাঁকর আছে, আর গবাদি পশু তো পথ বেছে চলে না—তারা কাঁটাবন পেরিয়ে কাঁকর বিছানো পথে চলে—তোমার চরণযুগলও তাদের পিছু পিছু ছোটে। ধেনুর দল তো চরণে পাদুকা ব্যবহার করে না, তাই তুমিও গোচারণ করবার সময় পাদুকা ব্যবহার কর না—তোমার চরণযুগল কত কোমল—কমল হতেও কোমল অতি সুকোমল অন্যে কেউ না জানুক আমরা তো জানি তাই তোমার সেই চরণে কাঁটা কাঁকরের আঘাত লাগে—ক্ষত হয়। গোচারণে আনন্দে তখন অবশ্য তোমার ব্যথার অনুভব হয় না। কিন্তু যখন গোচারণ শেষে ঘরে ফিরে আস তখন তো ব্যথার অনুভব হয়—তাই তোমার ঐ ব্যথার জায়গায় একটু আরাম দেবার জন্য তোমার চরণযুগল আমাদের বক্ষে রাখি। কিন্তু আমাদের বক্ষঃস্থান তো বড় কঠোর, তাই শঙ্কা হয় যদি তোমার কমল হতে কোমল

চরণে ব্যথা লাগে তাঁদের কথা শুনে কৃষ্ণ তো অবাক হয়ে গেছেন। গোপরামাদের বক্ষে চরণ রাখলে চরণের ব্যথার জায়গায় আরাম হবে কি কর? রাধারাণী এবং গোপিকারা বলছেন—'শোন কৃষ্ণ, আমাদের বক্ষঃস্থানে তাপ আছে—বক্ষঃস্থানে দুরকমের তাপ। একটি দেহজ আরেকটি বিরহজ। কারণ শরীরের অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যে তাপ তার থেকে বক্ষঃস্থানে তাপের মাত্রা কিছু বেশী—এটি হল দেহজ তাপ। আর তুমি যে সারাদিন গোচারণ রঙ্গে থাক দিনের বেলায়—তখন তো আমরা তোমার সঙ্গে থাকতে পারি না। আমরা শূণ্যদেহে ঘরে থাকি—মন কিন্তু তোমার সঙ্গে যায়। সারাটি দিন তোমার বিরহ ভোগ করি। তোমার অদর্শনে ক্রটিকাল অর্থাৎ চোখের পলক ফেলতে যেটুকু সময় লাগে ঐ সময়টুকুকে আমাদের বিরহদশায় যুগসম মনে হয়। এই বিরহ-জনিত তাপ আমরা ভোগ করি। এই বিরহজ তাপ তো বক্ষেই থাকে। তাই দেহজ তাপ ও বিরহজ তাপ দুটি মিলে তাপের মাত্রা বেশী হয়—আমাদের বক্ষঃস্থানটি গরম হয়ে থাকে, সেইখানটিতে তোমার চরণযুগল আমরা ভয়ে ভয়ে ধীরে ধীরে ধারণ করি—তোমার চরণে ব্যাথার স্থানে গরম সেঁক দেব বলে। কারণ ব্যথার জায়গায় গরম সেঁক দিলে ব্যথার আরাম হয়। তাই কৃষ্ণ, তোমার সুখের জন্যই তোমার চরণ বক্ষে ধারণ করি—আমরা নিজেরা সুখী হব বলে নয়। এর নাম কৃষ্ণসুখৈক তাৎপর্য্য—এর নাম কৃষ্ণপ্রেম, গোপীপ্রেম ব্রজপ্রেম। এর নাম নিষ্কামা ভক্তি, নিরবদ্য প্রেম, নিষ্কলুষ প্রেম—তাই সহজে গোপীর প্রেম কামগন্ধহীন। তখন শ্রীগোবিন্দ কথাটি বুঝলেন।

ব্রজবাসীর যে প্রেম তার নাম রাগাত্মিকা। এই প্রেম ব্রজবাসী এবং ব্রজভূমি ছেড়ে অন্য কোথাও পাওয়া যাবে না। রাগাত্মিকা ভক্তিকে তাই জননী বলা আছে। যিনি সন্তান প্রসব করেন তাঁকেই জননী বলা হয়। জননী তো দুজন হবে না। তবে জননীর মত করে আত্মীয়া বা ধাত্রীমাতা শিশুকে ভালবাসতে পারেন, তার পরিচর্য্যা করতে পারেন। তাকে ধাই মা বা অন্য আত্মীয়া বলা যাবে কিন্তু জননী বলা যাবে না—কিন্তু পরিচর্য্যা বা ভালবাসা দেখলে মনে হবে ইনিই বুঝি জননী। তেমনি ব্রজবাসীর ব্রজরামার মত করে কৃষ্ণ ভালবাসা যায়—কিন্তু যিনিই তাঁদের মত করে গোবিন্দ ভালবাসুন—তিনি তো ব্রজগোপী হতে পারবেন না। ব্রজগোপী

ব্রজগোপীই। যেমন জননী জননীই—অন্য কেউ জননী হতে পারবেন না। কিন্তু জননীর মত করে ভালবাসতে পারবেন। তেমনি ব্রজগোপীর মত করে কৃষ্ণ ভালবাসা যায় কিন্তু যিনিই তাঁদের মত করে কৃষ্ণ ভালবাসুন—তাঁকে ব্রজগোপী বলা যাবে না। তবে যদি গোপীভাবে কোন ভাগ্যবানের লোভ হয় এবং সেইভাবে কৃষ্ণ ভালবাসেন তার ভক্তিকে বলা হবে রাগানুগা ভক্তি—এটি রাগাত্মিকা ভক্তিকে অনুসরণ করে ভক্তি। যে রাগানুগা ভক্তিতে শ্রুতিগণ কৃষ্ণ পেয়েছিলেন। তাই রামানন্দ বললেন—

'সেই গোপীভাবামৃতে যাঁর লোভ হয়।
বেদধর্মলোক ত্যজি সে কৃষ্ণে ভজয়॥
রাগানুগমার্গে তাঁরে ভজে যেই জন।
সেইজন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
ব্রজলোকের কোন ভাব লঞা যেই ভজে।
ভাবযোগ্য দেহ পাঞা কৃষ্ণ পায় ব্রজে॥
তাহাতে দৃষ্টান্ত উপনিষদ্ শ্রুতিগণ।
রাগমার্গে ভজি পাইল ব্রজেন্দ্রনন্দন॥'

গোপী আনুগত্যে শ্রুতিগণের মধুর রসে কৃষ্ণ আস্বাদন—শ্রুতিরা স্তুতি প্রসঙ্গে বলেছেন—

নিভৃতমরুন্মনোঽক্ষদৃঢ়যোগযুজো হৃদি যন্মু-
নয় উপাসতে তদরয়োঽপি যযুঃ স্মরণাৎ।
স্ত্রিয় উরগেন্দ্রভোগভুজদণ্ডবিসক্তধিয়ো
বয়মপি তে সমাঃ সমদৃশোঽঙ্ঘ্রিসরোজসুধাঃ॥
ভাঃ ১০।৮৭।২৩

মুনিরা প্রাণায়াম দ্বারা অর্থাৎ নিঃশ্বাস জয় করে মন এবং ইন্দ্রিয়কে দৃঢ়ভাবে যুক্ত করে যে ব্রহ্মের উপাসনা করেন—তার অনুভব করেন, ভগবানের শত্রুগণ অর্থাৎ যাঁরা ভগবানকে শত্রুভাবে উপাসনা করেন তাঁরা কেবলমাত্র স্মরণ অর্থাৎ ধ্যানের দ্বারাই তাঁকে পেয়ে থাকেন। শ্রুতিগণ বলছেন—ব্রজরামাগণ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সৌন্দর্য্যে অত্যন্ত আসক্ত হয়ে তাঁর পাদপদ্মসুধা লাভ করেছিলেন। আর আমরা গোপরামাদের সম এবং সমদৃশ হয়ে ভগবানের পাদপদ্ম মাধুর্য্য আস্বাদন করেছি। এখানে

শ্রুতিদের বাক্যে দুটি কথা আছে—সমা এবং সমদৃশঃ—সমা পদে বুঝাচ্ছে শ্রুতির গোপীদেহ প্রাপ্তি আর সমদৃশঃ পদে বুঝাচ্ছে গোপরামাদের আনুগত্য।

'সমদৃশঃ' শব্দে কহে সেইভাবে অনুগতি।
'সমাঃ' শব্দে কহে শ্রুতির গোপীদেহ প্রাপ্তি॥
'অঙ্ঘ্রিপদ্মসুধায়' কহে কৃষ্ণসঙ্গানন্দ।
বিধিমার্গে না পাইয়ে ব্রজে কৃষ্ণচন্দ্র॥

রাগাত্মিকা ভক্তির এইটিই মহিমা যে বিধিমার্গে ভজলে ব্রজেন্দ্রনন্দনকে পাবার কোন উপায় নেই। শ্রীশুকদেব বলছেন—

নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ।
জ্ঞানিনাঞ্চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ॥ ভাঃ ১০।৯।২১

ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র যশোদামায়ের পুত্র যারা দেহাভিমানী—অর্থাৎ দেহী (আত্মা) থেকে যে দেহ আলাদা এই বিবেক যাদের নেই তাদের পক্ষে সুখলভ্য নন—অর্থাৎ তারা পাবে না—আবার যাদের দেহ দেহী বিবেক আছে অর্থাৎ জ্ঞানী—তারাও পাবে না। তবে পাবে কারা? যারা রাগমার্গে ব্রজরামার আনুগত্যে ভজনা করতে পেরেছেন তাঁদের কাছেই যশোদানন্দন সুখলভ্য হন। অর্থাৎ তাঁরাই তাঁকে সহজে পান।

তাই ব্রজরস আস্বাদনের জন্য ব্রজগোপীর আনুগত্যে রাগানুগাভজন প্রণালীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং এইটিই একমাত্র উপায়।

অতএব গোপীভাব করি অঙ্গীকার।
রাত্রিদিন চিন্তে রাধাকৃষ্ণের বিহার॥
সিদ্ধদেহে চিন্তি করে তাহাঁঞি সেবন।
সখীভাবে পায় রাধাকৃষ্ণের চরণ॥

একমাত্র গোপী আনুগত্য ছাড়া ব্রজেন্দ্রনন্দন প্রাপ্তি কিছুতেই সম্ভব হবে না।

গোপী আনুগত্য বিনা ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে।
ভজিলেও নাহি পায় ব্রজেন্দ্রনন্দনে॥
তাহাতে দৃষ্টান্ত লক্ষ্মী করিল ভজন।
তথাপি না পাইল ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥

গোপী আনুগত্য করতে পারেন নি বলেই বৈকুণ্ঠের অধিশ্বরী মহালক্ষ্মীও রাসবিলাসে কৃষ্ণপাদপদ্ম পেতে পারেন নি। এ বিষয়ে শ্রীউদ্ধবজীর স্তুতিবাক্য প্রমাণ—

নায়ং শ্রিয়োহঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ-
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্‌ব্রজসুন্দরীণাম্॥ ভাঃ ১০।৪৭।৬০

শ্রীউদ্ধবজীকে যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কৃপা করে ব্রজবাসীকে কৃষ্ণবিরহে সান্ত্বনা দেবার জন্য পাঠালেন—তখন গোপীপ্রেমের মহিমা মনে প্রাণে অনুভব করে ব্রজগোপীর প্রশংসা করে উদ্ধবজী বলছেন—ব্রজপ্রেম গোপীপ্রেম হল প্রেমরাজ্যের চরম সীমা। এর ওপরে প্রেম আর হয় না। মন্ত্রের প্রথমেই একটি নঞ পদ বসালেন—এ প্রেম অন্য কোথাও যে হয় নি—সেইটিই দৃঢ় করে এই 'নঞ' পদে বুঝান হয়েছে। যদি প্রশ্ন হয় এ প্রেম কি অন্য কোথাও হওয়ার সম্ভাবনা আছে? হ্যাঁ—বৈকুণ্ঠের অধীশ্বরী মহালক্ষ্মী পেতে পারেন—কিন্তু তিনিও পান নি। লক্ষ্মীঠাকুরাণীর তো নারায়ণের চরণকমলে নিতান্তরতি—তাঁর তো অন্য কোন অভিলাষ নেই—কিন্তু তিনিও গোপীপ্রেম আস্বাদন করতে পারেন নি—তার একমাত্র কারণ হল যে তিনি তো ঈশ্বরী—তাই সে অভিমান ত্যাগ করে ব্রজের গয়লানীদের আনুগত্য করতে পারেন নি—কারণ আনুগত্য করতে হলে তো অভিমান ত্যাগ করতে হবে। লক্ষ্মীঠাকুরাণীর পক্ষে সে অভিমান ত্যাগ করা সম্ভব হয় নি। তাই পান নি। তিনিই যখন পান নি—তখন স্বর্গের দেববধূগণ তাদের পক্ষে তো সম্ভব নয়ই। কারণ তাঁদের অঙ্গে পদ্মের গন্ধ থাকতে পারে কিন্তু তারাও ব্রজরসের আস্বাদন করতে পারেন নি—ব্রজেন্দ্রনন্দনকে পাওয়া সম্ভব হয় নি—কারণ তাঁরাও দেববধূর অভিমান ত্যাগ করে ব্রজগোপীর আনুগত্য করতে পারেন নি। এইখানে গোপীপ্রেমের মহিমা। গোপরামাদের প্রেমের এত মহিমা কেন? উদ্ধবজীর মত ব্যক্তি অনুভব করে বলছেন—ভক্ত ভগবানের কণ্ঠ প্রেমে আলিঙ্গন করে এটি খুব বড় কথা নয়—এটি তো স্বাভাবিক—কিন্তু গোপীপ্রেমের বৈশিষ্ট্য কোথায়—কৃষ্ণ পড়েছেন গোপীপ্রেমের খরস্রোতে—নিজেকে যেন সামলাতে পারছেন না—তাই কৃষ্ণ নিজেকে বাঁচাবার জন্য

গোপীকণ্ঠ আলিঙ্গন করেছেন—এইখানেই গোপীপ্রেমের মহিমা। যেমন খরস্রোতে কেউ যদি পড়ে যায় তাহলে নিজেকে বাঁচাবার জন্য যেমন একটা তৃণকুটোকেও আঁকড়ে ধরে এখানেও তেমনি। শ্রীরাসস্থলীতে গোপরামারা প্রত্যেকে যে যেমন ভাবে কৃষ্ণকে আস্বাদন করতে চেয়েছে সেইভাবেই আস্বাদন করতে পেয়েছে। তাই তাদের বলা হচ্ছে লব্ধাশিষঃ।

তাহলে দেখা গেল ব্রজেন্দ্র নন্দনকে ব্রজের মধুর রসে আস্বাদন করতে বৈকুণ্ঠের অধীশ্বরী মহালক্ষ্মী পারেন নি—স্বর্গের দেববধূগণ পারেন নি—কারণ তাদের পক্ষে গোপী আনুগত্য করা কিছুতেই সম্ভব হয় নি। তাহলে আর কে পারবে? জীব তো পারবেই না। তাই এখানে সিদ্ধান্ত হল ব্রজেন্দ্রনন্দনকে পেতে হলে গোপী আনুগত্য চাই। এই গোপীপ্রেম প্রেমরাজ্যের চরম সীমায় দাঁড়িয়ে আছে—যা অনুভব করে উদ্ধবজীর মত ব্যক্তি তাঁদের চরণে বারে বারে প্রণাম করেছেন এবং তাঁদের চরণরজঃ পাবার অভিলাষে ব্রজে তৃণগুল্ম জন্ম পর্য্যন্ত প্রার্থনা করেছেন—এই প্রেমের কাছে অনাদিরাদি শ্রীগোবিন্দ হার স্বীকার করেছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর মনের অভিপ্রায় বুঝে রামানন্দ রায় সাধ্যসাধন নির্ণয় করলেন। সাধ্য ব্রজপ্রেম গোপীপ্রেম রাধাপ্রেম এবং তার জন্য সাধন হল ব্রজরামাদের শ্রীচরণে একান্তভাবে অনুগত হওয়া। গোপী আনুগত্য ছাড়া গোপীপ্রেমের আস্বাদন কখনও সম্ভব নয়।

এই সাধ্যসাধনতত্ত্ব রামানন্দ রায়ের শ্রীমুখে শুনে শ্রীমন্মহাপ্রভু অত্যন্ত পরিতৃপ্ত হয়েছেন—আনন্দে বিহ্বল হয়েছেন। নিজেরই সিদ্ধান্ত যেন নূতন করে আস্বাদন করলেন।

এত শুনি প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন।
দুইজনে গলাগলি করেন ক্রন্দন॥

মহাপ্রভু এবং রায়ের প্রেমের ক্রন্দন উথলে উঠল—

এইমত প্রেমাবেশে রাত্রি গোঙাইলা।
প্রাতঃকালে নিজ নিজ কার্য্যে দুঁহে গেলা॥

কিন্তু প্রভুর বিরহ রায়ের কাছে অসহ্য—

তাই বিদায় সময়ে প্রভুর চরণে ধরিয়া।
রামানন্দ রায় কহে বিনতি করিয়া॥

রামানন্দ প্রভুর চরণে ধরে প্রার্থনা করছেন—

'মোরে কৃপা করিতে তোমার ইহাঁ আগমন।
দিন দশ রহি শোধ মোর দুষ্ট মন॥
তোমা বিনা অন্য নাহি জীব উদ্ধারিতে।
তোমা বিনা অন্য নাহি কৃষ্ণপ্রেম দিতে॥'

রামানন্দ প্রার্থনা করছেন—প্রভু, তুমি যে এখানে এসেছ তার মূল উদ্দেশ্য হল আমাকে কৃপা করা। তাই অন্তত দিন দশ এখানে থেকে আমার দুষ্ট মনকে শোধন কর। কারণ তুমি ছাড়া জীব উদ্ধার আর কেউ করতে পারবে না। তুমি ছাড়া কৃষ্ণপ্রেম আর কেউ দিতে পারবে না।

ভক্তাধীন ভগবান—শাস্ত্র বলেছেন—ভক্তিবশঃ পুরুষঃ। ভগবান ভক্তের কাছে যে ভাবে বশ্যতা স্বীকার করেন এরকম আর কোথাও করেন না। ভগবান বৈকুণ্ঠনাথ ঋষি দুর্ব্বাসার কাছে তাই অকপটে স্বীকার করেছেন—'অহং ভক্তপরাধীনঃ।' তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু রামানন্দের কাতর প্রার্থনার উত্তরে বললেন—

প্রভু কহে, 'আইলাঙ শুনি তোমার গুণ।
কৃষ্ণকথা শুনি, শুদ্ধ করাইতে মন॥
যৈছে শুনিলুঁ তৈছে দেখিলুঁ তোমার মহিমা
রাধাকৃষ্ণ প্রেমরস জ্ঞানের তুমি সীমা॥
দশদিনের কা কথা যাবৎ আমি জীব
তাবৎ তোমার সঙ্গ ছাড়িতে নারিব॥'

প্রভু বললেন—রামানন্দ তোমার গুণ শুনে তোমার কাছে এসেছিলাম। তোমার মুখে কৃষ্ণকথা শুনে তোমার মহিমা নিজের চোখে দেখলাম। এ শোনা কথা নয়—চোখে দেখা—শোনার চেয়ে দেখার দাম বেশী। রাধাকৃষ্ণ প্রেমরস জ্ঞান তোমাতে সীমা লাভ করেছে—অর্থাৎ এর ওপরে জ্ঞান আর হয় না। তাই মাত্র দশদিনের কথা কি বলছ রামানন্দ—যতদিন আমি এ ধরাধামে থাকব ততদিন তোমার সঙ্গসুখ ছাড়তে পারব না।

নীলাচলে তুমি আমি থাকিব এক সঙ্গে।
সুখে গোঙাইব কাল কৃষ্ণকথা রঙ্গে॥

নীলাচলে শ্রীজগন্নাথ ক্ষেত্রে তুমি আর আমি একসঙ্গে থাকব এবং কৃষ্ণ কথারস আস্বাদনে ভরপুর হয়ে থাকব।

এত বলি দুঁহে নিজ নিজ কার্য্যে গেলা।
সন্ধ্যাকালে রায় পুনঃ আসিয়া মিলিলা॥

এই কথা হওয়ার পর মহাপ্রভু এবং রামানন্দ নিজ নিজ কাজে গেলেন সন্ধ্যাকালে রামানন্দ আবার মহাপ্রভুর আকর্ষণে তাঁর কাছে এসে উপস্থিত হলেন। তখন দুজনে একত্রে নির্জনে বসে ইষ্টগোষ্ঠী করতে লাগলেন।

অন্যোন্যে মিলি দুঁহে নিভৃতে বসিয়া।
প্রশ্নোত্তর গোষ্ঠী কহে আনন্দিত হঞা॥

এখন প্রভু রামানন্দ সংলাপ—প্রভুর প্রশ্ন—রায়ের উত্তর।

প্রভু পুছে, রামানন্দ করেন উত্তর।
এইমত সেই রাত্রে কথা পরস্পর॥

সেই রাত্রে মহাপ্রভু লোভাতুর হয়ে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করছেন আর তাঁর কৃপা প্রেরণায় রামানন্দও প্রভুর মন বুঝে উত্তর দিয়েছেন।

একাদশ ধারা

মহাপ্রভু ও রামানন্দের প্রশ্নোত্তরের দ্বিতীয় পর্য্যায়

রায় রামানন্দ সন্নিধানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রথম পর্য্যায়ের প্রশ্নোত্তর সম্পূর্ণ হয়েছেন। এবারে দ্বিতীয় পর্য্যায়ের প্রশ্নোত্তর—তার সূচনা।

প্রভু পুছে, রামানন্দ করেন উত্তর।
এই মত সেই রাত্রে কথা পরস্পর॥

শ্রীগৌরসুন্দরের প্রশ্নের মধ্যে কয়েকটি বিষয়বস্তু—বিদ্যা, কীর্ত্তি, সম্পত্তি, দুঃখ, মুক্ত, গান, শ্রেয়ঃ, স্মরণ, ধ্যান, বাসভূমি, শ্রবণ, উপাস্য—এই দ্বাদশটি হল প্রশ্নের বিষয়—এর পরে অন্য কথা প্রসঙ্গ।

(১)

প্রভু কহে—'কোন্ বিদ্যা বিদ্যা মধ্যে সার?'
রায় কহে—'কৃষ্ণভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর॥'

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদ রায় রামানন্দ মিলন প্রসঙ্গে প্রথমেই বলেছেন রামানন্দ হলেন মেঘ এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর সাগর এবং সূর্য্য দুইই—সূর্য্যই তার কিরণ দিয়ে সাগরের জলকে আকর্ষণ করে আকাশে মেঘের সঞ্চার করায় এবং তার থেকে বর্ষণ হয়।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিজস্ব আস্বাদনের বস্তু সাধারণের উপভোগ্য হতে পারে না। তাই ভক্তদ্বারে সেই সিদ্ধান্তনিচয় জীবজগৎকে দান করলে মানুষ তা পেয়ে ধন্য হবে। রামানন্দ মহাপ্রভুর আশয় বুঝতে পেরে উচ্চারণ করলেন—

মনো যদি ন নির্জিতং কিমমুনা তপস্যাদিনা।
কথং স মনসো জয়ো যদি ন চিন্ত্যতে মাধবঃ॥
কিমস্য চ বিচিন্তনং যদি না হন্ত চেতোদ্রবঃ
স বা কথমহো ভবেদ্ যদি ন বাসনাক্ষালনম্॥

চিত্তই যদি বশীভূত না হয়, বিষয় থেকে নিঃস্পৃহ না হয়, তাহলে তপস্যা করবারই বা কি প্রয়োজন? আর চিত্ত যদি হরি স্মরণে রত না হয়, তাহলে চিত্ত স্থিরই বা কিভাবে হবে? আর চিত্ত যদি প্রেমে দ্রবীভূত না হয় তাহলে ভগবচ্চিন্তা করেই বা কি লাভ? আর সকলের মূলে

হল বাসনার ক্ষয়। অনাদি কালের দূর্ব্বাসনা ক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত চিত্ত দ্রবীভূত হওয়ার কোন উপায় নেই।

শ্রীগৌরসুন্দর রামানন্দের এই কথা শুনে তত তৃপ্ত হতে পারলেন না। মেঘকে ভাল করে বর্ষণ করাবার জন্যই মহাপ্রভুর এই প্রচেষ্টা। তাই ভাবটি এইরকম—যেন কৃপাবর্ষণে এত কৃপণতা করছ কেন? ভাল করে বর্ষণ কর রামানন্দ। মহাপ্রভু বললেন—বাহ্যমেতৎ, এতো বাইরের খবর, আসল কথা বল—কা বিদ্যা—অন্তরের কথা বল।

রামানন্দ মহাপ্রভুর প্রশ্ন শুনে বিস্মিত হলেন—বিদ্যা কাকে বলে? এই সামান্য প্রশ্নের উত্তর তো একটি বালকেও দিতে পারে। তবে এ প্রশ্ন আমাকে কেন? কিংবা এর মধ্যে নিশ্চয়ই কোন চাতুরী আছে। তাই অল্পক্ষণ চিন্তা করে উত্তর দিলেন—'কৃষ্ণভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর।'

'হরিভক্তিরেব ন পুনর্বেদাদিনিষ্ণাততা।'

'বিদ্যা' শব্দের অর্থ হল ভগবৎপ্রাপ্তি। ভগবানকে পেতে হলে জ্ঞান যোগ বা কর্ম কিছু দিয়েই তাঁকে পাওয়া যায় না। ভগবান তাতে বশীভূত হন না। ভগবান একমাত্র প্রেমেতে বশীভূত হন। ভগবানকে যা দিয়ে জানা যায় তার নামই হরিভক্তি। মানুষের জীবনে দুটি জিনিস আছে—একটি হল জানা আরেকটি হল পাওয়া। ভগবানই হলেন একমাত্র এই জানা এবং পাওয়ার চরম সীমা। শ্রুতি বলেছেন—'যস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং স্যাৎ।' স্মৃতিপ্রস্থান শ্রীমদ্ভাগবদগীতা বললেন—যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ। যাঁকে পেলে আর পাওয়ার কিছু বাকী থাকে না—এবং যাঁকে জানলে জানার কিছু বাকী থাকে না তিনি হলেন ভগবান। অতএব শ্রুতি স্মৃতি প্রমাণ থেকে জানা গেল ভগবানের ওপরে জানা এবং পাওয়ার আর কিছু নেই। শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রে শ্রীএকাদশ স্কন্ধে শ্রীগোবিন্দজী উদ্ধবজীর কাছে বললেন—'ভক্ত্যাহমেকয়াগ্রাহ্যঃ।' আবার গীতায় ভগবান অর্জ্জুনদেবকে বললেন—'ভক্ত্যা মামভিজানাতি।' এই জানা এবং পাওয়া মানে হাতে হাতে ভগবানকে পাইয়ে দিতে পারেন ভক্তি মহারাণী। ভক্তিমহারাণী নারী জাতি—তাই তাঁর কাছে নগদ নগদ পাওয়া। জ্ঞান যোগ তারা পুরুষজাতি—তাই তাদের কাছে ধারে কারবার চলে। কিন্তু ভক্তি মহারাণী ধার বোঝেন না। যেমন যেমন ভক্তিঅঙ্গ যাজন তেমনি তেমনি তার দেনা শোধ করে দেন। অর্থাৎ সাধক ভক্ত

যেমন যেমন ভক্তি অঙ্গ যাজন করবে তেমনি তেমনি ফল পাবে। কিছুদিন পরে পাবে তা নয়। এখন কথা হতে পারে যখন সাধন করছে ভক্ত তখন তো সিদ্ধি লাভ হয় নি—সিদ্ধিকালে তো ফললাভ। সাধনকালে কি ফল পাবে? ভক্তি মহারাণীর এইটিই বৈশিষ্ট্য সাধনকালেও ফল দেন। এটি ইষ্টসাক্ষাৎকাররূপ ফল নয়—কিন্তু কিছু আনন্দ পাবে। এই আনন্দই ফল—আনন্দই প্রাপ্তি। ভক্ত যখন শ্রবণ কীর্ত্তন করে তখনই আনন্দ পায়—এই আনন্দ পেতে গেলে তো কোন সময়ের অপেক্ষা নেই। যখন গৌর বলা হবে তখনই আনন্দ, যখন গোবিন্দ বলা হবে তখনই আনন্দ। এইটিই ভক্তি মহারাণীর নগর নগদ দান। ভগবানকে জানা মানে কি? ভগবৎ স্বরূপ তো বটেই তার সঙ্গে তাঁর ধাম, লীলা পরিকর সব জানাই হল জানা। ভগবানকে জানা ছাড়া অন্য জানার কোন মূল্য নেই। কারণ অন্য জ্ঞান যতই লাভ করা হোক তার দ্বারা মায়া জয় হবে না। হরি না জানলে তাকে মায়া ছাড়বে না। 'হরিং বিনা নৈব মৃতিং তরন্তি।' হরি না জানিয়ে লাখ জানে যদি সে জানা কেবল ছাই।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই জানার মূলে কি শাস্ত্রজ্ঞান প্রয়োজন? এ প্রশ্ন সহজেই হতে পারে। তার উত্তরে বলা যায় ভগবানকে জানবার জন্য কোন আক্ষরিক জ্ঞানের প্রয়োজন নেই। তার দৃষ্টান্ত হল রাজ্য কামনায় ধ্রুব তপস্যা করেছেন। তখন তার শাস্ত্রজ্ঞান কিছু ছিল না। কিন্তু সেই অবস্থাতেই দেবর্ষিপাদ নারদের কৃপা হয়েছে। তাই সাধকের হৃদয়ের উৎকণ্ঠার আতিশয্য দেখে ভক্তি মহারাণী গৌরগোবিন্দকে তার হৃদয়ে এনে দেন। তখন সাধক যে চিন্ময় বিগ্রহ দর্শন করে সে দর্শন সাধারণের বিগ্রহ দর্শন অপেক্ষা ভিন্ন। বিগ্রহ তখন তার কাছে সাক্ষাৎ রূপ প্রকাশ করে অত্যুজ্জ্বল হয়ে ওঠেন এবং এই বিগ্রহ যত উজ্জ্বল হন সাধকের ধ্যান তত গভীর হয় এবং ধ্যান যত গভীর হয় তার আনন্দ তত বাড়তে থাকে। সাধক তখন অমৃতসাগরে স্নান করতে থাকেন। এইভাবেই ধ্রুবের ধ্যান গভীর হওয়ার ধ্যেয়বস্তু রূপ পরিগ্রহ করে তার সামনে এসে দাঁড়ালেও ধ্রুব তা জানতেই পারেন নি। তিনি ধ্যানানন্দে নিশ্চল। প্রাণের দেবতাকে একান্তে বুকে পেয়ে সেই বিমলানন্দে ভরপুর। তাঁর বাহ্যস্মৃতি পর্য্যন্ত নেই। সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বার রুদ্ধ। ভগবান বৈকুণ্ঠনাথ চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে ধ্রুবকে দর্শন দিতে এসে তো সমস্যায় পড়লেন। কাকে দর্শন দেবেন?

তার তো কোন সাড়া নেই। তখন ভগবান বাধ্য হয়েই তাঁর ধ্যেয়মূর্তি অন্তর হতে অপহরণ করলেন। ধ্যেয়বস্তুর অদর্শনে ধ্রুব আকুল হয়ে উঠলেন। চোখ মেলে দেখলেন ভিতরের মূর্তিই বাইরে রূপ পরিগ্রহ করে দাঁড়িয়ে আছেন। তখন ভগবান ধ্রুবের মনের কাতরতা বুঝতে পারলেন। ধ্রুব ভগবদ্দর্শনে আনন্দে উচ্ছলিত হয়ে তাঁর স্তুতি করতে চান কিন্তু শাস্ত্রজ্ঞান না থাকায় তাঁর অধরে ভাষা নেই, হৃদয় কিন্তু ভাবে মাখামাখি। তাই ভগবান বৈকুণ্ঠনাথ কৃপা পরবশ হয়ে তাঁর জ্ঞানময় পাঞ্চজন্য শঙ্খ ধ্রুবের গণ্ডস্থলে স্পর্শ করিয়ে দিলেন—এবং পরে বর প্রার্থনা করতে বললেন। ভগবান পরীক্ষা করতে চাইলেন পাঞ্চজন্য শঙ্খ ধ্রুবকে অকৃপণ ভাবে দান করেছে কিনা—দেখলেন—না। দান দিতে শঙ্খ এতটুকু কার্পণ্য করে নি। ধ্রুব রাজ্য, স্বর্গ, মুক্তি এমনকি ভগবানকেও চাইলেন না। বৈকুণ্ঠের অধীশ্বরকে বিস্মিত করে ধ্রুব বললেন—

ভক্তিং মুহুঃ প্রবহতাং ত্বয়ি মে প্রসঙ্গো
ভূয়াদনন্ত মহতামমলাশয়ানাম্।
যেনাঞ্জসোল্বণমুরুব্যসনং ভবাব্ধিং
নেষ্যে ভবদ্গুণকথামৃতপানমত্তঃ॥ ভাঃ ৪।৯।১১

প্রভু, তোমাকেও আমি চাই না, কিন্তু তুমি আমাকে এই কৃপা কর—যাতে তোমার পাদপদ্মে যারা শুদ্ধাভক্তিকে বহন করে সেই ভক্তজনের চরণপ্রান্তে বসে বসে তোমার কথারস যেন আস্বাদন করতে পারি। কারণ তোমার কথাকে যারা আশ্রয় করে তাদের কাছে ভবসাগর গোষ্পদ শুধু নয় গোবৎসপদ হয়ে যায়। ভগবানকে পেলেই শুধু হবে না—বস্তু পেলেও তার আস্বাদন না হওয়া পর্য্যন্ত বস্তু প্রাপ্তির সার্থকতা নেই। যেমন চন্দনকাঠ পেয়ে যদি ঘর্ষণ করা না যায় তাহলে তার পরিমল পাওয়া যাবে না। তেমনি ভগবদ্বস্তু পেলেই শুধু হবে না। ভগবানকে পেয়ে যাঁরা তাঁর মাধুরী উপভোগ করেছেন তাঁদের সঙ্গ যদি করতে পারা যায় তাহলে ভগবানকে পাওয়া সার্থক হয়। যোগ বা জ্ঞানের দ্বারা যে পরমাত্মা বা ব্রহ্মের অনুভূতি সেটি সম্যক জানা নয়—সেটি অল্প জানা। শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁর পীঠকভাষ্যে উপমা দিয়েছেন—জ্ঞান এবং যোগ পতিত্যক্তা পত্নীবৎ এবং ভক্তিমহারাণী অশেষগুণান্বিত যুবতী রত্নবৎ। মহাজনপদ এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায়—

চারিবেদ ষড়দর্শন পড়িয়াছে যেই জন
সে যদি গৌরাঙ্গ নাহি ভজে।
মিছা তার অধ্যয়ন লোচনবিহীন জন
অন্ধের দরপণ কিবা কাজে।।

দর্শনই হল চক্ষু। শাস্ত্রকে দর্শন বলা হয়। বেদবিদ্যার অধিকারী হয়েও যদি তদ্‌গত রতি না হয় তাহলে বিদ্যা কোন কাজেই লাগে না।

বেদবিদ্যা দুই কিছুই না জানত
সে যদি গৌরাঙ্গ করে সার
নয়নানন্দ ভণে সেই সে সকলই জানে
সর্ব্বসিদ্ধি করতলে তার॥

গজেন্দ্র তার তো পশুজন্ম—কোন বিদ্যা তো তার ছিল না তবু তার ওপর ভগবানের করুণা হয়েছিল—তাই বলা আছে—'বিদ্যা গজেন্দ্রস্য কা?' ভগবান অনন্ত করুণাসাগর। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমুখে বলেছেন—হরিভক্তি অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণনামসংকীর্ত্তন বিনা বিদ্যা মৃত। শ্রীকৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন বিদ্যাবধূজীবনম্। শ্রীকৃষ্ণনামসংকীর্ত্তন সর্ব্ববিদ্যায় জীবনীশক্তি। সব বিদ্যা বেঁচে থাকবে যদি ভগবানের নাম করা যায়। জীবন ছাড়া যেমন মানুষ বাঁচে না, তেমনি শ্রীকৃষ্ণনামসংকীর্ত্তন ছাড়া বিদ্যা বাঁচে না—অর্থাৎ বিদ্যার ফল হয় না। হরিকথার ওপরে আর বিদ্যা হয় না। জীব অবিরত মায়ার দাসত্ব করছে। কিন্তু এটি যে তার ভ্রম সে তা কিছুতেই বুঝতে পারে না। ভগবৎ কৃপায় এই মায়ার দাসত্ব ঘুচে গিয়ে স্বরূপ জেগে ওঠে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ—জাগান স্বরূপ।

'স্বরূপ জাগান স্বরূপ দেখে স্বরূপ জেগে উঠল সবার।'

এই হরিভক্তি যে মহাবিদ্যা—এতে কোনও কিছুর অপেক্ষা নেই। কিছু থাকলে যে ভক্তি হবে তা বলা যাবে না—যেমন সদাচার, বয়স, পাণ্ডিত্য, আভিজাত্য, রূপ যৌবন, ভক্তি কোন কিছুকে অপেক্ষা করে না। কোন কিছু না থাকলেও ভক্তি হবে—কারণ এর একমাত্র কারণ হল মহৎকৃপা। মহৎকৃপা ছাড়া ভক্তিলাভের অন্য কোন উপায় নেই। শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্রে প্রহ্লাদজী এবং জড়ভরত (রাজর্ষি ভরতের তৃতীয় জন্ম) যাঁরা ভক্তিপথের মহাজন তাঁরা সিদ্ধান্ত করেছেন—মহতের চরণরজে মস্তক অভিষিক্ত হলে তবে ভক্তিলাভ হবে। ভক্তি কিছু বিচার করে না। গুহক চণ্ডালের সঙ্গে

ভগবান রামচন্দ্রের মিতালি, বিদুরের ঘরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের কলার খোসা ভোজন, কুরূপা কুব্জাকে সাদরে অঙ্গীকার, পশু গজেন্দ্রকে উদ্ধার, পাঁচবছরের বালক ধ্রুব প্রহ্লাদকে দর্শনদানে কৃতার্থ করা—এসব দৃষ্টান্ত আলোচনা করলে দেখা যাবে ভগবান একমাত্র ভক্তিপ্রিয়।

ভক্ত্যা তুষ্যতি কেবলং ন চ গুণৈর্ভক্তিপ্রিয়ো মাধবঃ।

তাই কৃষ্ণপ্রিয়তা উপার্জ্জন করাই মানুষের জীবনের একমাত্র সম্পদ। রুচি যাতে হয় তারই মূল্য বেশী বুঝতে হবে। মুড়িতে পিঁপড়ে লেগেছে তার থেকে পিঁপড়েকে ছাড়াতে গেলে পাশে একটু টাটকা মধু রাখতে হবে। পিঁপড়ে মুড়ি ছেড়ে মধুতে এসে বসবে। কারণ মধুর মিষ্টি মুড়ির চেয়ে বেশী। পিঁপড়ে তো সামান্য জীবাধম কিন্তু তার যদি এইরকম প্রবৃত্তি দেখা যায় তাহলে আমরা তো মানুষ তার থেকে কত উন্নতস্তরের জীব—কিন্তু আমার তো সে বোধ হল না। বিষয়রসে মত্ত আমার বিষয়রস ছাড়াবার জন্য শ্রীগুরুবৈষ্ণব কত কৃপা করে বিষয়রসের পাশে মধুর ফোঁটা শুধু নয় মধুভাণ্ড অহরহঃ নামকীর্ত্তন, শ্রীবিগ্রহসেবা, দর্শন, ভাগবতী কথা রেখেছেন কিন্তু আমার মতি এমনই মন্দ যে সেদিকে আমার রুচি হয় না। এই বিষয় ছেড়ে যাঁরা কৃষ্ণপ্রেম লাভ করেছেন—শাস্ত্রে তাদের সম্বন্ধে ঘোষণা আছে। রাজর্ষি ভরতের চরিত্রে বলা আছে—

যো দুস্ত্যজান্ দারসুতান্ সুহৃদ্রাজ্যং হৃদিস্পৃশঃ।
জহৌ যুবৈব মলবদুত্তমঃ শ্লোকলালসঃ॥ ভাঃ ৫।৪।৪৩

যে ভক্তের চিত্ত ভগবান মধুরিপুর সেবাতে লুব্ধ তার কাছে পরমপুরুষার্থ মুক্তিসুখও অতিতুচ্ছ। সেবা তখনও পাওয়া হয় নি—কেবলমাত্র লোভ হয়েছে তাতেই যদি এই অবস্থা হয় তাহলে যারা সেবা পেয়েছে এবং অনুরাগে সেবা করে তাদের তো কথাই নেই। হরিভক্তির কাছে স্বর্গ, অপবর্গ (মুক্তি) প্রভৃতি যবনের খাদ্যের মত ঘৃণ্য। নারায়ণপর যারা তাদের সকলের সর্ব্বত্র সমদর্শন। হরিভক্তির কাছে যে কোন বিদ্যা তুচ্ছ। হরিভক্তি যে বিদ্যা মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা—রামানন্দ সিদ্ধান্ত করলেন তাতে মহাপ্রভু অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন—কারণ তাঁর নিজের মতের সঙ্গে মিলে গেছে। শ্রীশ্রীশিক্ষাষ্টকমের বাণীতে শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজের মতটি ব্যক্ত করেছেন—বিদ্যাবধূ জীবনম্। এই কৃষ্ণভক্তি ভক্তে আছে বলেই ভক্ত ভগবানের এত প্রিয়—যে হরিপ্রিয়তার কাছে যে কোন প্রিয়তা তুচ্ছ।

(২)

আস্বাদনের লোলুপতায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরবর্ত্তী প্রশ্ন—

'কীর্ত্তিগণ মধ্যে জীবের কোন বড় কীর্ত্তি?
কৃষ্ণপ্রেম ভক্ত বলি যার হয় খ্যাতি॥'

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রশ্ন এবং রামানন্দের উত্তর—এ বড় বিচিত্র সংবাদ—শাস্ত্রের এক বিস্ময়কর প্রকাশ। জগৎ স্তব্ধ মুগ্ধ হয়ে গেছে এই সংবাদে। শ্রীগৌরসুন্দর প্রশ্ন করলেন—কীর্ত্তিগণ মধ্যে কোনটি বড় কীর্ত্তি? এখন প্রশ্ন হচ্ছে—কীর্ত্তি বলতে কি বুঝায়? কীর্ত্তি বলতে যশ বুঝায়—এ যশ কোন যশ? কারণ ভক্তিরাজ্যে বলা আছে, ভক্ত যশ লাভ পূজা প্রতিষ্ঠার কাছ থেকে দূরে থাকে—প্রতিষ্ঠাকে শূকরী বিষ্ঠার মত অপবিত্র মনে করে, গৌরবকে রৌরব নরকের মত ঘৃণা করে—আর অভিমানকে সুরাপানের মত অশুচি বোধ করে। তাই যদি হয় তাহলে আবার মহাপ্রভুর এ প্রশ্ন কেন—কোন কীর্ত্তি বড়? এখানে কীর্ত্তি বলতে প্রাকৃত যশ নয়—কোন জাগতিক বস্তু সম্পর্ক নিয়ে যে কীর্ত্তি যশ তার কোন দাম নেই—কারণ যে যশ শাশ্বত নয় চিরন্তন নয়—সে যশের কোন্ দাম? জাগতিক বস্তু সবই চঞ্চল ক্ষণিক অশাশ্বত তাই তার সম্বন্ধে যে যশ তাও অশাশ্বত। এ যশ বুদ্ধিমান ব্যক্তি চায় না তো বটেই, দিতে গেলেও নেয় না—কারণ এ কীর্ত্তিতে বেঁচে থাকা যায় না। আর কীর্ত্তিই মানুষকে চিরজীবী করে রাখে। বলা আছে—

চলচ্চিত্তং চলৎবিত্তং চলজ্জীবন যৌবনম্।
চলাচলমিদং সর্ব্বং কীর্ত্তি র্যস্য স জীবতি॥

এ জগতে যার কীর্ত্তি সেই বেঁচে থাকে—এ বেঁচে থাকার অর্থ শারীরিক জীবন ধারণ নয়—দেহ নিয়ে কেউ চিরদিন বেঁচে থাকতে পারে না—কারণ যার দেহধারণ আছে তার দেহত্যাগ তো থাকবেই। কিন্তু এ বেঁচে থাকার অর্থ হল মানুষের মনের মাঝে চিরদিন অমর হয়ে থাকা—শাস্ত্রে তাঁদের খ্যাতি, মহাজনের মুখে মুখে তাঁদের গীতি। এর নামই আসল বেঁচে থাকা। এ যশ ভক্তই লাভ করে। ভক্তই শাস্ত্রে মহাজনের হৃদয়ে চিরজীবী হয়ে থাকেন। ভক্ত এই কীর্ত্তির, এই যশের অধিকারী হয় কি করে? ভক্ত তো নিরন্তর ভগবানকে ভজনা করে কায়মনোবাক্যে। বাক্য দিয়ে তাঁর গুণগান করে, শরীর দিয়ে প্রণাম করে আর মন দিয়ে স্মরণ

করে। যিনি ষড়ৈশ্বর্য্যের অধিকারী—তাঁকেই ভগবান বলা হয়। ভগবানের ছটি ঐশ্বর্য্য—ঐশ্বর্য্যকেই 'ভগ' বলা হয়। এই 'ভগ' যাঁর আছে—তিনি হলেন ভগবান। 'ভগ' বলতে ছটি ঐশ্বর্য্য—সমগ্র ঐশ্বর্য্য, সমগ্র বীর্য্য, সমগ্র শ্রী (সৌন্দর্য্য) সমগ্র যশ, সমগ্র জ্ঞান এবং সমগ্র বৈরাগ্য। সমগ্র বলতে বুঝায় যার সমান কোথাও নেই সুতরাং তার থেকে বেশী তো থাকবেই না। এই যে সমগ্র যশ—ভগবানের—সেই ভগবানের ভজন করে করে ভক্তও যশের অধিকারী হয়। যশ বলতে বুঝায় অসাধারণ গুণ। শ্রীগোবিন্দ স্বরূপে এই অসাধারণ গুণ চারটি—কারণ এই চারটি গুণ একমাত্র শ্রীগোবিন্দ ছাড়া অন্য কোথাও নেই। ভগবানের গুণের সংখ্যা তো করা যায় না। তবু অসংখ্য অপরিমিত বস্তুকে আমরা ধারণা করতে পারি না—তাই শাস্ত্রে ভগবানের গুণেরও বিচার আছে। ভগবানের অনন্তগুণের মধ্যে চৌষট্টি গুণ প্রধান। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ বলেছেন—

অনন্ত কৃষ্ণের গুণ চৌষট্টি প্রধান।
এক এক গুণ শুনি জুড়ায় ভক্ত কান॥

অনন্ত গুণের মধ্যে চৌষট্টি প্রধান। এই চৌষট্টি গুণের মধ্যে পঞ্চাশটি গুণ জীবে সঞ্চারিত হয়—বিন্দুরূপে। গোবিন্দে গুণ সিন্ধু সাগরের মত অসীম অগাধ আর জীবেতে আসে বিন্দুরূপে। তাতেই জীব ভরপুর হয়ে যায়। বিন্দুতে সিন্ধু ভোগ করে—পাথারে সাঁতারে। কারণ ভগবানের সর্বগুণ তো জীবে আসা সম্ভব নয়। যতটুকু পরিমাণে এলে জীবের জীবত্ব বজায় থাকে ততটুকু পরিমাণে আসে।

জীবেষ্বেতে বসন্ত্যপি বিন্দু বিন্দুতয়া ক্বচিৎ।

এ হল পঞ্চাশটি গুণের হিসাবে। তার পরের পাঁচটি গুণ অর্থাৎ পঞ্চান্নটি গুণ থাকে গিরিশাদিতে অর্থাৎ শঙ্করে। তারপরের পাঁচটি গুণ অর্থাৎ ষাটটি গুণ থাকে লক্ষ্মীশাদিতে অর্থাৎ শ্রীমন্নারায়ণে। এর পরের যে চারটি গুণ সেটি গোবিন্দস্বরূপ থেকে অন্য কোথাও যাবে না। এর নাম অসাধারণ গুণ—এর নামই যশ। এই চারটি গুণ বলা আছে—লীলামাধুর্য্য, প্রেমমাধুর্য্য, রূপমাধুর্য্য আর বেণুমাধুর্য্য।

সর্ব্বাদ্ভূতচমৎকারি লীলা কল্লোলবারিধি।
অতুল্য মধুর প্রেমমণ্ডিত প্রিয়মণ্ডলঃ॥

ত্রিজগন্মানসাকর্ষি মুরলিকলকূজিত
অসমানোর্দ্ধরূপশ্রী বিস্মাপিতচরাচরঃ ॥

শ্রীগোবিন্দের লীলা প্রেম, বেণুমাধুর্য্য, রূপমাধুর্য্য অসাধারণ। বলা আছে—

যে রূপের এক কণ ডুবায় সব ত্রিভুবন
নরনারী করে আকর্ষণ।

গোবিন্দ রূপ মাধুরী নারায়ণেও নেই—'সে মাধুর্য্য নাহি নারায়ণে।' এখন এই অসাধারণ যশোমণ্ডিত শ্রীগোবিন্দকে নিরন্তর কায়মনোবাক্যে ভাবনা করে করে ভক্তও যশের অধিকারী হয়। এই কীর্ত্তি যারা লাভ করেছেন—তারাই জগতে খ্যাতিলাভ করেন। শ্রীপাদ রামানন্দ মহাপ্রভুর মন বুঝে তাই সিদ্ধান্ত করলেন—'কৃষ্ণপ্রেম ভক্ত বলি যার হয় খ্যাতি।' এই কৃষ্ণভক্তই যার কৃষ্ণে প্রেম হয়েছে তারাই জগতে খ্যাতিলাভ করেন। এই কীর্ত্তিই চিরস্থায়ী শাশ্বত। তাই শাস্ত্র আজও তাঁদের গুণগানে মুখর—যেমন পাণ্ডবগণ, ধ্রুব, প্রহ্লাদ, মহারাজ অম্বরীষ, গজেন্দ্র, অজামিল, চিত্রকেতু মহারাজ—এঁদের সকলের ওপরে রয়েছেন ব্রজরামাগণ। ভক্তির পর পর স্তরবিচারে কৃষ্ণপ্রেমের চরমস্তরে শ্রীধাম বৃন্দাবনের গোপী অনুরাগ। কারণ দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর—এই চার রকমের রস শাস্ত্রে বলা আছে। অবশ্য তার আগে শান্তরস—শাস্ত্রে এই পঞ্চরস। কাব্যে যেমন নবধা রস। কিন্তু শান্তরসে কোন সম্বন্ধের বোধ নেই। শান্তরসের রসিক ভগবানকে শুধু ঈশ্বর বোধে উপাসনা করেন তাই শান্তরসকে সম্বন্ধলক্ষণা ভক্তি থেকে বাদ দেওয়া আছে। সম্বন্ধ লক্ষণা ভক্তির প্রথম স্তর হল দাস্যরস দাস্যপ্রেম বা দাস্যভক্তি। এর ওপরে সখ্যভক্তি—তার ওপরে বাৎসল্য ভক্তি এবং এরও ওপরে মধুরভক্তি। এই মধুররস আবার বিচারে শ্রীবৃন্দাবনে সকলের ওপরে। কারণ দ্বারকাভূমি এবং মথুরাভূমিতেও তো মধুররসের পরিকর আছেন। কিন্তু ব্রজের মধুররসের আস্বাদন তাদের পাওয়া সম্ভব হয় না। কারণ ব্রজছাড়া অন্য জায়গায় যে মধুর রস সেখানে বিধি বিধানে গোবিন্দ পাওয়া। কিন্তু ব্রজগোপীদের যে কৃষ্ণপ্রেম সেটি হল বেদবিধির পার। কোনও বিধি বিধানে ব্রজরামাদের গোবিন্দ পাওয়া নয়। কোনও স্বার্থবোধে তাদের কৃষ্ণ ভালবাসা নয়—শুধু তারা কৃষ্ণ ভাল না বেসে পারেন না—তাই ভালবাসেন। একেই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বললেন—নিরবদ্য প্রেম। যে প্রেমের

প্রতিদান দেওয়া গোবিন্দের পক্ষে সম্ভব হয়নি। যেখানে কৃষ্ণকে হার স্বীকার করতে হল। এই প্রেমের খ্যাতি সর্ব্বপরি। তাই ব্রজপ্রেম, গোপীপ্রেম আবার গোপীমুখ্যা রাধারাণীর প্রেম জগতের শীর্ষস্থানে দাঁড়িয়ে আছে। শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রে সাধ্যবস্তু হয়ে আছেন এই ব্রজপ্রেম। এমনকি ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র—যিনি সর্ব্বপরি তত্ত্ব—তিনিও সাধ্যবস্তু হননি। কারণ ভগবানকে প্রেম ছাড়া পাওয়া যায় না—আস্বাদন করা যায় না। ভগবান কৃষ্ণচন্দ্রকে পূতনা, শিশুপাল, কংস পেয়েছেন কিন্তু আস্বাদন হয়নি—পূতনা বুকে পাওয়া কৃষ্ণকে ফেলে দিতে চেয়েছে। তাহলে জগতে কৃষ্ণপ্রেমেরই খ্যাতি এবং এই কৃষ্ণপ্রেম যার আছে সেই ভক্তেরই কীর্ত্তি জগতে ঘোষিত হয়। এই কীর্ত্তি যার আছে সেই কৃষ্ণভক্তই জগতে বেঁচে থাকে। তাই কথা আছে কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি। তাই শাস্ত্রের মাধ্যমে ধ্রুব, প্রহ্লাদ, মহারাজ অম্বরীষ, গজেন্দ্র প্রভৃতি আজও বেঁচে আছেন—তাঁদের কীর্ত্তি যুগ যুগ ধরে ঘোষিত হচ্ছে। ভগবানের সঙ্গে এই ভক্তগণের যশোগাথা মহাজন গান করেন—গান করেছেন, গান করছেন এবং অদূর ভবিষ্যতে করবেন। কোনও দিনই এই কীর্ত্তি যশোগাথা জগতে ম্লান হবে না—চিরদীপ্ত চিরউজ্জ্বল হয়ে থাকবে। প্রাকৃত সম্পর্কে কোন যশ, ধনজন মান প্রতিপত্তি চিরস্থায়ী হয় না। তাই তাকে কীর্ত্তি বলা যায় না—কারণ সে কীর্ত্তি লাভ করলেও মানুষ জগতে চিরজীবি হয় না। শ্রীমন্মহাপ্রভু যে প্রশ্ন করলেন—বল রামানন্দ—কীর্তিগণ মধ্যে জীবের কোন বড় কীর্ত্তি? শ্রীপাদ রামানন্দ রায় গৌরসুন্দরের কৃপাপুষ্ট কণ্ঠে তাই উত্তর দিলেন—'কৃষ্ণপ্রেম ভক্ত বলি যার হয় খ্যাতি।'

কৃষ্ণপ্রেমের ভক্তের খ্যাতি বলেই বাক্‌পতি ব্রহ্মা বেদবক্তা ব্রহ্মা তাঁর স্তুতিতে সিদ্ধান্ত করলেন—ভগবানকে পাবার সহজ দুটি পথ ভক্ত সাধক বেছে নিয়েছেন—(১) কায়মনোবাক্যে সর্ব্বত্র অবিচারে প্রণাম আর (২) ভগবান এবং কৃষ্ণপ্রেমভক্তের কথাকে জীবনধারণের উপায় করে রাখা। ব্রহ্মার মত ব্যক্তি যার ভাণ্ডারে বাণীর অভাব নেই—তিনিও শৃন্বন্তি ক্রিয়া না বলে বললন 'জীবন্তি'। কারণ কথা শোনা এক আর সেই কথাকে জীবনধারণের উপায় করে রাখা এক। কারণ কথা শুনলেও তাকে জীবনধারণের উপায় বলা চলে না। কারণ শোনা কি রকম—কোনওদিন

শুনলেও হয় আবার কোনওদিন না শুনলেও হয়। একে শ্রবণ বলা যাবে সেখানে 'শ্রু' ধাতুর প্রয়োগ হবে—কিন্তু ব্রহ্মা জীব ধাতুর প্রয়োগ করেছেন—জীবধাতুর অর্থ হল জীবনধারণের উপায়—অর্থাৎ কথা না শুনলে প্রাণ যেন বাঁচে না—যেমন অন্নজল গ্রহণ না করলে প্রাণ বাঁচে না। ক্ষুধায় অন্ন, পিপাসায় পানীয় যেমন গ্রহণ করা চাই-ই—না হলে যেমন প্রাণ বাঁচে না ভগবানের কথা এবং ভক্তকথা শ্রবণকে ঐ রকম জীবনধারণের উপায় করে রাখতে হবে। শুদ্ধ ভক্ত তাই করে। তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ বললেন—

কৃষ্ণনামামৃত বিনে খায় যদি অন্নপানে
তবু ভক্তের দুর্ব্বল জীবন।

এখন প্রশ্ন হতে পারে ভগবানের কথাই না হয় শুনতে হবে—আবার তার সঙ্গে কৃষ্ণপ্রেম ভক্তের কথা শোনার কি প্রয়োজন? মহাজন সিদ্ধান্ত করেছেন—ভগবানের কথা পরম মহৌষধ আর তার সঙ্গে ভক্তকথা হল অনুপান। কারণ কবিরাজমশাই যখন রোগীকে চিকিৎসার জন্য বড়ি খেতে দেন—তখন শুধু বড়ি দেন না তার সঙ্গে অনুপানেরও ব্যবস্থা করেন। কারণ শুধু বড়িতে রোগ ভাল হবে না। তার সঙ্গে অনুপান চাই। মধু একটি সাধারণ অনুপান তো আছেই—তা ছাড়া যে রোগের যে ওষুধ এবং যে ওষুধের যে অনুপান—যেমন কোন পাতার রস বা পানের রস, আতপচাল ভিজানো জল, বড় এলাচের গুঁড়া, দুধের সর—এইরকম কত অনুপান। অনুপান ছাড়া যেমন কবিরাজী বড়ি কাজ করে না—তেমনি জীব (মানুষ) হল ভবরোগী—তারও অবিদ্যা ব্যাধি ভাল করবার জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু বিধান দিলেন—

গৌরাঙ্গ নিদানী আমার হরিনাম মহৌষধি বিধান কইলা।
নিদানের বিধানকারী গৌরাঙ্গ নিদানী আমার।

এখন এই হরিনাম হরিকথা তো মহৌষধি বটেই—কিন্তু তার সঙ্গে ভক্তচরিত্র হল অনুপান। ভক্তকথা মিশিয়ে মিশিয়ে ভগবানের কথা শুনলে, তবে কাজ হবে। কারণ ভগবানের লীলা অলৌকিকী—মানুষের ধরা ছোঁয়ার বাইরে, মানুষ ভগবানের লীলা আচরণ করতে পারবে না। কিন্তু ভক্ত চরিত্র মানুষ আচরণ করতে পারবে। ভক্তও আমাদের মত মানুষ। তাই সাধন্ জগতে জীবের আদর্শ হয়ে আছেন ভক্তগণ। ভক্ত

কেমন করে ভজন করে ভগবানকে পেয়েছেন, কেমন ভাবে শতবাধা প্রতিকূল অবস্থা পার হয়ে ভগবানের কৃপালাভ করেছেন—এ সব মানুষের কাছে অনুকরণীয়। মানুষ মনে করবে আমরাও যদি এইভাবে আচরণ করতে পারি তাহলে আমরাও তো ভগবানকে পেতে পারি। তাহলে কৃষ্ণপ্রেম ভক্তের খ্যাতি (কীর্ত্তি) কত বড় যাদের চরিত্র জগতে আদর্শস্থল হয়ে আছে। এ কীর্ত্তির ওপরে আর কীর্ত্তি হয় না—কৃষ্ণপ্রেম যার সেই ভক্তই জগতে কীর্ত্তিমান। তাঁরাই চিরদিন বেঁচে থাকবেন। মানুষের মনে চিরজাগরুক হয়ে থাকেন—তাঁদের সম্বন্ধেই 'কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি।' কৃষ্ণপ্রেম ভক্তের অমল যশোগাথা জগতে চিরকাল গীত হবেন। প্রহ্লাদ ধ্রুব মহারাজ, অম্বরীষ, চিত্রকেতু সকলেই তো সত্যযুগের, ত্রেতাযুগের রামভক্ত মহাবীর শ্রীহনুমানজী, গুহক চণ্ডাল, শবরী, দ্বাপরে পাণ্ডবগণ, পিতামহ ভীষ্ম, পাণ্ডবজননী কুন্তী, পাণ্ডবঘরণী দ্রৌপদী, আবার এই কলিযুগে গৌরপ্রিয় পরিকর কত শত ভক্ত—সকলেরই কীর্ত্তি অর্থাৎ ভগবানের প্রতি অনুরাগ শাস্ত্র আজও গান করছেন—মহাজনের কণ্ঠে তাঁদের খ্যাতি ঘোষিত হচ্ছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রশ্ন এবং রায় রামানন্দের সিদ্ধান্তিত উত্তর তাই শাস্ত্রে এক অবিস্মরণীয় সংগঠন।

'কীর্ত্তিগণ মধ্যে জীবের কোন বড় কীর্ত্তি?
কৃষ্ণপ্রেম ভক্ত বলি যার হয় খ্যাতি ॥'

(৩)

এর পরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আর একট প্রশ্ন—

'সম্পত্তির মধ্যে জীবের কোন সম্পত্তি গণি?
রাধাকৃষ্ণে প্রেম যার সেই বড় ধনী ॥'

সম্পত্তি বলতে ধনৈশ্বর্য্য বুঝায়। এ জগতে অর্থকেই অর্থাৎ টাকাকড়ি জমিজমাকেই সম্পত্তির মধ্যে ধরা হয়। এখন এ সবই তো প্রাকৃত—ক্ষণিক নশ্বর। মহাপ্রভু তো বিষয়বিরাগী সন্ন্যাসী নিষ্কিঞ্চন। নিষ্কিঞ্চন বলতে বুঝায় যিনি ভগবানের প্রতি অনুরাগে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করেছেন—তা না হলে যাদের কিছু নেই, নাস্তি কিঞ্চন যস্য তাদের নিষ্কিঞ্চন বলা হবে না। কারণ তাহলে জগতে তো অনেক নিষ্কিঞ্চন পাওয়া যাবে। যারা পথে পড়ে থাকে—টাকাকড়ি ঘরবাড়ী জমিজমা স্ত্রী পুত্র কিছু নেই।

তারা ঘাটে কি নিষ্কিঞ্চন? তা নয়। কারণ তাদের বিষয় নেই বলে ভোগ করে না—পেলেই ভোগ করবে। কারণ ভোগের আকাঙক্ষা তো যায় নি। আর সত্যিকার ভগবানে অনুরাগ না হলে প্রাকৃত বিষয়ে ভোগের আকাঙক্ষা যায় না। ভোগের দ্বারা ভোগের আকাঙক্ষার নিবৃত্তি হয় না। যেমন ঘি আর কাঠ অনবরত আগুনে দিলে আগুনের লেলিহান শিখা নিভবে না তো বটেই বরং উত্তরোত্তর বাড়বে। তেমনি ভোগ্যবস্তু ইন্ধন দিলে ভোগের বাসনার লেলিহান শিখা নিভবে না বরং বাড়বে। তাই মহাপ্রভু নিষ্কিঞ্চন পদের প্রতিশব্দ দিলেন ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য আবার পারং পরং জিগমিষো ভবসাগরস্য। অর্থাৎ যিনি নিষ্কিঞ্চন তিনি ভগবদ্ভজনে উন্মুখ এবং তিনিই সংসার সাগর পারে যাবার জন্য ইচ্ছুক। তাই সন্ন্যাসী গৌর এই সম্পত্তির খবর জানতে চাইছেন কেন? রামানন্দ তাই এ প্রশ্নে অবাক্ হয়ে গেছেন—মহাপ্রভুর তো এ প্রশ্ন করার কথা নয়। রামানন্দ ভাবছেন—এ প্রশ্নের উত্তর কি হতে পারে রামানন্দ মহাপ্রভুর হার্দ্য বুঝে তাঁরই কৃপাপুষ্ট কণ্ঠে উত্তর দিলেন—

'রাধাকৃষ্ণে প্রেম যার সেই বড় ধনী।'

শ্রীরাধাগোবিন্দে যিনি প্রেম লাভ করেছেন সাধুগুরু বৈষ্ণবের করুণায় তিনিই এ জগতে সবচেয়ে বড় ধনী। কারণ এ পৃথিবীতে সব ধনই নশ্বর এবং এই ধন চাওয়ারও শেষ নেই। শতী সহস্রমিচ্ছতি। যার একশ আছে সে হাজার চায়, যার হাজার আছে সে লক্ষ চায়, যার লক্ষ আছে সে কোটি চায়, যার কোটি আছে সে রাজ্য চায়, সে সাম্রাজ্য চায়। কিন্তু যতই চাক্ যতই পাক—তৃপ্তি তো নেই বরং অতৃপ্তি। আর সে সম্পদের সীমা আছে। এ ব্রহ্মাণ্ডে চৌদ্দ ভুবন—এরকম অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির মধ্যে। ভূলোকের সুখৈশ্বর্য্যের ওপরে স্বর্গসুখ—স্বর্গসুখের ওপরে ব্রহ্মলোকের সুখৈশ্বর্য্য। কিন্তু স্বর্গসুখ—ব্রহ্মলোকের সুখ সবই নশ্বর। কারণ দেবরাজ ইন্দ্রের ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ত্তা—তাঁদের সকলেরই পরমায়ুর শেষ আছে। শ্রীগোবিন্দের শ্রীমুখের বাক্য প্রমাণ—

ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্তলোকং বিশন্তি। গীঃ ৯।২১

* * * *

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন। গীঃ ৮।১৬

বুদ্ধিমান ব্যক্তি নশ্বর বস্তু পাবার আকাঙক্ষা করে না। যেমন যাদুকরের

টাকা মিথ্যা। সে থলি থেকে কত টাকা বার করছে কিন্তু দর্শক তাতে লুব্ধ হয় না—কারণ তারা জানে যে ঐ টাকাগুলি সত্য নয়। ওর যদি অত টাকাই থাকবে তাহলে টাকা রোজগারের জন্য অত কষ্ট করে দরজায় দরজায় খেলা দেখিয়ে বেড়ায় কেন? তেমনি এ জগতের যত সুখৈশ্বর্য্য, স্বর্গলোক ব্রহ্মলোকের যত সুখ, যত সম্পত্তি বুদ্ধিমান ভক্ত কোনটাকেই গণনা করে না,—সে সম্পত্তি পাবার জন্য লোভ করে না—বরং তাকে ত্যাজ্যবুদ্ধি করে। এইজন্যই ভক্তকে চতুর বলা হয়—চতুর মানে বুদ্ধিমান।

যেই জন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর।

এই বুদ্ধিমত্তার লক্ষণ ভগবান উদ্ধবজীর কাছে করেছেন—শ্রীএকাদশে বলা আছে—

এষা বুদ্ধিমতাং বুদ্ধির্মনীষা চ মনীষিণাম্।
যৎ সত্যমনৃতেনেহ মর্ত্ত্যেনাপ্নোতি মামৃতম্॥ ভাঃ ১২।২৯।২২

তার বুদ্ধিকেই বুদ্ধি বলা হবে, তার মনীষাকেই মনীষা বলা হবে—যে তার মিথ্যা এবং মরণধর্মশীল (মর্ত্ত্য) দেহ নিয়ে সত্যস্বরূপ এবং অমৃতস্বরূপ আমাকে রোজগার করে নিতে পারে উদ্ধব। তাই ভগবানকে ছাড়া চতুর ভক্ত আর কিছু নেয় না। প্রাকৃত সম্পদ তো চায়ই না—এমন কি মুক্তিসম্পদও নেয় না। মুক্তি তো নশ্বর নয়—তবু ভক্ত মুক্তিকেও সম্পদের মধ্যে গণনা করে না। বরং মুক্তিকে নরকের মত ঘৃণ্যবোধ করে। কারণ মুক্তিতেও ত্রুটি আছে। মুক্তিতে জন্মমৃত্যু বন্ধ হচ্ছে বটে, দেহধারণ করে তাকে আর আসতে হবে না—সুতরাং দেহত্যাগ করে যেতে হবে না। আসা যাওয়া দুটিতেই তো কষ্ট আছে। কারণ যার দেহ ধারণ আছে তারই দেহত্যাগ আছে। জন্মেও কষ্ট, মৃত্যুতেও যাতনা—এই দুটি আর পেতে হবে না—তার নাম তো মুক্তি। তাহলে মুক্তি পেলে তো পরমানন্দ। তাহলে মুক্তি পেলে তো লাভ আছে। মুক্তি তো তাহলে সম্পত্তির মধ্যে গণ্য হতে পারে। ভক্ত কিন্তু বিচার করে দেখেছে এই মুক্তি পেয়েও লাভ নেই। কারণ মুক্তি পেলেও জীবের স্বরূপানুভূতি হচ্ছে না। মুক্তিতে জীব নিজেকে নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত বলে বুঝতে পারছে—যাকে আত্মজ্ঞান বলা হয়। আত্মজ্ঞানেরই অপর নাম স্বরূপজ্ঞান বা স্বরূপস্মৃতি। কিন্তু এটিও জীবের ঠিক আসল স্বরূপ জ্ঞান

নয়। জীবের খাঁটি স্বরূপ জ্ঞান হল সে নিত্যকৃষ্ণদাস। এ স্বরূপ জ্ঞান মুক্তি পেলেও জীব পাচ্ছে না। আর নিজেকে দাস বলে যদি অনুভব না হয় তাহলে ভগবানের পাদপদ্মে সেবাসুখ পাবে কি করে। কারণ দাসেরই তো সেবাতে অধিকার। তাই ভক্ত মুক্তিকেও সম্পত্তির মধ্যে গণনা করে না—সে চায় ভগবানের পাদপদ্মে একমাত্র প্রেমসেবা। এইটিই হল খাঁটি সম্পদ। যে সম্পদের কাছে অন্য যে কোন সম্পদ তুচ্ছ হয়ে যায়। তাই রামানন্দ রায় মহাপ্রভুর মন বুঝে উত্তর দিলেন—সম্পত্তির কথা জানতে চাইছ প্রভু?

রাধাকৃষ্ণে প্রেম যার সেই বড় ধনী।

ভগবান ভক্তকে অনেক পরীক্ষা করে নিয়েছেন। বৈকুণ্ঠনাথ ঋষি দুর্ব্বাসার কাছে খাঁটি ভক্তের অবস্থাটি দেখালেন—

মৎসেবয়া প্রতীতং তে সালোক্যাদিচতুষ্টয়ম্।
নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোঽন্যৎ কালবিপ্লুতম্॥

ভাঃ ৯।৪।৬৭

ঋষি, তোমাকে আমার ভক্তের কথা আর কি বলব—ভক্ত সালোক্য সার্ষ্টি, সামীপ্য, সাযুজ্য, সারূপ্য কোনও মুক্তিই প্রার্থনা করে না—সে শুধু আমার পাদপদ্মে সেবাসুখ চায়। মুক্তিই যখন চায় না—স্বর্গসুখ তো চাইবেই না। কারণ মুক্তিসুখ তো কালের প্রবাহে নষ্ট হবে না—কিন্তু স্বর্গসুখ তো কালের প্রবাহে নষ্ট হয়ে যাবে।

কপিল ভগবানও মা দেবহূতির কাছে বলেছেন—

সাল্যেক্যসার্ষ্টি সামীপ্য সারূপ্যৈকতমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎ সেবনং জনাঃ।। ভাঃ ৩।২৯।১৩

মুক্তি পাঁচ প্রকার। সালোক্য—ভগবানের সঙ্গে একলোকে বাস, সার্ষ্টি—ভগবানের সমান ঐশ্বর্য্যলাভ, সামীপ্য—ভগবানের কাছে কাছে থাকা, সারূপ্য—ভগবানের সমানরূপ লাভ করা, সাযুজ্য—ভগবানে লীন হয়ে যাওয়া। এই সাযুজ্য মুক্তি আবার দুরকম। ব্রহ্মসাযুজ্য এবং ঈশ্বরসাযুজ্য। ব্রহ্মে লীন হওয়া এবং ঈশ্বরে লীন হওয়া। এর মধ্যে ব্রহ্মসাযুজ্য মুক্তির চেয়ে ঈশ্বর সাযুজ্যরূপ মুক্তি আরও ঘৃণ্য। কারণ ব্রহ্মে লীলামাধুর্য্য, রূপমাধুর্য্য, রস মাধুর্য্যের প্রকাশ নেই। তাতে হয়ত লীন হতেও পারে কিন্তু ঈশ্বর তো ষড়ৈশ্বর্য্যশালী লীলাময় শ্রীবিগ্রহ অনন্ত গুণ রসের

আধার। সেখানে সেই মাধুর্য্য আস্বাদন না করে যাঁরা ঈশ্বরে লীন হয়ে যায়, ঈশ্বর-সাযুজ্যরূপ মুক্তি পেতে চায় বা পায় তারা অতি মূর্খ। কারণ ঘরে খাদ্য না থাকলে তো উপবাস দিতেই হবে—উপায় নেই। কিন্তু যার ঘরভরা খাদ্য—প্রচুর মহাপ্রসাদ সে যদি অভিমান করে উপবাস করে দাঁতে দড়ি দিয়ে পড়ে থাকে—তাকে লোকে মূর্খই বলে। তেমনি ঈশ্বরে প্রচুর খাদ্য তাই সেটি আস্বাদন না করে যদি তাতে লীন হয়ে যায়—তাহলে সে তো মহামূর্খ। কারণ লীন হলে তো আর আস্বাদন করতে পারা সম্ভব হবে না। আর ব্রহ্মে তো মাধুর্য্যের প্রকাশই নেই তাই সেখানে আস্বাদন করা তো সম্ভব হচ্ছে না—সুতরাং ব্রহ্মে লীন হলেও হতে পারে। কপিল ভগবান মা দেবহূতিকে বলছেন—ভক্তের সামনে আমি এই পঞ্চবিধা মুক্তির ডালা সাজিয়ে ধরেছি—ভক্ত বেছে নাও কোনটি তোমার প্রয়োজন? কিন্তু ভক্ত কোনওরকম মুক্তি তো চায় না বটেই—দিতে গেলেও নেয় না। মা জিজ্ঞাসা করছেন, তাহলে ভক্ত কি নেয়? কপিল ভগবান বললেন—'বিনা মৎসেবনং জনাঃ।' ভক্ত আমার পাদপদ্মে শুধু প্রেমসেবা চায়।

ভগবান পূর্ণব্রহ্ম রামচন্দ্রও হনূমানজী ভক্তবীরকে পরীক্ষা করেছেন—হনূমান, তুমি মুক্তি নাও আমি তো মুক্তিও দিতে পারি। হনূমানজী বললেন—মুক্তি পেলে কি হবে—তুমি আমার প্রভু সর্ব্বেশ্বর এবং আমি তোমার চরণকমলে দাস এই দাসপ্রভু সম্বন্ধ বজায় থাকবে তো? রামচন্দ্র বললেন—না হনূমান, মুক্তি পেলে তুমি আমাতে লীন হয়ে যাবে। তুমি আর আমি এক হয়ে যাব। তুমি আলাদা করে দাস আর আমি প্রভু এ সম্বন্ধে থাকবে না। হনূমানজী শুনে বললেন—প্রভু আমার দরকার নেই। আমি মুক্তি চাই না, মুক্তি পেলে ভববন্ধন ছেদন হয় জানি, আসা যাওয়া বন্ধ হয়ে যায় কিন্তু যে মুক্তি পেলে তুমি প্রভু আর আমি দাস এ সম্বন্ধ লুপ্ত হয়ে যায়—সে মুক্তি আমি চাইব না বটেই—চাইবার স্পৃহাও করি না। তাহলে দেখা যাচ্ছে ভক্ত যে সম্পত্তি পেয়ে আছে রাধাগোবিন্দের পাদপদ্মে প্রেমসেবা—তার কাছে মুক্তিসুখও কিছু নয়। রামানন্দ রায় তাই সিদ্ধান্ত করলেন—

রাধাকৃষ্ণে প্রেম যার সেই বড় ধনী।

এই প্রেমসেবা তো সম্পত্তি বটেই—শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ গৌর

কৃপার মূরতি তিনি অনুভব করে বলছেন—গৌরভক্ত কোনটিকে বৈভব (সম্পদ) বলে মনে করে জান? গৌরসুন্দর যদি একটু কৃপা নয়ন কারও প্রতি একটু দৃষ্টিপাত করেন—একটু তাকান যাকে মহাজন বলেছেন—

মধুর চাহনি আকর্ষণ।

গৌর একবার 'হরি' বলে যার পানে চাইছে তারই আঁখি মন হরিছে—সে অমনি ঢলে পড়িছে। গৌরভক্ত শ্রীগৌরসুন্দরের এই কৃপা কটাক্ষকে পরম বৈভব বলে, সম্পত্তি বলে মনে করে—যার কাছে সব তুচ্ছ হয়ে যায়—শ্রীচৈতন্য চন্দ্রামৃতে বলা আছে—

কৈবল্যং নরকায়তে ত্রিদশপূরাকাশ পুষ্পায়তে
দুর্দ্দান্তেন্দ্রিয়কালসর্পপটলী প্রোৎখাত দংষ্ট্রায়তে।
বিশ্বং পূর্ণ সুখায়তে বিধিমহেন্দ্রাদিশ্চ কীটায়তে
যৎ কারুণ্যকটাক্ষবৈভববতাং তং গৌরমেব স্তুমঃ॥

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত

শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপাকটাক্ষরূপ বৈভবটি কেমন? তার কাছে কৈবল্য-সুখ অর্থাৎ মুক্তি সুখ নরকের মত ঘৃণ্য মনে হয়। নরক তো কেউ কামনা করে না—বরং ঘৃণা করে। গৌরভক্ত মুক্তিসুখ চায় না বটেই—তাকে নরকের মত ঘৃণা করে আর স্বর্গসুখকে মনে করে মিথ্যা আকাশকুসুম। ত্রিদশপূরাকাশ পুষ্পায়তে। ত্রিদশ বলতে দেবতাকে বুঝায়—কারণ তাদের তিনটি অবস্থা—বাল্য কৈশোর যৌবন—দেবতাদের বার্দ্ধক্য নেই তাই তাদের বলা হয় ত্রিদশ। তাঁদের পুরী অর্থাৎ স্বর্গলোক। এই স্বর্গলোকের সুখৈশ্বর্য যা পাবার জন্য লালায়িত হয়—তাকে গৌরভক্ত আকাশকুসুমের মত মিথ্যা বলে মনে করে। আকাশ এবং কুসুম দুটির বস্তুসত্তা আছে কিন্তু ঐ দুটি শব্দকে যখন এক করে দেওয়া হয় তখন তার কোন বস্তুসত্তা নেই। আকাশকুসুমের মালা গাঁথা যায় না। কারণ আকাশকুসুম বলে কোন বস্তু নেই—তাই তাকে হাতে পাওয়া যায় না—অর্থাৎ মিথ্যা। খাঁটি মিথ্যা বলে যে যেটিকে বুঝে নিয়েছে সেটি পাবার জন্য কারো লোভ হতে পারে না। গৌরভক্ত স্বর্গসুখকে মিথ্যা বলে বুঝে নিয়েছে কারণ স্বর্গসুখ যখন নশ্বর তখন মিথ্যা—তাই স্বর্গসুখ পাবার জন্য গৌরভক্তের লোভ হয় না। কারণ যা নশ্বর অনিত্য তা কখনও সত্য হতে পারে না। সত্য বস্তু হবে নিত্য। তবে যদি প্রশ্ন হয় গৌরভক্তের

যখন এত সম্পদ্, সে সংসার করে না? হ্যাঁ, গৌরভক্ত সংসার করে। সে স্ত্রী, পুত্র, ঘরবাড়ী, টাকাকড়ি, জমিজমা সব নিয়েই থাকে—কিন্তু তার সংসার—সাধারণ মানুষ যারা কর্মফলে গতাগতি করছে তাদের মত নয়। কারণ সাপুড়ে সাপখেলায়—মন্ত্র উচ্চারণ করে নিজের গা বেঁধে নিয়ে বন থেকে টাটকা বিষধর সাপ ধরে আনে—পরে সাপের বিষদাঁতগুলো উপড়ে ফেলে দেয়—তারপরে সেই সাপ নিয়ে খেলা দেখাতে বেরোয়। খেলা দেখাতে দেখাতে সাপটা কতবার সাপুড়ের হাতে ছোবল মারে—যারা দর্শক তারা দেখে ভয় পায়, ভাবে সাপুড়ে মরে যাবে নাকি? কিন্তু সাপুড়ে তো নিশ্চিন্ত। সে তো জানে সাপ যতই ছোবল মারুক সে তো বিষ ঢালতে পারবে না—কারণ বিষ দাঁত তো উপড়ে ফেলে দিয়েছি। এখানে তেমনি গৌরভক্ত সংসার করে—এ জগতের মানুষের ইন্দ্রিয় অনেকগুলো—এগুলো সব দুর্দ্দান্তেন্দ্রিয় কালসর্পপটলী—এই ইন্দ্রিয়বর্গের বিষদাঁতগুলো গৌরভক্ত উপড়ে ফেলে দিয়েছে। এখানে বিষদাঁত হল আসক্তি। গৌরভক্ত সংসার করে কিন্তু আসক্তিশূন্য হয়ে—তাই নিশ্চিন্তে বিষয়ভোগ করে তাতে জ্বালা নেই। বিষ ঢাললেই তো জ্বালা—সাপুড়ের হাতে ছোবল মারলেও যেমন বিষ ঢালতে পারে না—তেমনি গৌরভক্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে বিষয় গ্রহণ করলেও তাতে দংশন নেই জ্বালা নেই। কারণ বিষয় ভোগ করে যে চমৎকার বোধ তার নামই দংশন—এর থেকেই যন্ত্রণা—আর বিষয় ভোগ করেও যদি চমৎকার বোধ না থাকে—তাহলে তার কোন জ্বালা নেই। তাই গৌরভক্তের সংসার করা মানে সাপুড়ের সাপ খেলানো। এখন সাপুড়ের সাপ খেলানো দেখে যদি আমরা সাপ খেলাতে যাই তাহলে তো নিশ্চিত মৃত্যু। তেমনি গৌরভক্তের সংসার আর কর্মফলে যারা সংসার করছে—তাদের দুজনের মধ্যে অনেক তফাৎ। তাই গৌরভক্তের সর্ব্বদাই আনন্দ—বিশ্বং পূর্ণসুখায়তে—মহাজন এই সূত্র ধরেই বলেছেন—জীব বা মর বা সাধো। সাধুর বেঁচে থাকাও যা মরে যাওয়াও তাই—একই কথা—বেঁচে থাকলেও আনন্দ, মরে গেলেও আনন্দ—তাঁদের বাঁচা মরা দুইই সমান। এই গৌরভক্তের এমনই সম্পদ যে যে বিধি অর্থাৎ সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার পদ—মহেন্দ্র দেবরাজ ইন্দ্রের পদকে কীটের মত নগণ্য বোধ করে। কীটের জীবন তো কারও লোভনীয় হতে পারে না। তেমনি গৌরভক্ত

এমনই সম্পত্তির অধিকারী হয়েছে যে ব্রহ্মার পদ ইন্দ্রের পদকে তুচ্ছ বোধ করে। বেশী পেলে তো কেউ কম পাবার জন্য লোভ় করে না। তাহলে ভক্ত এমন এক সম্পদ পেয়ে আছে—এমন ধনে সে ধনী যে ব্রহ্মার পদ ইন্দ্রের পদকেও নগণ্য মনে করে। তাই শ্রীপ্রেমানন্দ দাসজী বললেন—

অজ ভব ভাবে যাঁরে কি মদে পাসর তারে
হরি ভুলি জিঁয় কোন্ কাজে?
হরিনাম যাতে নাই সে বদনে পড়ু ছাই
সে মুখ সে দেখায় কোন লাজে?
হরিনাম সুধাময় তাতে তোর রুচি নয়
সংসার নরক লাগে মিঠা।
নরতনু কেনে তা'ক শৃগাল কুক্কুর কাক
সেই ভাল বৃথা কাচ এটা।
দেখিয়া তোমার কাজ মনে হাসে ধর্মরাজ
জানো না ভাঙ্গিবে এ না ঠাট
প্রেমানন্দ কহে যদি কৃষ্ণ কহ নিরবধি
সংসার তরিবে করি নাট॥

আরও বলা আছে—কৃষ্ণনামই চিন্তামণি—কৃষ্ণপাদপদ্মে প্রেম—এইটিই হল বড় ধন—এই সম্পত্তি যার আছে সেই হল প্রকৃত ধনী—এই ধন চিরস্থায়ী, এর চেয়ে বড় ধন আর নেই। এই ধনের ব্যয় নেই, ক্ষয় নেই, বিনাশ নেই।

কৃষ্ণনাম চিন্তামণি হও সেই ধনের ধনী
ভরি লহ বদন কুঠরি।
খাও বিলাও নাহি ক্ষয় যম জিন যাক্ ভয়
ডঙ্কা পড়ক ত্রিভুবন ভরি।

এ জগতেও নিয়ম আছে—যে নিজে দরিদ্র সে অপরকে ধনী করতে পারে না। কিন্তু যে নিজে ধনী সে অপরকে ধনী করতে পারে। পরমার্থ জগতেও তাই। প্রেমধনে যে নিজে ধনী অর্থাৎ প্রেমিক ভক্ত সাধু গুরু বৈষ্ণব অপরকে অর্থাৎ দরিদ্র জীবকে ধনী করতে পারেন। কারণ শাস্ত্রের এই একটাই সিদ্ধান্ত প্রেমভক্তি লাভ—সাধু ভক্ত শ্রীগুরুপাদপদ্ম বৈষ্ণব

কৃপা ছাড়া কিছুতেই সম্ভব হয় না। শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রে ভক্তপ্রবর প্রহলাদজী, জড়ভরত সিদ্ধান্ত করেছেন—মহতের চরণরজে মস্তক অভিষিক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত ভক্তিলাভ হয় না। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ও বললেন—

সখীর অনুগা হইয়া প্রেমসেবা নিব চাইয়া
ইঙ্গিতে বুঝিব সব কাজে।

রাধাকৃষ্ণে প্রেমসেবাই বড় সম্পত্তি—এই সম্পত্তি যার আছে সেই শাস্ত্রের বিচারে ধনী বলে গণ্য—আর এই প্রেম সম্পদ যার নেই সে বড় দরিদ্র।

প্রেমধন নাই যার জগমাঝে সেই দরিদ্র।

শ্রীমন্মহাপ্রভু সম্পত্তির খবর নিচ্ছেন। শ্রীপাদ রামানন্দ রায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন বুঝে তাঁরই কৃপা পুষ্ট কণ্ঠে সিদ্ধান্ত করলেন—

রাধাকৃষ্ণে প্রেম যার সেই বড় ধনী।

(৪)

রসলোলুপ রসভেক্তা শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ং ভগবান শ্রীপাদ রামানন্দ রায়ের কাছে পরবর্ত্তী প্রশ্ন তুললেন—

'দুঃখ মধ্যে কোন দুঃখ হয় গুরুতর?
কৃষ্ণভক্ত বিরহ বিনা দুঃখ নাহি দেখি পর।'

শ্রীমহাপ্রভুর প্রশ্ন—কিং দুঃখম্? এ প্রশ্নটি ভগবানের সবচেয়ে প্রিয়বস্তু সম্বন্ধে প্রশ্ন। প্রশ্নটি ব্যাপক। কারণ ভগবৎ বস্তু থেকে আরম্ভ করে অতি ক্ষুদ্র কীট পর্য্যন্ত প্রত্যেকের দুঃখ হচ্ছে স্বাভাবিক। মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান—রামানন্দ বলছেন—

আকৃতে প্রকৃতে তোমার ঈশ্বর লক্ষণ।

রামানন্দ বললেন—

'মোর জিহ্বা বীণাযন্ত্র তুমি বীণাধারী।
তোমার মনে যেই উঠে তাহাই উচ্চারি॥
রায় কহে, আমি নষ্ট, তুমি সূত্রধার।
যেই মত নাচাও সে মত চাহি নাচিবার॥

চৈঃ চঃ মধ্যলীলা ৮ম পঃ

বীণাবাদকের মনের মধ্যে যে ভৈরবী, বেহাগ, গৌরী, পূরবী, ললিত, কেদার প্রভৃতি স্বরলহরী একটির পর একটি ওঠে, সেই স্বরলহরী তন্ত্রীতে

ফুটে ওঠে। তেমনি মহাপ্রভুর চিত্তে যে যে ভাব খেলছে—রামানন্দের স্বচ্ছ চিত্তদর্পণে তারই সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে। এই দুঃখ জীবের এবং ভগবানের—দুজনেরই। এখন প্রশ্ন হতে পারে ভগবান তো সকল সম্পত্তিমান সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ, তাঁর স্বরূপে তো কোন অভাব বা দারিদ্র নেই, তিনি স্বয়ং সম্পূর্ণ—এমনকি লক্ষ্মীঠাকুরাণীকেও তাঁর প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন নেই বলেই লক্ষ্মী সমুদ্র মন্থনের ফলে আবির্ভূতা হয়ে নারায়ণকে বরণ করেছিলেন। লক্ষ্মী ক্ষীরোদসাগর থেকে আবির্ভূতা হয়ে ভাবে ভাবে সকলের সঙ্গে কথা বললেন—ব্রহ্মা, বৃহস্পতি, শুক্রাচার্য্য প্রভৃতি জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ হয়ে সঙ্গরহিত নন। তাই লক্ষ্মী তাদের কাছে গেলেন না। আবার অনেকে আছেন যাঁরা অন্য গুণে গুণবান হলেও কালজয়ী নন। তাই লক্ষ্মী তাঁদেরও প্রত্যাখান করলেন। কিন্তু লক্ষ্মীকে পর্য্যন্ত যাঁর প্রয়োজন নেই সেই মুকুন্দকেই লক্ষ্মী বরণ করলেন। তাহলে দেখা যাচ্ছে ভগবান স্বয়ং সম্পূর্ণ—কিছুতেই তাঁর প্রয়োজন নেই এবং প্রয়োজন যখন নেই তখন অভাবও নেই। দুর্ব্বাসা ঋষি যখন সুদর্শন চক্র হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য বৈকুণ্ঠনাথের চরণে শরণাপন্ন হয়ে কাতরভাবে প্রার্থনা জানালেন তখন ভগবান বলেছিলেন—

নাহমাত্মানমাশাসে মদ্ভক্তৈঃ সাধুভির্বিনা।
শ্রিয়ঞ্চাত্যন্তিকীং ব্রহ্মন্! যেষাং গতিরহং পরা॥

ভাঃ ৯।৪।৬৪

ওগো মুনিবর, যে সব মানুষের আমিই পরাগতি, সেই সমস্ত সাধু ভক্তজন ছাড়া আমি নিজের আত্মাকে অথবা আত্যন্তিকী শ্রীকেও ভালবাসি না।

ভগবানের দুঃখের আর কোনও কারণ নেই। ভক্ত বিরহই তাঁর একান্ত দুঃখ। অন্যান্য ভগবান ভক্তবিরহে কাতর হয়েছেন এ খবর শাস্ত্রে পাওয়া যায় কিন্তু সবচেয়ে মিষ্টি ভগবান শ্রীগৌরসুন্দর যেমন মিষ্টি করে ভক্তবীর ঠাকুর হরিদাসের বিরহ বেদনা ভোগ করেছেন—এমনটি আর কোথাও দেখা যায় না। হরিদাস যখন নিজের মনের বাসনা শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণে নিবেদন করলেন—

প্রভু— হৃদয়ে ধরিব তোমার কমলচরণ
নয়নে হেরিব তোমার ও চাঁদবদন।

জিহ্বায় উচ্চারিব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম
এই মত ইচ্ছা মোর ছাড়িব পরাণ॥

হরিদাসের এ বাসনার কথা শুনে ভক্তবৎসল গৌরহরি বললেন—হরিদাস, কৃষ্ণ তো কৃপাময়, তাই তেমার মনোবাসনা তিনি অপূর্ণ রাখবেন না।

হরিদাস তুমি যা কিছু মাগিবে।
কৃষ্ণ কৃপাময় তাহা অবশ্য করিবে।

মহাপ্রভু, একটু ভঙ্গী করেই বললেন। কারণ তিনি নিজেই হরিদাসের বাসনা পূরণ করবেন এ কথা বললে বলতে পারতেন—কিন্তু তাতে কৃপার সৌরভ থাকে না। কিন্তু কৃষ্ণ বাসনা পূরণ করবেন এ কথা বলায় কৃপার সৌরভ বজায় থাকল। তা হলে কৃষ্ণ কৃপা করবেন কি করবেন না—এ কথা মহাপ্রভু জানলেন কি করে? মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান—সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য গোঁসাই—তাই তাঁর পক্ষে জানা কিছু অসম্ভব নয়। ধনী যদি নিজেকে ধনী বলে তাহলে ধনের সৌরভ থাকে না। ঠাকুর হরিদাসের মহানির্য্যাণে শ্রীমন্মাহাপ্রভুর যুগপৎ হর্ষ এবং বিষাদ। ভক্ত বিরহ ভগবান সহ্য করতে পারেন না। তাই হরিদাসের সমাধি রচনা ও মহামহোৎসবের পরে যখন মহাপ্রভু হরিদাসের গুণ গাইছেন তখন বলছেন—

হরিদাস ছিল পৃথিবীর শিরোমণি।
তাহা বিনা রত্নশূন্যা হইলা ধরণী।
হরিদাস ছেড়ে গেল প্রাণে বাঁচা ভার।
দিনে রাতে নাম শোনাত তিনলক্ষ বার॥

এ তো দুঃখ অনুভবের কথা। এ সিদ্ধান্ত তো ঠিক আছে—ভক্তবিরহ দুঃখ ভোগ করছেন—কিন্তু হরিদাসের দেহ যখন কাঁধে নিয়ে মহাপ্রভু নাচছেন—তখন তো দেখা যাচ্ছে পরম উল্লাস—আনন্দে নৃত্য করছেন আর তার সঙ্গে উচ্চৈস্বরে শ্রীনামসংকীর্ত্তন। ১০৮ শ্রীল শ্রীপাদ রামদাস বাবাজী মহারাজ আস্বাদন করেছেন—

এ যে বড় বিরুদ্ধ লাগে।

ভক্তপ্রবর হরিদাস চলে গেলেন তাতে মহাপ্রভুর এত আনন্দ কেন? তাঁর তো দুঃখ হবার কথা। তখন এ আনন্দ অনুভবের রহস্যটি বলছেন—মহাপ্রভুর আনন্দ এই কারণে—এখানে সাধ্যসাধন নির্ণয় হল। এর আগে

শ্রীপাদ নিত্যানন্দ মহাপ্রভু যখন কলিজীবের দুঃখে দরদী হয়ে পতিতের বন্ধু নিতাইচাঁদ মহাপ্রভুর কাছে আবেদন করেছিলেন—কলিজীব অশেষ দোষে দোষী, এটি সুসত্য। কিন্তু সেও তো তোমার সন্তান। তার কি উপায় হবে ভাই? সে তো অন্যযুগের জীবের মত সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর যুগের মানুষের মত কঠোর সাধন করতে পারবে না—অর্থাৎ সাধ্যবস্তু পেতে হলে কিছু তো সাধন করতেই হবে। তারা সাধন করবে অল্প কিন্তু পাওনার বেলায় তাদের কম দিলে হবে না। তখন মহাপ্রভু নিতাই চাঁদকে জিজ্ঞাসা করলেন—কলিজীবকে তুমি কি দিতে চাও শ্রীপাদ—কি দিলে তুমি সন্তুষ্ট হবে? এ জগতের রাজ্য বিষয়বৈভব যদি দিই, তুমি সুখী হবে? নিতাইচাঁদ বললেন—না, এ তো নশ্বর। মহাপ্রভু বললেন—তাহলে স্বর্গসুখ। মুক্তি, ব্রহ্মানন্দ, বৈকুণ্ঠনাথের পার্ষদগতি, এমন কি গোলাকাধীশ শ্রীগোবিন্দের—রাধাগোবিন্দের পাদপদ্মের সাক্ষাৎ সেবাসুখ যদি কলিজীবকে দিই তাহলে তো তুমি সন্তুষ্ট হবে? নিতাইচাঁদ বলছেন—না। মহাপ্রভু অবাক্ হয়ে বললেন—এর ওপরে আর কোন সম্পদ আছে বলে তো আমার জানা নেই শ্রীপাদ। তাহলে তুমি কলিজীবকে কি দিতে চাও? নিত্যানন্দ উত্তর দিলেন—তারা পাবে তোমার চরণ (মহাপ্রভুর চরণ) শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ বললেন—

অয়ের্ভ্রাতর্নৃণাং কলিকলুষিণাং কিন্নু ভবিতা।
তথা প্রায়শ্চিত্তং রচয় যদানয়াসত ইমে।
ব্রজন্তি ত্বামিত্থং সহ ভগবতা মন্ত্রয়তি যো
ভজেনিত্যানন্দং ভজনতরুকন্দং নিরবধি॥

এখন যারা যুক্তিবাদী তারা তো বিচার করবেন—রাধাগোবিন্দ মিলিত মূরতি শ্রীগৌরসুন্দর তাহলে রাধাগোবিন্দের পাদপদ্মের সেবাসুখ পাওয়াও যা গৌরচরণ পাওয়াও তো তাই—একই কথা। তাহলে নিত্যানন্দ এতে রাজী হলেন না কেন? এর ভিতরে কথা আছে—রাধাগোবিন্দ মিলিত মূরতি গৌর বটে, কিন্তু রাধাগোবিন্দ পাদপদ্ম সেবাসুখ আর গৌরপাদপদ্ম সেবাসুখ—একটু তফাৎ আছে। যেমন প্রাকৃত জগতের একটি দৃষ্টান্ত দিলে কথাটি সহজ হবে। ছানা এবং চিনি দিয়ে রাজভোগ তৈরী হয় রাজভোগের ভিতরে তো ছানা চিনি ছাড়া আর কোন উপাদান নেই—কিন্তু শুধু ছানাচিনির আস্বাদ এবং রাজভোগের আস্বাদে তফাৎ আছে—

ছানাচিনি মিশিয়ে যে রসের ভিয়ানে রাজভোগ তৈরী হয় তার আস্বাদ শুধু ছানাচিনির আস্বাদনের চেয়ে বেশী। গৌর হয়েছেন রাধাগোবিন্দের মিলিত স্বরূপ রসের ভিয়ানে প্রেম বৈচিত্ত্যদশার চরম পরিপাক—তাই গৌরস্বরূপে আস্বাদন বেশী। এখন নিতাইচাঁদের আবেদনে মহাপ্রভুর চরণ না হয় কলিজীব পাবে—কিন্তু তার জন্য সাধন কি করবে কলিজীব? সাধ্যবস্তু পেতে হলে সাধন তো কিছু করতে হবে। মহাপ্রভু রায় দিলেন—

'হর্ষে প্রভু কহে, শুন স্বরূপ রামরায়।
নামসংকীর্ত্তন কলৌ পরম উপায়॥'

শ্রীমন্মহাপ্রভু আনন্দ করে বলেছেন—এর জন্য সাধন হল কলিজীবের একমাত্র নামসংকীর্ত্তন। মহাপ্রভুর এত আনন্দ কেন? এ আনন্দের কারণ হল দুটি—প্রথমতঃ কলিজীবকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ দিতে পেরেছেন—আর দ্বিতীয়তঃ নিত্যানন্দ যিনি মহাপ্রভুর সবচেয়ে প্রিয়স্থান—তাঁর আবেদন পূরণ করতে পেরেছেন—এই দুই কারণে তাঁর এত আনন্দ। তাহলে সিদ্ধান্ত হল কলিজীব গৌর চরণ পাবে আর তার জন্য সাধন হল একমাত্র শ্রীনামসংকীর্ত্তন।

এখন কথা তো হল—সিদ্ধান্তও হল— কিন্তু মানুষ তো শুধু কথাতে ভোলে না—উদাহরণ দেখতে চায়—উদাহরণ দেখলে মন ভরে। এমন কি কোন দৃষ্টান্ত আছে যে শুধু নামসংকীর্ত্তন করে গৌর চরণ পেয়েছে তাহলে কলিজীবের ভরসা হয়—তারা নিশ্চিন্ত হয়ে নাম কীর্ত্তন করতে পারে গৌর চরণ পাবার আশায়। শ্রীপাদ বাবাজী মহারাজ অনুভব করে বললেন—ঠাকুর হরিদাসের মহানির্য্যাণ লীলা সেই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। নামাচার্য্য শ্রীহরিদাস ঠাকুর সারাটি জীবন হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র নাম তিন লক্ষ বার প্রতিদিন অপতিতভাবে উচ্চারণ করেছেন—ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেছেন। তিনি যখন দেহত্যাগ করলেন, তখন—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম করিতে উচ্চারণ।
নামের সহিত প্রাণ কৈল নিষ্ক্রামণ॥

এখানেই ঠাকুর হরিদাসের জীবনে সাধ্যসাধন নির্ণয় হল—

হরেকৃষ্ণ নাম সাধন বলে।
প্রাণ যায় গৌরাঙ্গ বলে॥

তাহলে এখানে সাধ্য হল শ্রীগৌর চরণ আর সাধন হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র নাম। যিনি গৌর চরণ পেতে চান—তাঁকে সারাজীবন হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র নাম সাধন করতে হবে। তাই এই সাধ্যসাধন নির্ণয় হল দেখে মহাপ্রভুর এত আনন্দ।

ভক্ত বিরহ ভগবান সহ্য করতে পারেন না। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর যে প্রশ্ন—কিং দুঃখম্? তার উত্তরে শ্রীপাদ রামানন্দ রায় বললেন—'ভগবৎ প্রিয়স্য বিরহো নোহৃদ্ব্রণাদিব্যথা।' ভগবৎ প্রিয়জন অর্থাৎ ভক্তের বিরহই দুঃখ, হৃদয়ের ব্রণাদির জন্য যে বাথা সেটি দুঃখ নয়। হরিদাসের বাসনা পূরণে ভক্তের বাসনা পূরণ হবে—তাই মহাপ্রভুর আনন্দ। ভগবানের দিক দিয়ে দেখলে দেখা যায় ভক্ত বিরহই ভগবানের দুঃখ। আর যদি সাধকের দিক দিয়ে দেখা যায় তাহলেও দেখা যায় ঐ একই দুঃখ। মানুষের দুঃখ কখন হয়? সবচেয়ে প্রিয় এবং সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বস্তুর বিনাশে দুঃখ হয়। মানুষ দেহের অন্ন বস্ত্র অলঙ্কার প্রভৃতির সংস্থান করে কিন্তু যুগ যুগান্তর হতে উপবাসী আত্মাকে এক কণা খাদ্য ও উলঙ্গ আত্মাকে একখানা বস্ত্র, নিরাভরণ আত্মাকে একখানি অলঙ্কার পরাতে পারে না। সে সামর্থ্য জীবের নেই। জীব (মানুষ) দেহের অভাব পূরণ করে বটে, কিন্তু আত্মার অভাব পূরণ করতে পারে না। আর আত্মার অভাবই যদি পূরণ না হয়, তাহলে দেহের অভাব পূরণ করে আর কি হবে? কারণ আত্মাকে রাখবার জন্যই তো দেহের প্রয়োজন। যেমন শ্রীবিগ্রহ রাখবার জন্যই তো মন্দিরের প্রয়োজন। দেহ হল মন্দির আর আত্মা হলেন শ্রীবিগ্রহ। তাহলে দেখা যাচ্ছে আত্মার খাদ্য, বসন, অলঙ্কার—এইগুলিই আমাদের সকলের চেয়ে বেশী প্রয়োজনীয়। আত্মার খাদ্য হল হরিগুণকীর্ত্তন। আচার্য্য শঙ্কর বলেছেন—হরিগুণকীর্ত্তনং হি আত্মনো ঘাসঃ। আত্মার বসন হল কৃষ্ণানুরাগ। আর অলঙ্কার হল অষ্টসাত্ত্বিক ভাববিকার। যেখানে সেখানে তো এসব পাওয়া যায় না। শ্রীগুরুকৃপার ঘরে এসব তৈরী হয়। শ্রীগুরু বৈষ্ণবই হলেন এ সকলের দাতা। তাই তিনিই আমাদের সকলের চেয়ে প্রয়োজনীয়। দেহকে খাওয়ানো পরানো অথবা অলঙ্কার দিয়ে সাজানো আর ভূতকে খাওয়ানো পরানো সাজানো একই কথা। এখন এই ভূত এল কোথা থেকে? অপরাধ হলে ভূতে ধরে। এটি লৌকিক জগতেও দেখা যায়। অনাদিকালের

কৃষ্ণবিমুখতারূপ অপরাধের ফলে জীবকে মায়াভূতে ধরেছে। শ্রীকবি যোগীন্দ্র বলেছেন—

ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্ময়য়াতো বুধ আভজেত্তং ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা॥

ভাঃ ১১।২।৩৫

যোগীন্দ্র শ্রীকবি মহারাজ নিমিকে বলছেন—মহারাজ। অজ্ঞানের ফলে যে ভয় উঠেছে তার নিবৃত্তি হবে জ্ঞানের দ্বারা। তাই মনে হতে পারে পরমেশ্বরের ভজনের প্রয়োজন নেই। এরকম আশঙ্কা করবেন না। কারণ অনাদি কাল হতে ভগবানের পাদপদ্মে বিমুখতার ফলে জীবের ওপর মায়ার আক্রমণ হয়েছে—

কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুখ॥

মায়া জীবকে এই সূত্রে আক্রমণ করেছে। ভগবানকে ভুলে যাওয়া জীবের একটি বড় অপরাধ। তাই মায়া দণ্ড দিয়েছে—দুটি কড়া চাবুক—প্রথম অস্মৃতি পরে বিপর্য্যয়। জীব যখন ভগবানকে ভুলেছে তখনও তার স্বরূপ জ্ঞান লোপ পায় নি। অর্থাৎ সে জানে যে সে নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বরূপ। তার জন্ম মৃত্যু, ক্ষুধা, পিপাসা, রোগ শোক, ভয় মোহ এসব কিছু নেই—এর নামই আত্মজ্ঞান বা স্বরূপজ্ঞান। কিন্তু মায়া দেখল জীবের যতক্ষণ এই স্বরূপস্মৃতি থাকবে ততক্ষণ সে তার কবলিত হবে না। তাই জীবকে মায়া আক্রমণ করে প্রথমেই এই স্বরূপ জ্ঞানটি ভুলিয়ে দিল—এরই নাম অস্মৃতি। এর পরে বিপর্য্যয়—অর্থাৎ দেহ এবং দৈহিক বস্তু ইন্দ্রিয়, মন বুদ্ধি জীবকে গছিয়ে দিল—শুধু দিল তাই নয়, দেহতে আমি বুদ্ধি এবং দৈহিক বস্তুতে আমার বুদ্ধি করিয়ে আত্মাকে ভাল করে বাঁধল। এই দেহ দৈহিক স্মৃতির নামই বিপর্য্যয়। এখন জীবন সম্পূর্ণভাবে মায়ার কবলিত হল। জীব দেহকে আমি অর্থাৎ আত্মা থেকে আলাদা করে ভাবতে পারে না—সুতরাং দৈহিক বস্তুকে আমার বলে ভাবে। দেহ সম্পর্ক যেখানে যেখানে—সেখানে সেখানেই আমার বোধ। এই আমি আমার বোধের নামই সংসার—এর নামই দুঃখ। আমি আমার বোধ না থাকলে তো কোন দুঃখ নেই। প্রহ্লাদজী বললেন—যেখানে যেখানে মমতা সেখানে সেখানে শলাকা। শাস্ত্র তাই সংসারের লক্ষণ করলেন—

'অপূর্ব্বদেহেন্দ্রিয়সংযোগ এব সংসারঃ।' বিবাহ করে স্ত্রী পুত্র নিয়ে বসবাস এর নাম সংসার নয়। ভগবানও উদ্ধবজীর কাছে বলেছেন—দেহেতে অহং বুদ্ধি এর নামই মূর্খতা। এই মূর্খতাতেই জগৎ ভরা। এর নামই অজ্ঞানতা। দেহ থেকে আত্মাকে আলাদা বুদ্ধি করতে না পারায় জীব ভয় পায়। দ্বিতীয় বস্তু অর্থাৎ আত্মা অতিরিক্ত বস্তু দেহেতে অভিনিবেশের ফলেই ভয়ের উৎপত্তি, এই ভয় অন্য কোনও জ্ঞানে যাবে না—এমনকি জীবের যে স্বরূপ স্মৃতি, সে নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বরূপ—এ জ্ঞান লাভ হলেও ভয় যাবে না। ভগবৎ বিমুখতার ফলে মায়ার আক্রমণে স্বরূপ স্মৃতি লোপ হয়েছে—তাই স্বরূপ স্মৃতি ফিরে পেলেও মায়া ছাড়বে না। ফিরে পেতে হবে ভগবদ্‌জ্ঞান। ভগবানে বিমুখতার ফলে মায়ার আক্রমণ—কাজেই ভগবানে উন্মুখতা জাগলে তবে মায়া ছাড়বে। ভগবানকে ভুলে যাওয়ার ফলে মায়ার আক্রমণ—তাই ভগবানকে মনে পড়লে তবে মায়া ছাড়বে। নিদান ধরে তো চিকিৎসা করতে হবে। ভগবানকে ভুলে যদি জীবের এত দুঃখ হয়—ভগবানকে মনে করলে আর দুঃখ নেই। অনাদিকৃষ্ণবিমুখ জীবকে ভগবানকে মনে পড়াবে কে? এমন বন্ধু কে আছে? যোগীন্দ্র বললেন—গুরুদেবতাত্মা—গুরুস্বরূপকে যদি দেবতা অর্থাৎ ভগবৎবুদ্ধি করা যায় এবং আত্মবুদ্ধি অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ (প্রিয়তম) বুদ্ধি করা যায় তাহলে তিনি কৃপা করে শুদ্ধাভক্তি দান করলে সেই ভক্তি দিয়ে ভগবানকে ভজলে তবে মায়ার হাত হতে নিষ্কৃতি। এখন গুরু স্বরূপকে দেবতা এবং প্রিয়তম বুদ্ধি কি ভাবে করা যাবে? গুরুদেবকে ভগবৎবুদ্ধি করতে তো কোন আপত্তি নেই—কারণ শাস্ত্র প্রমাণ ভগবানের বাক্য প্রমাণ—'আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ—' আচার্য্য গুরু স্বরূপকে আমি বলে জানবে উদ্ধব—ভগবান শ্রীগোবিন্দজী বললেন। গুরু কৃষ্ণ অভিন্ন—শাস্ত্রের প্রমাণ। মহাজনও বললেন—শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদের শ্রীমুখের উক্তি—

সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্ত শাস্ত্রৈরুক্ত
স্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।

শ্রীগুরুস্বরূপকে সাক্ষাৎ হরি বলে জানবে—শাস্ত্রের এই মত এবং ভক্ত মহাজনগণও এইভাবেই ভাবনা করেন। তাহলে এই প্রমাণে না হয় শ্রীগুরুদেবকে ভগবান বলে বোধ হল, কিন্তু গুরুদেব প্রিয়তম হবেন কোন

বিচারে? প্রিয়তা তো রয়েছে আমাদের দৈহিক বস্তুতে। দেহকে আমরা ভালবাসি এবং এই দেহ সম্পর্ক নিয়ে দৈহিক বস্তুতে আমাদের প্রিয়তা বুদ্ধি। তাহলে দৈহিক বস্তুর চেয়ে দেহ বেশী প্রিয় এটি স্বীকার করতে হবে। এখন দেহ যদি এত প্রিয় হয় তাহলে যে আত্মা দেহেতে থাকলে দেহ সচল থাকে—সেই আত্মা দেহের চেয়ে বেশী প্রিয় হবে। তাহলে আত্মাই প্রিয়তম হোক—গুরুদেব প্রিয়তম হবেন কেন? এ প্রশ্ন হতে পারে। আত্মা প্রিয় বটে কিন্তু পরমাত্মা যতক্ষণ পাশে আছেন ততক্ষণ আত্মা থাকেন—পরমাত্মা যেই চলে যান আত্মা আর একক্ষণও থাকবে না—তাই আত্মার চেয়ে পরমাত্মা বেশী প্রিয় এটি স্বীকার করতে হবে। পরমাত্মা যদি এত প্রিয় হন তাহলে পরমাত্মার চেয়ে তত্ত্বে ভগবৎ স্বরূপের উৎকর্ষ—তাহলে ভগবান পরমাত্মার চেয়ে বেশী প্রিয়। তাহলে ভগবানই প্রিয়তম হোন্—গুরুদেব প্রিয়তম হবেন কেন? গুরুদেব প্রিয়তম হবেন বিচারে—বিবাদে নন্। কারণ এই ভগবানের পাদপদ্মে জীবকে পৌঁছে দিতে পারেন শ্রীগুরুদেব—গুরুদেবই ভগবানকে পাইয়ে দিতে পারেন তাই শ্রীগুরুদেবই জীবের প্রিয়তম (শ্রেষ্ঠ)। শ্রীগুরুদেবই ভজন উপদেশ দান করেন, শ্রীগুরুকৃপাতেই শুদ্ধাভক্তি লাভ। এই শুদ্ধাভক্তির দ্বারা ভগবানের আরাধনা করলে তবে মায়ার হাত থেকে নিষ্কৃতি—তবে জীবের দুঃখ নিবারণ। তাই যোগীন্দ্র বললেন—বুদ্ধিমান ব্যক্তি শুদ্ধাভক্তির দ্বারা পরমেশ্বরের আরাধনা করবে—তাতেই মায়ার দেওয়া দুঃখের হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভ করবে। এ তো গেল অন্বয়মুখে। ব্যতিরেক মুখেও দেখা যায় কৃষ্ণপাদপদ্মে পেলে আর কিছু ভাল লাগে না। ভগবান বললেন—

যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ। গীঃ ৬।২২

আমার অনুভূতি নেই তাই দুঃখ হয় না। আমার শ্রীগুরুমহারাজ ১০৮ শ্রীল শ্রীপাদ রামদাস বাবাজী মহারাজ—তাঁর হৃদয়ের মর্মস্থিত অনুভূতির বাণী কীর্ত্তনের মাধ্যমে ধরে দিয়েছেন—পাঁজর পুড়ে ঝাঁঝর হল, কারে বা দেখাব বল? কারে বলব দুখের কথা—কে বা বুঝবে?

শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রে শ্রীএকাদশ স্কন্ধে উদ্ধবজী ভগবানকে প্রশ্ন করেছেন—দান স্বর্গ নরক প্রভৃতি কাকে বলে? তার উত্তরে ভগবান বললেন—দণ্ডন্যামঃ পরং দানম্।' সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি স্বর্গ এবং রজঃ

তমোগুণের বৃদ্ধিই নরক। অপরাধীকে দণ্ড দেওয়ার সামর্থ্য থাকলেও যে দণ্ড দেয় না এরই নাম দান। এই ভক্তই দান করতে পারে—ভক্ত কৃপা করে অপরাধী জীবকে ভক্তিদান করেন—তার অপরাধ গণনা না করে তাকে কৃপা করেন। তাই এই ভক্তের কাছে ভগবানও পরাজয় স্বীকার করেন। ব্রহ্মা শ্রীদশমে স্তুতি প্রসঙ্গে বলেছেন—'হে অজিত, তুমি কারো দ্বারা জিত না হলেও ভক্তের কাছে পরাজিত হও। ভক্ত তোমাকে জয় করে শুধু নয়, কায়মনোবাক্যে জয় করে। এ জয় অন্য কিছু দিয়ে নয়। শুদ্ধাভক্তি দিয়েই ভক্ত ভগবানকে জয় করে। ভক্ত শরীর দিয়ে মন দিয়ে বাক্য দিয়ে ভগবানকে জয় করে। ভগবান তার শরীর নিয়ে ভক্তের কাছে কাছে থাকেন। ভগবানের বাক্য ভক্তের গুণগান ছাড়া আর কিছু করে না—আর ভগবান তার মনটিকে ভক্তের কাছে দিয়ে রাখেন। তাই ভক্ত ভগবানের বড় প্রিয়। এই ভক্তের বিরহই ভগবানের সবচেয়ে বড় দুঃখ। শ্রীমন্মহাপ্রভুর যে প্রশ্ন কিং দুঃখম্—তার উত্তরে মহাপ্রভুর মন বুঝে রামানন্দ উত্তর দিলেন—ভক্তের বিরহের উপরে আর কোন দুঃখ নেই।

ভক্তপ্রবর শ্রীপাদ রামানন্দের শ্রীমুখে লক্ষণ শুনে মহাপ্রভুর বড় ভাল লেগেছে—তাই আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে বললেন—'ভদ্রম্।' ভাল বলেছ রামানন্দ—এর পরে আর একটি প্রশ্ন।

(৫)

প্রভু কহে, 'মুক্ত মধ্যে কোন জীব মুক্ত করি মানি?'
রায় কহে, 'কৃষ্ণপ্রেম যাঁর সেই মুক্তশিরোমণি॥'

অশেষ বিশেষে রসভোক্তা শ্রীগৌরসুন্দর আজ রসভাণ্ডার খুলে বসেছেন। নিজে ভোগ করছেন পরিপাটি করে আর সেই ভোগের মাধ্যমে জগৎকে দান করছেন অকৃপণ ভাবে। অদ্বৈত আচার্য্য প্রভু মহাবিষ্ণু অবতার জগৎকর্ত্তা মহাপ্রভুকে বলেছেন—প্রভু, তুমি তো প্রাণভরে প্রেমামৃত অঞ্জলিভরে পান করছ আর আমরা তোমার চরণতলে বসেছি—তোমার সে প্রেমামৃত পানকালে তোমার আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে যে ফোঁটা ফোঁটা গড়িয়ে পড়ছে—তাই আস্বাদন করে আমরা ভরপুর হয়ে যাচ্ছি।

তা না হলে মুক্তেরও অগম্য—মুক্ত পুরুষও যাঁকে বুদ্ধি দিয়ে, বাক্য দিয়ে মন দিয়ে স্পর্শ করতে পারে না—শ্রুতি যাঁর সম্বন্ধে নীরব। 'যতো

বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ'—বাক্য মন যাঁকে বুঝতে না পেরে ফিরে আসে—তর্কের দ্বারা যাকে লাভ করা যায় না—'নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া—সেই মুক্তেরও অগম্য স্বয়ং ভগবান শ্রীগৌরসুন্দর আজ মুক্তের সংবাদ জানতে চাইছেন—বলত রামানন্দ—'মুক্ত মধ্যে কোন জীব মুক্ত করি মানি?' এটি কৃপা ছাড়া আর কি হতে পারে?

রামানন্দ মহাপ্রভুর মন বুঝে উত্তর দিলেন—'প্রভু কৃষ্ণপ্রেম যাঁর সেই মুক্তশিরোমণি।'

মুক্ত বলতে বুঝায় যারা মুক্তি লাভ করেছে—এখন এই মুক্তির লক্ষণ সব আস্তিক দর্শনের মতে একটিই—অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যু নিরোধ—এর নামই মুক্তি। দেহধারণ করে আর আসতে হবে না—সুতরাং দেহ ত্যাগ করে আর যেতেও হবে না। জন্ম মৃত্যু যাদের বন্ধ হয়ে গেছে তাদেরই বলা হয় মুক্ত। কিন্তু এ তো সাধারণ অন্য দর্শনের মতে। কিন্তু মহাপ্রভুর হার্দ্দ্য তো তা নয়। তাই রামানন্দ মহাপ্রভুর মন বুঝে মুক্তের লক্ষণ করলেন—

রায় কহে, 'কৃষ্ণপ্রেম যাঁর সেই মুক্তশিরোমণি।'

কৃষ্ণপাদপদ্মে যার প্রেমলাভ হয়েছে সেই হল প্রকৃতপক্ষে মুক্ত। কারণ মায়ামুক্তির এইটিই খাঁটি পরিচয় যাতে জীবের নিজের স্বরূপটি ফুটবে। জীবের স্বরূপ হয় নিত্য কৃষ্ণদাস—এই স্বরূপানুভূতি না হওয়া পর্য্যন্ত জীব খাঁটি মুক্ত হতে পারছে না। শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রে তাই মুক্তির লক্ষণ করা আছে—'মুক্তির্হিত্বাঽন্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ।' মুক্তি তাকেই বলা হবে যখন জীব অন্যথারূপকে ত্যাগ করে নিজের স্বরূপে ফিরে আসবে। এখন এই অন্যথারূপ বলতে কি বুঝায়—বিষয়রাগে চিত্ত লুব্ধ হওয়ার নামই অন্যথারূপ—ভগবানকে ছেড়ে অন্যত্র যে আসক্তি তার নামই অন্যথারূপ। তাই রামানন্দ বললেন—কৃষ্ণপ্রেম যাঁর সেই মুক্ত শিরোমণি; তার বিষয়ে আসক্তি তো থাকেই না—শ্রীহরিচরণে গভীর অনুরাগের ফলে ভক্তিতেই তাদের চিত্ত আসক্ত। শ্রীহরির প্রেমাতিশায়ী ভক্তিযোগেই যাদের একান্ত প্রীতি কিন্তু ধ্যান, ধারণা ন্যাস, প্রাণায়ামে যাদের প্রীতি নেই। আর এই দেহতে অর্থাৎ পিতৃদত্ত বীজ মাতৃজঠরে উপ্ত হয়ে দশমাস দশদিন পরে রক্তরসে পুষ্ট হয়ে যে দেহের জন্ম দেয় সেই দেহে যাদের আদর নেই, কিন্তু শ্রীগুরুদেবের দেওয়া যে মন্ত্রবীজ

যা আমাদের চিত্তভূমিতে উপ্ত হলে শ্রবণকীর্ত্তনাদিরূপ রসরক্তের দ্বারা পুষ্ট হয়ে পরিণতকালে যে সিদ্ধদেহের জন্ম হবে সেই দেহতেই যাদের আদর তখন সেই সিদ্ধদেহ লাভ হলে আর এ দেহের প্রয়োজন নেই—তাই এই প্রাকৃত পাঞ্চভৌতিক দেহে অনাদর—এই সব ব্যবহার যাদের দেখা যায় তারাই প্রকৃত পক্ষে মুক্ত। কারণ এই মুক্তিতে জীবের স্বরূপানুভূতি হচ্ছে—জীব নিত্য কৃষ্ণদাস—এ স্বরূপটি ফুটছে—ফলে দাসের কাজ যে প্রভুর পাদপদ্মে অকপটে সেবা—সেই সেবাসুখ পাচ্ছে। কিন্তু জন্ম-মৃত্যু নিরোধরূপ যে মুক্তি তাতে জীব নিত্য কৃষ্ণদাস—এ স্বরূপ উপলব্ধি হচ্ছে না—যার ফলে সে প্রভুর পাদপদ্মে সেবাসুখও পাচ্ছে না। কারণ দাসই তো প্রভুর সেবা করবে। তাই জন্মমৃত্যুনিরোধরূপ মুক্তিতে এই ত্রুটি থেকে গেল—যেজন্য ভক্ত এই জন্মমৃত্যুনিরোধরূপ মুক্তি চায় না তো বটেই বরং এ মুক্তিকে ঘৃণা করে। সংসারবন্ধন ছিন্ন করে যারা ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়েছে ভক্তিদর্শন তাকে খাঁটি মুক্ত বলেন না। কারণ জীবের পক্ষে প্রভুর পাদপদ্মে সেবাই হল প্রাপ্তি—ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হলেও তাতে সেবাসুখ না পাওয়ায় ত্রুটি থাকল।

ভক্ত তাই প্রার্থনা করে—প্রভু জন্মমৃত্যু নিরোধ চাই না—আমার জন্ম হোক্ সুতরাং মৃত্যু তো হবেই—কিন্তু যে কদিন দেহে থাকি তোমার পাদপদ্ম যেন ভজতে পারি।

আসিব যাইব চরণ সেবিব
তুমি আর নিত্যানন্দ বিহরিবে যথা—
এই করো জন্মে জন্মে ভৃত্য হই তথা।

সব ভক্তের প্রার্থনার একই সুর—ধ্রুব, প্রহ্লাদ, ব্রহ্মা উদ্ধব, মহারাজ অম্বরীষ, সনকাদি ঋষি, নকুলদেব, ভক্তবীর শ্রীহনূমানজী সকলেই জন্ম চেয়েছেন। এমনকি স্বয়ং ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরও ভক্তকক্ষায় দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করলেন—

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাৎ ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥ শ্রীশিক্ষাষ্টক

আমি ধন জন কবিতা সুন্দরী কিছু চাই না—কিন্তু হে জগদীশ্বর, তোমার চরণে যেন আমার জন্মে জন্মে অহৈতুকী ভক্তি লাভ হয়। স্বয়ং ভগবান আবার কার চরণে ভক্তি চাইবেন? ভগবানের তো এ প্রার্থনা

হতে পারে না। কিন্তু মহাপ্রভু তো শুধু ভগবান নন। তিনি তো ভক্তভাব অঙ্গীকার করে এসেছেন—

রাধাভাব কান্তি ধরি রাধাপ্রেম গুরু করি
নদীয়াতে করল উদয়।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপে তাই ভক্ত ভগবানের মহামিলন। এখানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর এ প্রার্থনা ভগবানের কক্ষায় দাঁড়িয়ে নয়—কিন্তু ভক্ত-কক্ষায় দাঁড়িয়ে। কারণ শ্রীগৌরসুন্দর অশেষবিশেষে রসভোক্তা—ভক্ত কি করে ভগবানের চরণে প্রার্থনা করে সেইটি নিজে আস্বাদন করছেন। অথবা শিক্ষাষ্টকের মন্ত্রে শিক্ষা দিচ্ছেন কলিজীবকে। আমরা তো প্রভুর চরণে প্রার্থনা করতে জানি না। মহাপ্রভু নিজে প্রার্থনা করে শিক্ষা দিচ্ছেন যে কি করে ভগবানের চরণে প্রার্থনা করতে হয়।

এখন কথা হল ভক্ত তো মুক্তি চায় না কিন্তু ভক্ত কি মুক্তি পাবে না? তার উত্তরে বলা যায়—ভক্ত তো মুক্তি অনায়াসে পাবে। শাস্ত্র একটি উপমা দিয়েছেন—'নগরীং গচ্ছন্ গ্রামং পশ্যতি ইতি বৎ।' একজন মানুষ নগরে যাচ্ছে—কিন্তু যে পথ দিয়ে যাচ্ছে সেই পথের দুই পাশে যত গ্রাম আছে সে গ্রাম তো তার অনায়াসে দেখা হয়ে যাবেই। কিন্তু ঐ গ্রাম দেখা তার উদ্দেশ্য নয়—তার উদ্দেশ্য নগরে যাওয়া। তেমনি ভক্ত ভগবানের পাদপদ্মে প্রেমসেবা পেতে যাচ্ছে—তার পথে পড়ে আছে পঞ্চবিধামুক্তি, অষ্টসিদ্ধি নবনিধি। তাই ভগবানকে বলা হয় মুক্তিপদ। মহাজন বলেছেন—

অষ্টসিদ্ধি নবনিধি যে আছে
ভুক্তি মুক্তি পড়ি রহিবে নাছে

তার নাছ দুয়ারে গড়াগড়ি যাবে—আমায় গ্রহণ কর কর বলে—তারা নাছ দুয়ারে গড়াগড়ি যাবে—কিন্তু গৌররসে যার মন মজেছে—সে ফিরেও তো চাইবে না রে। কৃষ্ণপ্রেম যে লাভ করেছে সে ভগবানের পাদপদ্মে পৌঁছেছে সেই প্রেমসেবাই তার লক্ষ্য—কিন্তু পথে যে পড়ে আছে ভুক্তি মুক্তি, সিদ্ধি নিধি—সে তো তার অনায়াসে পাওয়া হয়েই যাবে—কিন্তু সেটি পাওয়ার জন্য তার কোন চেষ্টাই থাকবে না—তার লক্ষ্য থাকবে শুধু প্রেমসেবা পাওয়ার, কারণ ভগবানের পাদপদ্মে যে প্রেমসুখ পাবে—তার তো মায়ামুক্তি অনায়াসে হয়েই যাবে—কারণ

মায়াকে সঙ্গে নিয়ে তো কেউ ভগবানের কাছে যেতে পারে না। যেমন সূর্য্যের কাছে যে যাবে—সে যেমন অন্ধকারের পুঁটলি সঙ্গে নিয়ে যেতে পারে না। এও তেমনি। সূর্য্য যেমন অন্ধকারকে নিজের কাছ থেকে বহুদূরে সরিয়ে রাখে—ভগবানও তেমনি নিজের তেজঃ প্রভাতে মায়া কুহক অন্ধকারকে বহুদূরে সরিয়ে রাখেন। আচার্য্য বেদব্যাস প্রথমেই বললেন—

"ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি।"

ভাঃ ১।১।১

ভক্তের দৃষ্টি থাকবে শুধু প্রেমসেবা পাওয়ার—মায়ামুক্তি তো তার অনায়াস লভ্য। তাই কৃষ্ণপ্রেম যার সেই ভক্তই হল খাঁটি মুক্ত। তাহলে যাঁরা জন্মমৃত্যু নিরোধরূপ মুক্তিলাভ করেছেন—তাঁদের অবস্থা কেমন? দেবতারা গর্ভস্তুতিতে বললেন—'যেহন্যেরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনঃ........ কবিরাজ গোস্বামিপাদ বললেন—

জ্ঞানী জ্ঞানে মুক্তদশা পাইনু করি মানে।
বস্তুতঃ চিত্তশুদ্ধি নহে কৃষ্ণভক্তিবিনে॥

মুক্তের মুক্তিতেও খাঁটি চিত্তশুদ্ধি হচ্ছে না—তারা মুক্তি পেয়েছে বলে মনে করে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণপ্রেম ছাড়া খাঁটি চিত্তশুদ্ধি হয় না। তাই মহাপ্রভুর মন বুঝে রামানন্দ গৌরসুন্দরের প্রশ্নের উত্তরে বললেন—

প্রভু কহে, 'মুক্ত মধ্যে কোন জীব মুক্ত করি মানি?'
রায় কহে, 'কৃষ্ণপ্রেম যাঁর সেই মুক্তশিরোমণি॥'

(৬)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাসিঞ্চিত রামানন্দ এই বাণী প্রচার করলেন—এতে মহাপ্রভু সন্তুষ্ট হয়ে বললেন—'আচ্ছা রামানন্দ, ঠিক হয়েছে। এখন বলত—কিং গেয়ম্? অর্থাৎ কোনটি গান করা উচিত? গান তো কত রকমের আছে। তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ গান কোনটি? এইটিই রামানন্দমুখে প্রচার করানই মহাপ্রভুর অভিপ্রায়।

প্রভু কহে, 'গান মধ্যে কোন গান জীবের নিজ ধর্ম?'
রায় কহে, 'রাধাকৃষ্ণের প্রেমকেলি যেই গীতের মর্ম।'

মহাপ্রভুর প্রশ্ন—কোন গান জীবের নিজের ধর্ম? মানুষ কি গান করবে? মহাপ্রভুর মনোবৃত্তিই রামানন্দ রায়ে সঞ্চারিত হল। তিনি কৃপাপুষ্ট কণ্ঠে

উত্তর দিলেন—'ব্রজকেলি কর্ম এব গেয়ম্।' ব্রজলীলাকথা গানই গান। অন্য যে কোন গান অসম্পূর্ণ সুতরাং ব্যর্থ। কারণ ভজনশীল মানুষের শেষ পরমার্থ হল ব্রজলীলার আস্বাদ। এইটিই শ্রেষ্ঠ সাধন। কিন্তু ব্রজলীলারসের ভাণ্ডারী হচ্ছেন শ্রীশ্যামসুন্দর ও শ্রীমতী রাধাঠাকুরাণী। ভাণ্ডারীর কাছেই তো ধনের খবর নিতে হবে। তা না হলে সাধারণে এ ধন পাবে কোথায়? ব্রজলীলারসে ভাণ্ডারীর নিজেরও এত লোভ যে তারা দুজনে যখন মিলিত হয়ে নদীয়াধামে গৌররূপে প্রকটিত তখনও তাদের লোভ যায় নি। ব্রজলীলা আস্বাদনের জন্য গোদাবরী তীরে রামানন্দ রায়ের সামনে তিনি উপস্থিত। রস পাওয়ার লোভে লোভে এতদূর ছুটে এসেছেন। শ্রীগোবিন্দের লীলাকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। দ্বারকালীলা পূর্ণ, মথুরালীলা পূর্ণতর এবং ব্রজলীলা পূর্ণতম। দ্বারকা বা মথুরা লীলা গেয় নয়—কিন্তু ব্রজলীলাই গেয়—অর্থাৎ গান করার যোগ্য। ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দ্বারকা, মথুরা এবং বৃন্দাবন তিন জায়গাতেই লীলা করেছেন—কিন্তু তার মধ্যে ব্রজেই ভগবানের মাধুর্য্যের সবচেয়ে বেশী প্রকাশ—স্বয়ং ভগবানের পূর্ণতম প্রকাশ। কারণ মাধুর্য্যের সর্ব্বাপেক্ষা আধিক্য। দ্বারকা বা মথুরায় ভগবানের মাধুর্য্য যে একেবারে নেই তা বলা যাবে না—কারণ মাধুর্য্য তাঁর স্বরূপের একটি গুণ। বিশেষ করে শ্রীগোবিন্দ লীলাপুরুষোত্তম। ভগবানের সব গুণই সব সময় আছে কিন্তু কোনও গুণের প্রকাশ কোনও সময়ে বেশী। দ্বারকা ও মথুরাধামে ভগবানের সর্ব্বশক্তিমত্তার হানি হয় নি—কাজেই সেখানেও মাধুর্য্যগুণটি প্রকট। কিন্তু সেখানে ঐশ্বর্য্যশক্তির প্রকাশ এত বেশী যে তার চাপে মাধুর্য্য ঢাকা পড়ে গেছে। দ্বারকায় চতুর্ভুজ ভগবান ঐশ্বর্য্য মূর্ত্তিতে প্রকট—কিন্তু ব্রজে তিনি চতুর্ভুজ নন—কারণ এখানে মাধুর্য্যের প্রাধান্য তাই ঐশ্বর্য্য চাপা পড়ে গেছে। মাধুর্য্যের মূর্ত্তি হলেন দ্বিভুজ—তাই ভগবান ব্রজে চতুর্ভুজ প্রকাশ করতে পারেন নি। বৃন্দাবনে সখাদের সখ্যরসে, পিতামাতার বাৎসল্যরসে, গোপরামাদের মধুররসের এত আধিক্য, এত চাপ যে সেখানে ভগবানের ঐশ্বর্য্য লুকিয়েছে। ঐশ্বর্য্যের গন্ধ পর্য্যন্ত নেই। প্রেমমাধুর্য্যে ঐশ্বর্য্য ঢাকা পড়ে গেছে। ব্রজে প্রেমের চাপে বিজ্ঞ ভগবান অজ্ঞ হয়েছেন। পূর্ণকাম হয়েও স্তন্যকাম হয়েছেন। মায়ের আঁচল ধরে ননীর জন্য আবদার করেছেন। আনন্দময় বিগ্রহ হয়েও মায়ের বাঁধনে

বাঁধা পড়ে চীৎকার করে কেঁদেছেন। অভয় হয়েও মায়ের ভয়ে ছুটে পালাচ্ছেন, এ সবই শুদ্ধ মাধুর্য্যের বিস্তার। দ্বারকা মথুরায় তত্ত্বশিরোমণি ভগবান বিরাজ করছেন। কিন্তু বৃন্দাবনবিহারী আমার পরম রসিক চূড়ামণি। রসরাজ শ্রীবিগ্রহ শ্রীশ্যামসুন্দর গোপীজনবল্লভ ব্রজভূমির একমাত্র আকর্ষণ। তত্ত্বের ওপরে রসের স্থান। রসের বিচারে কেউ কাঁধে বয়, কেউ আবার কাঁধে ওঠে। ব্রজে তাই আমরা দেখি শুদ্ধ সখ্যরসে মুগ্ধ হয়ে তত্ত্ব কৃষ্ণ কাঁধ পেতে দিয়েছেন—তাঁর ওপরে সখ্য রসের মূর্ত্তি শ্রীদাম সখা উঠে বসেছেন। কৃষ্ণসখা শ্রীউদ্ধবজী—যিনি বৃষ্ণিবংশের প্রধানমন্ত্রী, দেবগুরু বৃহস্পতির সাক্ষাৎ শিষ্য জগতে বুদ্ধিসত্তম বলে যার পরিচয় তিনি ব্রজভূমিতে পদার্পণ করে ব্রজরামাগণের কৃষ্ণপ্রীতিতে মুগ্ধ হয়ে বিস্ময়বিমুগ্ধ কণ্ঠে বলেছেন—

আসামহো চরণরেণুজুষা মহং স্যাং বৃন্দাবনে কিমপি
গুল্মলতৌষধীনাম্।
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বা ভেজুর্মুকুন্দপদবীং
শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্॥
ভাঃ ১০।৪৭।৫৪

উদ্ধবজীর প্রার্থনা—শ্রীধাম বৃন্দাবনে যে কোন একটি তৃণগুল্মলতা জন্ম যদি পেতে পারি তাহলে মহাভাগ্যবতী ব্রজগোপীর চরণরজ মাথায় পেয়ে ধন্য হব—এই ব্রজরামারা যখন গোবিন্দ অভিসারে যাবে তখন তাদের চরণের আঘাতে যে পথের ধূলি বাতাসে উড়বে তা ঐ তৃণগুল্ম লতাতেই পড়বে—উঁচু উঁচু বৃক্ষ পর্য্যন্ত পৌঁছুবে না—তাই উঁচু বৃক্ষ জন্ম চাইলেন না উদ্ধব। ব্রজরামাদের কি এমন মহিমা যে উদ্ধবজীর মত ব্যক্তি এই প্রার্থনা করছেন—তাদের মহিমার কথা আর কি বলা যায়—যারা কৃষ্ণের প্রতি অনুরাগে আত্মীয় স্বজন, পরিজনবর্গ, দেশ, সমাজ, পাতিব্রত্য, বিবেক, ধর্ম লজ্জা, বেদবিধি সকল বস্তুকে জলাঞ্জলি দিয়েছে—যে সব জিনিস ত্যাগ করার কথা চিন্তা করা যায় না। তাই এই ব্রজরামাদের চরণরেণুর একটি কণাকে বন্দনা করে উদ্ধবজী বললেন—

বন্দে নন্দব্রজস্ত্রীণাং পাদরেণুমভীক্ষ্ণশঃ।
যাসাং হরিকথোদগীতং পুনাতি ভুবনত্রয়ম্॥ ১০।৪।৬৩

নন্দমহারাজের ব্রজভূমির গোপরামাদের চরণরেণুর একটি কণাকে আমি

বারে বারে বন্দনা করি—যাদের কণ্ঠের হরিগুণগান ত্রিভুবনকে পবিত্র করে। গোপাঙ্গনাদের চরণে তো অসংখ্য রজঃকণা। কিন্তু উদ্ধবজী তার মধ্যে একটিকেই বন্দনা করেছেন। কারণ একটি ধূলিকণাই উদ্ধবজীর মত ব্যক্তির সকল প্রার্থনা অনায়াসে পূরণ করে দিতে পারে। আর উদ্ধবজী নিজ দৈন্যে বলেছেন—একটি রজঃকণার বেশীকে বন্দনা করবার আমার সামর্থ্যও নেই অধিকারও নেই।

হরিকথাই যে সকল রসের খনি উদ্ধবজী একথাও ঘোষণা করেছেন।

বাঞ্ছন্তি যদ্ ভবভিয়ো মুনয়ো বয়ঞ্চ কিং ব্রজজন্মভি-
রনন্তকথারসস্য। ভাঃ ১০।৪৭।৫১

যে ব্রজরামার চরণরজঃ মুমুক্ষু, মুক্ত, এবং মুক্তেরও উপরে যাঁরা ভগবানের নিত্য পার্ষদ তাঁরাও বাঞ্ছা করেন। অনন্ত ভগবানের কথাতে যদি রসের আস্বাদন না জাগে তাহলে ব্রহ্মজন্ম পেয়েই বা লাভ কি? আর ভগবানের কথারসে যদি চিত্ত মজে তাহলে ব্রহ্মজন্মেও কোন প্রয়োজন নেই।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র যে রসরাজ মূর্ত্তি এ খবর তো উদ্ধবজী জানতেন। তবে ব্রজগোপীর কাছে তিনি কি এমন আস্বাদ পেলেন যার জন্য তাঁদের চরণরেণুর একটি কণাকে বন্দনা করে তিনি নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করলেন—ব্রজভূমিতে গুল্মলতা হয়ে জন্মগ্রহণ করবার জন্য অভিলাষ জানালেন। রসের সঙ্গে উদ্ধবজীর পরিচয় থাকলেও ব্রজরামার ভাবের সঙ্গে পরিচয় ছিল না। কৃষ্ণ হলেন রস আর ভক্তের হৃদয় হল ভাব। ব্রজবাসী এই ভাবের খনি। যেখানে ভাব সেইখানেই রসের স্থিতি। পাত্র অনুসারে রসের উপস্থিতি হয়। পিতার হৃদয়ের বাৎসল্য কতখানি পুত্রকে সামনে আনলে বুঝা যায়। ভক্ত হৃদয় আধারে এই ভাব হল আধেয়। এই ভাবের পরাকাষ্ঠা হলেন শ্রীমতী রাধাঠাকুরাণী। তাই তিনি হলেন মহাভাব স্বরূপিণী। এই মহাভাব ঠাকুরাণী পাশে থাকলে রসরাজ শ্যামসুন্দরের মাধুর্য্য সর্ব্বাধিক। পাত্র ঠাকুরাণীর পাশে রস শ্যামসুন্দর। তাই ভক্ত শুধু রসরাজকে দেখলে তৃপ্ত হয় না। রাধারাণীর সঙ্গে শ্যামসুন্দরকে দেখলে সাধক রসকে ঠিক উপলব্ধি করতে পারে।

এখন প্রশ্ন হতে পারে কৃষ্ণ যখন রসরাজ তখন তিনি রসদাতা হন না কেন? অখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্যামসুন্দর রস দিতে পারেন না। কারণ

রস নিজে রস বিকাশ করতে পারে না। গৌরলীলা বড় বিচিত্র। এখানে চন্দ্র ও সূর্য্যের যুগপৎ উদয় হয়েছে। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ নিতাই গৌরের প্রকাশকালকে পুষ্পবন্ত কাল বলে উল্লেখ করেছেন। যে ক্ষণে সূর্য্য ও চন্দ্র যুগপৎ উদিত হয় তাকে পুষ্পবন্ত কাল বলা হয়। শ্রীনিতাইসুন্দর ও শ্রীগৌরসুন্দর শন্দৌ অর্থাৎ পরমকল্যাণদানকারী। এখানে মঙ্গল বলতে কাকে বুঝাচ্ছে? জীবের অনাদিকালের দুর্ব্বাসনারূপ অন্ধকারকে দূর করেই তারা পরম মঙ্গল সাধন করেন। কৃষ্ণবস্তু ছাড়া অন্য বস্তুর ওপর আসক্তির নামই দুর্ব্বাসনা। কথা আছে, একটি বস্তু যদি মানুষ বহুদিন ধরে ভোগ করে তাহলে তাতে তার সত্ত্ব জন্মে যায়—কিন্তু এই দুর্ব্বাসনাতে মানুষের সত্ত্ব জন্মায় না। কারণ একটি ঘর বন্ধ অবস্থায় থাকলে যুগ যুগান্তরের অন্ধকার সেখানে জমে থাকে, কিন্তু এক মুহূর্তের আলোতে সেই যুগান্তের অন্ধকার দূর হতে পারে। এক যুগের অন্ধকার দূর করবার জন্য এক যুগের আলোর দরকার হয় না। তেমনি অনাদিকালের দুর্ব্বাসনা রোগ দূর করতে অমিত বলশালী গৌরের প্রেমলক্ষণাভক্তি দানই যথেষ্ট। কৃষ্ণরসই জীবের একমাত্র কল্যাণের বস্তু। এইটি শ্রীনিতাই গৌর দান করেন বলে তাঁদের শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ 'শন্দৌ' বলে সম্বোধন করেছেন। তিনি আরও বলেছেন—প্রেমলক্ষণা ভক্তি জীবকে দুই ভাগবত সঙ্গে সাক্ষাৎকার করায়। দুই ভাগবত বলতে (১) ভাগবত শাস্ত্র (২) ভক্তিরসপাত্র অর্থাৎ ভক্ত। ভক্তের কাছে ভক্তিরস গচ্ছিত থাকে। যেমন পদ্মকোশ মধুর খনি হলেও পদ্মমধু পেতে হলে পদ্মের কাছে হাত পাতলে চলবে না। পদ্ম মধুময় হলেও মধু বিস্তারের বা দানের ক্ষমতা তার নেই। সে শক্তি আছে মধুপের। যে মধুর ভাণ্ডারী। রসভোক্তাকে মধু পেতে হলে মধুপের কাছে হাত পাততে হবে। মধু যে তার কাছেই জমা হয়ে আছে। পদ্মের মধুর পাশে মধুপ ভাব থাকলে তবে রস গ্রহণ হবে। ভাবের পাশেই রসের বিকাশ। তেমনি জগতে যত যত ভাব আছে তার মধ্যে ব্রজরামার ভাবের শক্তিমত্তা সকলের ওপরে। মহাভাবের মূর্ত্তি ব্রজরামা। এই ব্রজরামার ভাব পরিমাপ করা যায় না। এই মহাভাবের সঙ্গে ব্রজে উদ্ধবের নূতন পরিচয় হল। এই মহাভাবমিলিত কৃষ্ণরসের আস্বাদ করতে উদ্ধবের লোভ হয়েছে। কিন্তু তার নিজের যে সে রস আস্বাদনে যোগ্যতা নেই, সে জ্ঞানও আছে। তাই তিনি ব্রজের

একটি গুল্ম লতা হয়ে জন্ম নিতে বাসনা করেছেন যাতে ব্রজগোপীর চরণরেণুর একটি কণা স্পর্শে ধন্য হতে পারেন।

ব্রজলীলা রসের সামর্থ্য কতখানি তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ শ্রীধাম নীলাচলে শ্রীজগন্নাথ, শ্রীবলরাম এবং শ্রীসুভদ্রাদেবীর মূর্ত্তির প্রকাশ। একদিন দ্বারকামন্দিরে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র রাত্রে শয়ন করে আছেন—নিদ্রিত অবস্থাতেই দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে 'হা রাধে, হা রাধে'—বলে কাঁদছেন। রুক্মিণীদেবী প্রভুর চরণে হাত দিয়ে তাঁকে জাগিয়ে কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। ভগবান একটু লজ্জিত হয়ে ভাবকে গোপন করলেন। মহিষীরা এ ব্যথার কারণ জানতে চাইলে ভগবান বললেন—কি জানি আমার তো কিছু মনে নেই। এই বলে আবার নিদ্রিত হলেন। মহিষীরা মনে মনে ভাবছেন—আমরা এই ষোল হাজার আট মহিষী—রূপে, গুণে, কুলে শীলে কিছু তো কম নই—তবু প্রভুর মন ভোলাতে পারলাম না—অন্য রমণীর জন্য তাঁর এত ব্যাকুলতা? স্বপ্নের মাঝে যে নারীর জন্য প্রভু এত ব্যাকুল হন সে রমণী না জানি রূপে গুণে কেমন? তখন রুক্মিণীদেবী বললেন—শুনেছি শ্রীধাম বৃন্দাবনে রাধা নামে এক রমণীর রূপে গুণে প্রভু নাকি বড় আকৃষ্ট। তাঁকে তিনি কিছুতেই ভুলতে পারছেন না। সত্যভামাদেবী বললেন—তা সে যাই হোক্ সে তো গোপরামা ছাড়া অন্য কেউ নয়—ব্রজের গয়লানী এত সুন্দর? তার ওপর এত আকর্যণ? আমার মনে হয় রোহিণী মাকে জিজ্ঞাসা করলে সব খবর ভাল করে জানা যাবে। কারণ তিনি তো অনেকদিন ব্রজে ছিলেন। তাই সেখানকার সব ঘটনাই তিনি ভালভাবে জানেন। পরদিন মধ্যাহ্ন ভোজনের পর যখন ভগবান রাজসভায় গেছেন—তখন মহীষীরা রোহিণী মাকে কাতরভাবে জানালেন—মা ব্রজের সকল কথা তোমার কাছে আমরা জানতে চাই। তোমাকে বলতেই হবে। মা বললেন—বাছারা, আমি ব্রজের সব ঘটনাই জানি কিন্তু আমি তো মা—তাই সেখানে সেই ব্রজপ্রেমের গুপ্তলীলার কথা বলি কি করে? তার ওপর আর একটা কথা—কৃষ্ণ বলরাম যদি কথার মাঝে এসে পড়ে তাহলে আমি তো লজ্জায় মরে যাব। তাই জানলেও আমি বলতে পারব না। মহিষীরা প্রথমে বললেন—তাঁরা তো রাজসভায় আছেন—তুমি তো অন্তঃপুরে বসে বলবে—তাঁরা আর আসবেনই বা কি করে? মা বললেন—তা বললে

হবে না—ব্রজলীলার কথার এমনই আকর্ষণ কৃষ্ণ বলরাম যেখানেই থাকুক—কথায় আকর্ষণে ঠিক এখানে এসে উপস্থিত হবে। মহিষীরা তো কিছুতেই ছাড়বেন না। তখন ঠিক হল—সুভদ্রা ভগ্নী দরজায় পাহারা থাকবে—কাউকে ভেতরে আসতে দেবে না। কেউ এলে বলবে যাওয়া চলবে না—মায়ের আদেশ নেই। মা তখন রাজী হলেন। কথা তো আরম্ভ হয়েছেন।

মায়ের ব্রজলীলার কথা যত অগ্রসর হচ্ছেন—কৃষ্ণ বলরাম রাজসভায় চঞ্চল হচ্ছেন। তারপর কথা অগ্রসর হতে হতে লীলামুকুটমণি রাসলীলার কথা প্রসঙ্গ এসেছেন তখন তো কৃষ্ণ বলরাম রাজসভায় থাকতেই পারলেন না। কে যেন তাঁদের প্রাণ ধরে টানছে—তাঁরা ছুটে এসে দরজায় দেখেন সুভদ্রা পাহারায়—তাঁরা বললেন ভগ্নী পথ ছাড়—আমরা ভেতরে যাবো। সুভদ্রা বললেন—না। তাঁরা বললেন—কেন? সুভদ্রা বললেন—মায়ের আদেশ নেই। একথা শুনে মাতৃবৎসল তাঁরা মায়ের আদেশ লঙ্ঘন করতে পারলেন না—সুভদ্রার দুই পাশে দুজন দাঁড়িয়ে গেলেন—ভগ্নীর ডানদিকে বলদেব বাঁদিকে কৃষ্ণচন্দ্র। সেখান থেকে সেই ব্রজলীলার কথা শুনতে লাগলেন। শুনতে শুনতে তাঁদের প্রেমবিকার। তাঁরা প্রেমানন্দে বিভোর হয়ে পড়লেন। নয়নধারায় দুজনেরই মুখ বুক ভেসে যেতে লাগল। চক্ষু গোলাকৃতি হয়ে গেল—হস্তপদ সঙ্কুচিত হয়ে গেল—কেমন যেন অদ্ভুত অবস্থা—সুভদ্রা দেবীরও ঐ একই রকম অবস্থা—কৃষ্ণচন্দ্রের হাতের সুদর্শন চক্রও প্রেমে গলে গিয়ে লম্বিত আকার ধারণ করল—প্রেমবিকারে এই চারমূর্ত্তি অদ্ভুতরূপে প্রকাশ পেলেন।

ভগবানের যখন এই রকম অবস্থা তখন ঠিক সেই সময়ে স্বচ্ছন্দগতি দেবর্ষিপাদ নারদ সেখানে এসে উপস্থিত। নারদ তো স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। এ দৃশ্য তো নারদ আর কখনও দেখেন নি। পরে যখন রোহিণী মা শ্রীমতীর বিরহদশা বর্ণনা করতে আরম্ভ করলেন তখন সকলের দেহ আবার আগের মত হয়ে গেল। এই অবসরে নারদ নানাভাবে স্তুতি করতে আরম্ভ করলেন। ভগবান সন্তুষ্ট হয়ে বললেন—নারদ আজ আমার বড় আনন্দের দিন। তুমি বর প্রার্থনা কর। নারদ বললেন—প্রভু হঠাৎ এত আনন্দের কারণ কি ঘটল? প্রভু বললেন—নারদ আজ আমার ব্রজপ্রেমের

কথা স্মরণ হয়েছে—তাই মনটি খুব খুশী। নারদ বললেন—প্রভু তোমার পক্ষে সেটি কি আর নূতন কিছু? তুমি তো নিত্যই ব্রজলীলা স্মরণ কর—সে রসে মেতে থাক। ভগবান বললেন—তা বটে, তবু আজকে কিছু বেশী। যেমন মানুষ তো প্রতিদিনই খায় কিন্তু উৎসবের নিমন্ত্রণে যেমন কিছু ভূরিভোজন হয়েই যায়—আমারও আজ উৎসবের নিমন্ত্রণ। তুমি বর চাও। নারদ বলছেন—প্রভু যদি বরই দেবে তাহলে এই বর দাও—তোমার ভক্তি রস আস্বাদনে কেউ কোনদিন যেন তৃপ্ত না হয়। ভগবান বললেন—নারদ ও বর আমি জগতে দিয়ে রেখেছি'—ও বর তোমাকে আর চাইতে হবে না। আমার ভজনে কারো কোনদিন তৃপ্তি হবে না, যে যত ভজন করবে তার মনে হবে কিছু হল না, কিছু হল না। তুমি অন্য বর চাও। তখন নারদ বললেন—তাহলে প্রভু, এই বর দাও যে প্রেমবিকারের চারমূর্ত্তি তুমি কৃপা করে আজ আমাকে একটু খানির জন্যও দর্শন করালে এই শ্রীমূর্ত্তি যেন জগতের আপামর জনসাধারণ দর্শন পায়। ভগবান বললেন—'তথাস্তু' তাই হবে। এ বিষয়ে আমি আরও দুজনের কাছে এর আগে প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছি—রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন বহুকাল তপস্যা করেছিলেন—তাঁর তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে ব্রহ্মার প্রার্থনাতে কথা দিয়েছিলাম—নীলাচলে দারুব্রহ্মরূপে অবতীর্ণ হব—আর বিমলাদেবীর তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে—সর্ব্বসাধারণকে মহাপ্রসাদ দান করব বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। তাই নীলাচলে দারুমূর্ত্তি প্রকাশ করে সে প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হবে, আর তোমার প্রার্থনাও পূরণ হবে। নারদ খুব আনন্দ করে ভগবানকে প্রণাম করে বীণাযন্ত্রে হরি গুণ গান করতে করতে প্রস্থান করলেন। রোহিণী মা লজ্জিতা হবেন বলে বলরাম এবং কৃষ্ণচন্দ্র একটু আড়ালে গেলেন। চারমূর্ত্তিই শ্রীজগন্নাথ, শ্রীবলদেব, শ্রীসুভদ্রা এবং শ্রীসুদর্শনরূপে নীলাচলধামে বিরাজ করছেন।

এখন এখানে একটি প্রশ্ন মনে জাগতে পারে। ব্রজলীলার কথা শুনে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বলদেব সুভদ্রা দেবীর তো এই প্রেমবিকার অবস্থা হল কিন্তু রোহিণী মা যিনি কথা বলছেন এবং মহিষীরা যাঁরা শুনছেন, তাঁদের তো কোন বিকার দেখা গেল না। এর কারণ হল মায়ের তো বাৎসল্য প্রেম—বাৎসল্য প্রেমের কাছে মধুররস লজ্জিত। মধুররসের কোন ক্রিয়া বাৎসল্যরসের ওপর হয় না। তাই মায়ের কোন বিকার হয় নি। আর

মহিষীদের হৃদয়ে আছে অভিমান—তাই তাঁদের পক্ষে অভিমান ত্যাগ করে গোপী আনুগত্য করা সম্ভব হয় নি। এই গোপী আনুগত্য ছাড়া ব্রজের মধুররস আস্বাদন করা সম্ভব হয় না। অভিমান লীলাস্ফূর্ত্তির পক্ষে প্রধান বাধা। তাই মা বা মহিষীদের কারো প্রেমবিকার হল না। মায়ের বাৎসল্য প্রেম বাধা আর মহিষীদের জাতি কুল শীল রূপের অভিমান বাধা। এঁরা প্রায়ই বলেন—ব্রজগোপীরা বৈশ্য জাতি বনচারিণী, গোয়ালিনী—এদের আবার প্রেম কোথা থেকে হবে? এই অভিমানের ফলেই তাঁদের প্রেমবিকার হল না।

ব্রজলীলার কথা যেখানেই হয় সেখানেই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের আবির্ভাব ঘটে। শ্রীমতী রাধারাণীর লীলা মণিমন্ত্র মহৌষধি—আকর্ষক মন্ত্র ব্রজরস। জগন্নাথের শ্রীমূর্ত্তিতে রাধা প্রেমের প্রথম স্পর্শ ধরেছে মাত্র। ভুবনমোহন শ্যামসুন্দর ভুবনমোহিনীর প্রেমের স্পর্শে আরও সুন্দর হয়েছেন শ্রীজগন্নাথরূপে এবং সেই প্রেম-স্পর্শ পরিণতি লাভ হয়েছে শ্রীগৌরস্বরূপে। শ্রীজগন্নাথ রাধাপ্রেমের অস্ফুট কলিকা আর গৌরসুন্দর হলেন সেই প্রেমের স্ফুট প্রসূন। প্রাকৃত জগতেও দেখা যায় শিশুকালের ছবি বৃদ্ধ দেখে খুব আনন্দ পায়—তাই রসরাজও মহাভাবের পরিণতি স্বরূপ শ্রীগৌরসুন্দরের নীলাচল ধামে স্থিতির এবং নীলাচলনাথের দর্শনে এত আবেশ। শ্রীজগন্নাথ শ্রীগৌরসুন্দরেরই অস্ফুট প্রকাশ। তাই তাঁর শ্রীমূর্ত্তি গৌরসুন্দরের এত প্রিয়। ব্রজকেলির এত মহিমা। শ্রীপাদ রামানন্দ রায় রসিক হয়ে রসের সাগর হয়ে আস্বাদনে লুব্ধচিত্ত—তাই বলেছেন—কণ্ঠে যদি সুর থাকে তাহলে ব্রজকেলি গান কর। প্রেমের কথার এমনই মহিমা যে সে কৃষ্ণকে পর্য্যন্ত আকর্ষণ করে আনে। অন্যবস্তু তো দূরের কথা। ব্রজলীলা কথা কৃষ্ণাকর্ষক বস্তু।

শ্রীধাম বৃন্দাবনে রাসস্থলী থেকে ব্রজরামাদের বিরহ ব্যথাটি আস্বাদন করবার জন্য শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র তাঁদের ছেড়ে চলে গেলেন। ব্রজরামারা এবং রাধারাণী নিজে অনেক খুঁজতে কৃষ্ণকে পেলেন না—কারণ কৃষ্ণ তো তাঁদের দেখা না দেবার জন্যই লুকিয়েছেন। তাই তাঁরা যে বনে যাচ্ছেন কৃষ্ণ সে বন থেকে অন্য বনে যাচ্ছেন। তখন তাঁরা দেখলেন—এতে কৃষ্ণকে ব্যথাই দেওয়া হচ্ছে—কারণ তাঁরা খুঁজছেন বলেই তো কৃষ্ণ বন হতে বনান্তরে যাচ্ছেন। ব্রজবধূরা তো প্রেমিকা—তাঁরা তো কামিনী

নন। তাই যাতে কৃষ্ণ কষ্ট না পান তাই সেই খোঁজার পথটি ছেড়ে দিলেন। খোঁজার পথ মানে জ্ঞানের পথ—জ্ঞানের পথে তো কৃষ্ণ নেই—কৃষ্ণ আছেন প্রেমের পথে। তাই যেখান থেকে তাঁরা কৃষ্ণ হারিয়েছিলেন সেই যমুনা পুলিনে গোপবধূরা ফিরে এলেন—যমুনাপুলিনের রজোরাণীর কাছে প্রার্থনা করতে এলেন—'ওগো রজোরাণী, তোমার কৃপায় আমরা তো কৃষ্ণ পেয়েছিলাম—এখন আমরা তাকে হারিয়ে ফেলেছি—তুমি আবার কৃপা করে আমাদের কৃষ্ণ মিলিয়ে দাও। যমুনা পুলিনে এসে তাঁরা সমবেত হয়ে কৃষ্ণ গুণ গান করতে আরম্ভ করলেন। আর এই গানের আকর্ষণে কৃষ্ণ তাঁদের কাছে ফিরে এলেন। শ্রীশুকদেব বললেন—

ইতি গোপ্যঃ প্রগায়ন্ত্যঃ প্রলপন্ত্যশ্চ চিত্রধা।
রুরুদুঃ সুস্বরং রাজন্ কৃষ্ণদর্শনলালসাঃ॥
তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মানমুখাম্বুজঃ
পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ॥ ভাঃ ১০।৩২।১-২

ভগবানের এই লীলার প্রকাশে কলিজীবের প্রতি বিশেষ করুণা হয়ে গেল। কারণ এইখানেই কলিযুগোচিত যে সাধন শ্রীনামসংকীর্ত্তন তার প্রথম সূত্রপাত। সংকীর্ত্তনরস সুলম্পট শ্রীগৌরসুন্দর এই সংকীর্ত্তনরাস (মহারাস) প্রকট করেছিলেন। রাসস্থলী হলেন শ্রীবাস অঙ্গন। মহাজন বলেছেন—

সংকীর্ত্তন রাসমঞ্চে—
মাঝে নাচে গোরা বনমালী
চারিদিকে ঘিরে পারিষদ আলী
তার মাঝে নাচে গোরা বনমালী।
দুই দুই পরিকর তার মাঝে মাঝে গৌর নাচে।
সবাই মনে করছে—আমারই কাছে গৌর নাচে
সবাই মনে করছে।

তাহলে দেখা গেল কৃষ্ণলীলা গান করলে কৃষ্ণকে পাওয়া যায়। গোপী গীত তার প্রমাণ। গোপীদের এ বুক ফাটা কান্না এ প্রাকৃত জগতের পতিপুত্র হারানোর কান্না নয়। এ হল কৃষ্ণ হারানোর কান্না। এ কান্নার দাম অনেক। শ্রীশুকদেব কান্নাই বলেছেন। কৃষ্ণ অদর্শনে ব্রজরামার কি অবস্থা হয় দেখবার জন্যই কৃষ্ণের রাসস্থলী থেকে অদর্শন। গোপবালাদের

বিরহদশাটি রসরাজ শ্যামসুন্দর পরম আদরে ভোগ করেছেন। যে গোপরামাগণ নিজের বলতে যা কিছু সব ত্যাগ করেছে কৃষ্ণের সুখের জন্য তাদেরই প্রাণে দুঃখ দিতে কৃষ্ণের এই বীরত্ব—গোপরামারা কৃষ্ণকে 'বীর' বলে সম্বোধন করেছেন কটাক্ষে। শ্রীশুকদেবও বললেন—'শৌরী'। পীতাম্বর পরে বনমালা ধারণ করে সাক্ষাৎ মন্মথের মথনকারী কৃষ্ণচন্দ্র গোপীদের কাছে আবির্ভূত হলেন। পীতাম্বরটি গলায় জড়িয়ে গললগ্নীকৃতবাসে এসে গোবিন্দ দাঁড়িয়েছেন—অপরাধী ব্যক্তির মত। গোপবালাদের বেদনা দেওয়াতে নিজেকে অপরাধী বলে মনে করেছেন—তাই গলবাসে ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে এসে দাঁড়ালেন। আর মালা পরে এসেছেন। এ মালা তাঁর নূতন করে পরা নয়—গোপরামারাই পরিয়ে দিয়েছিলেন। সেই মালাই কণ্ঠে ধারণ করে এসেছেন। এটি আবার শ্রীশুকদেবের ঘটা করে বলবার কি আছে? না, এতে তাৎপর্য্য আছে। কৃষ্ণ যেন মালা দেখিয়ে তাঁদের বলতে চাইছেন—'তোমরা হয়ত মনে করতে পার আমি যখন তোমাদের কাছে থেকে দূরে ছিলাম তখন অন্য কোন বালার সঙ্গ করেছি—তা নয়—তোমাদের দেওয়া এই মালাই আমার বক্ষের সাঙ্গনী ছিল—অন্য কোন বালার সঙ্গ করিনি।' গোপরামারা যদি বলেন—তোমার কথা বিশ্বাস করি না—কারণ তুমি তো কপট, ধূর্ত্ত—মুখে একরকম বল মনের মধ্যে আর একরকম থাকে। কৃষ্ণ বলছেন—কেন বিশ্বাস করবে না। মালার দিকে চেয়ে দেখ—অন্য কোন বালার সঙ্গ করলে তার গাঢ় আলিঙ্গনে আমার বক্ষের মালা পিষ্ট হত, দলিত হত, তাতো হয় নি। মালা তো অম্লান আছে—তোমরা যেমনটি পরিয়েছিলে সেইরকমই আছে। তাই শুকদেব বললেন স্রগ্বী। আর মালা পরে আসাতে সৌন্দর্য্যও বেশী হয়েছে। তাতে দীর্ঘ সময়ের অদর্শনের জন্য বেশী করে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করে গোবিন্দ আকর্ষণ করেছেন। এখানে শ্রীশুকদেব কৃষ্ণ নাম করে বলেন নি—বললেন—সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ। এতে কৃষ্ণকেই বুঝাচ্ছে। কারণ মন্মথ বলতে প্রাকৃত মদন রতিপতি, পঞ্চশর অনঙ্গদেবকে বুঝায়। যিনি বিশ্বজগৎকে তাঁর ফুলশরে জর্জ্জরিত করেন। এই মন্মথের ওপরে যিনি অর্থাৎ প্রাকৃত মদনকেও যিনি মুগ্ধ করেন তিনি হলেন মন্মথমন্মথ অর্থাৎ অপ্রাকৃত মদন—যাঁর নাম প্রদ্যুম্ন—এরও ওপরে হলেন অপ্রাকৃত নবীন মদন—তিনিই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র

সাক্ষান্মন্মথমন্মথ।

তাই দেখা যাচ্ছে ব্রজলীলা গানের প্রভাবে—তার আকর্ষণে কৃষ্ণ পর্য্যন্ত যখন আসেন তখন অন্যের পক্ষে কি কথা আছে? কবি বললেন—

নয়ন যদিন রইবে বেঁচে, তোমার পানে চাইব গো।
আর কইতে কথা পারব যদিন তোমারই গান গাইব গো।।

সুতরাং মহাপ্রভুর প্রশ্ন—'কি গেয়ম্'—এর উত্তরে রামানন্দ তাঁর মন বুঝে উত্তর দিলেন—

প্রভু কহে, 'গান মধ্যে কোন গান জীবের নিজ ধর্ম?'
রায় কহে, 'রাধাকৃষ্ণের প্রেমকেলি সেই গীতের মর্ম॥'

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রশ্নের উত্তরে রামানন্দ রায় যে 'ব্রজকেলি কর্ম এব গেয়ম'—ব্রজলীলা গানই একমাত্র গান এ কথা বললেন—এর তাৎপর্য্য কি? এ সম্বন্ধে একটি কথা আছে—প্রশ্ন হল গান করা হয় কেন? এর দুটি উদ্দেশ্য আছে। প্রথমতঃ নিজেকে মজান, দ্বিতীয়তঃ লোক মজানোর জন্য গান করা হয়। তার মধ্যে দ্বিতীয় উদ্দেশ্যের জন্য গান প্রায় সকলে করে থাকেন। আর যাঁরা নিজেকে মজাবার জন্য গান করেন তাঁরা বড় ভাগ্যবান। এখন কৃষ্ণলীলা গান বা ব্রজকেলি গান করলে কৃষ্ণ তো লোকের দিক দিয়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তাই তাঁকে মজান যায় আর তার সঙ্গে নিজেকে মজান কাজটিও হয়। কারণ নিজে হল আত্মা তার ওপর পরমাত্মা, পরমাত্মারও ওপরে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। কাজেই নিজেকে অর্থাৎ সর্ব্বোচ্চ আত্মা স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে যে আকর্ষক মন্ত্ররূপ ব্রজকেলি গান মুগ্ধ করে সেই ব্রজলীলারসই যে সর্ব্বজীবের একমাত্র গান করবার যোগ্য এ বিষয়ে কোন সন্দেহই থাকতে পারে না। তাই শ্রীল রামানন্দ রায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রশ্নের উত্তরে বললেন—'ব্রজকেলি কর্ম এব গেয়ম্।' ব্রজকেলি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের অনেকরকম লীলার অন্যতম লীলা। অবশ্য কৃষ্ণলীলামাত্রই গানের যোগ্য। কিন্তু ব্রজরামাগণের সঙ্গে শ্রীভগবানের যে বিহার তাঁর একটু বৈশিষ্ট্য আছে। ব্রজগোপীই যে প্রেমরাজ্যের চরম সীমা—তার মধ্যে আবার গোপীমুখ্যা রাধারাণীর প্রেম—এটি শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ তাঁর শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত গ্রন্থে পরিপাটি করে বিচার করে দেখিয়েছেন। গ্রন্থবিস্তার ভয়ে সে প্রসঙ্গ এখানে আর উল্লেখ করা হল না।

ব্রজলীলা কথা তো গানের যোগ্য বটেই—বাক্‌পতি ব্রহ্মা বেদবক্তা ব্রহ্মা তাঁর ব্রহ্মসংহিতায় মন্তব্য করেছেন—'কথা গানম্'—ব্রজের যে কোন কথাই গান। ব্রজরামাগণ যখন এমনি কথা বলেন—মনে হয় তাঁরা সুস্বরলহরীতে গান করছেন। তাঁদের গমনই নটন—চলে যেতে নেচে যায়—বচনই গান—সঙ্গীতেতে কথা কয়। শ্রীগোপালচম্পুগ্রন্থে শ্রীজীবগোস্বামিপাদ বলেছেন—যেখানকার কথাই গান—সেখানকার গান না জানি কেমন? কিমুত গানম্। যেখানকার চলে যাওয়াও নেচে যাওয়া—সেখানকার নাচ না জানি কেমন। কিমুত নটনম্। কাজেই ব্রজলীলাই একমাত্র গানের যোগ্য। তাই সিদ্ধান্ত—'ব্রজকেলি কর্ম এব গেয়ম্।'

(৭)

অশেষবিশেষে রসভোক্তা শ্রীগৌরসুন্দর তাঁর রসলোলুপতায় রামানন্দকে পরবর্ত্তী প্রশ্ন করলেন। বলত রামানন্দ—

প্রভু কহে, 'শ্রেয়োমধ্যে কোন শ্রেয়ঃ জীবের হয় সার?'
রায় কহে, 'কৃষ্ণভক্ত সঙ্গ বিনা শ্রেয়ঃ নাহি আর॥'

এখন মহাপ্রভুর যে প্রশ্ন—জীবের শ্রেয় বলতে কি বুঝায়? এই শ্রেয়ঃ পদে আমরা সাধারণভাবে বুঝে রেখেছি—কল্যাণ। এখন এই কল্যাণ পদের প্রকৃত অর্থ কি সেটি জানতে হবে। কারণ এ জগতে প্রতিটি জীবেরই কল্যাণ একান্ত প্রয়োজন। সচেতন অচেতন সকলেরই কল্যাণ প্রয়োজন। এখানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রশ্নটি সর্ব্বজাতির সর্ব্ববর্ণের সকল আশ্রমের কল্যাণ বিষয়ে প্রশ্ন। কোনও ব্যক্তিবিশেষ বা আশ্রমবিশেষকে লক্ষ্য করে এ প্রশ্ন নয়। আমরা সাধারণভাবে মঙ্গল বলতে যা বুঝি বাস্তবিক পক্ষে বিচারে সেটি মঙ্গল নয়। কারণ সব মঙ্গলই আমাদের আপাততঃ। যে বস্তু পেলে জীবনে আর হারাতে হবে না—তার নাম হল মঙ্গল—যেটিকে আত্যন্তিক মঙ্গল বলা হচ্ছে। ধন, জন, আয়ু, যশ, পুত্র, স্বর্গ, আরোগ্য যা কিছুই জীবনে লাভ হোক্ সবই ক্ষয়ী, সবই বিনাশী। সকলের মধ্যেই নশ্বরতা দোষ আছে। কাজেই এর মধ্যে কোনটিই আমাদের পক্ষে পরম মঙ্গল হতে পারে না। তাই জাগতিক কোন কল্যাণই কল্যাণের পর্য্যায়ে পড়ে না। প্রকৃত কল্যাণ যা তার স্বরূপ হল অবিনাশী। এ জগতে যত পাগল দেখা যায় তাদের পক্ষে প্রচুর অর্থ,

সম্পদ, আহার্য্য, মহামূল্য বসনভূষণ কোনটিই মঙ্গল হতে পারে না। কিন্তু তাদের পক্ষে একমাত্র মঙ্গল হচ্ছে যদি কেউ কৃপা করে তার চিকিৎসা করে তার উন্মাদ অবস্থাটিকে সরিয়ে দিতে পারেন তাহলে সেইটিই হবে তার পক্ষে আত্যন্তিক মঙ্গল। তেমনি এ জগতে আমাদের অর্থাৎ জীবেরও উন্মাদ দশা। পাগল যেমন নিজের পরিচয় জানে না, নিজের নাম বা বাপের নাম, ঠিকানা বলতে পারে না—অন্য রকম বলে, অখাদ্য ভোজন করে, অস্থানে যায়, অবাচ্য বলে—জীবের অবস্থাও তো তাই। সেও নিজের পরিচয়—'জীব নিত্য কৃষ্ণদাস'—এ পরিচয় দিতে পারে না। ভুল পরিচয় 'আমি পিতা, মাতা, আত্মীয়স্বজন, ধনী মানী, কুলীন পণ্ডিত এই মিথ্যা মায়ার পরিচয় দেয়। হরিগুণ গান যে আত্মার খাদ্য তা না খেয়ে অখাদ্য—প্রাকৃত কথা অসদালাপ করে অর্থাৎ অখাদ্য খায়। অবশে বিষয় ভোগ করে। অসাড় হয়ে উন্মাদের মত অন্যায় আচরণ করে। এ উন্মাদ জীবের পক্ষে একমাত্র কল্যাণ হচ্ছে যদি সদ্বৈদ্যের মত কোন সাধু গুরু বৈষ্ণব কৃপাবশে তার উন্মাদত্ব সারিয়ে তাকে ব্যাধি মুক্ত করে গৌরগোবিন্দের শ্রীচরণে পৌঁছে দেন তাহলে সেইটিই হবে জীবের একমাত্র কল্যাণ। অন্ধকারে কেউ যদি নিজের ঘর হারিয়ে ফেলে তাহলে সূর্য্যোদয়ের পরে অন্ধকার দূর হলে সে যেমন নিজের ঘর খুঁজে পায় তেমনি এখানেও মায়ামোহের অন্ধকারে জীবের নিজের ঘর হারিয়ে গেছে, যদি কেউ কৃপা করে তার হৃদয়ে ভক্তি সূর্য্যের উদয় করে উন্মাদ জীবকে ব্যাধিমুক্ত করে গৌরগোবিন্দপাদপদ্মরূপ নিজের ঘর পাইয়ে দিতে পারেন—তাহলে সেইটিই হবে তার পক্ষে প্রকৃত কল্যাণ। এ ছাড়া জীবের আর কোন কল্যাণ নেই। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীশ্রীশিক্ষাষ্টকের বাণীতে বলা আছে—শ্রীকৃষ্ণ নাম সংকীর্ত্তন হলেন সর্ব্বাত্মস্নপনম্। ১০৮ শ্রীল রামদাস বাবাজী মহারাজ এই পদের ওপরে কীর্ত্তন প্রসঙ্গে নিজের অনুভূত অক্ষর দিলেন—শ্রীকৃষ্ণ নাম সংকীর্ত্তন সকল মঙ্গল উদয় করে। এ মঙ্গল বলতে কি বুঝালেন? আরও সহজ করে শ্রীপাদ বাবাজী মহারাজ বললেন—

শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তির অনুকূল সকল মঙ্গল উদয় করে।

ভগবানের পাদপদ্ম প্রাপ্তিই জীবের আত্যন্তিক মঙ্গল। এইটি কল্যাণের চরম সীমা। প্রাপ্তি বলতে বুঝায় ভগবানের পাদপদ্মে রুচি, প্রেমেতে তাঁর

মাধুর্য্য আস্বাদন। আর প্রেমে কৃষ্ণাস্বাদ হলে ভবনাশ পায়। এ কল্যাণ জীবনে লাভ হলে আর কখনও হারাতে হবে না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রশ্ন—'জীবের কি শ্রেয়ঃ'—তার উত্তরে রামানন্দ মহাপ্রভুর মনের অভিপ্রায় বুঝেই বললেন—'কৃষ্ণভক্ত সঙ্গ বিনা শ্রেয়ঃ নাহি আর।' অর্থাৎ 'সতাং সঙ্গতিঃ।' সাধুসঙ্গই ভক্তসঙ্গই জীবের কল্যাণ লাভের একমাত্র উপায়।

এই সাধুসঙ্গ দেবাদিদেব শঙ্করও প্রার্থনা করেছেন—শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রে রুদ্রগীতে বলা আছে—

অথানঘাঙেঘ্র স্তব কীর্ত্তিতীর্থয়োরন্তর্বহিস্নান বিধূত পাপ্মনাম্।
ভূতেষ্বনুক্রোশসুসত্ত্বশীলিনাং স্যাৎ সঙ্গমোহনুগ্রহ এষ নস্তব॥
ভাঃ ৪।২৪।৫৫

রুদ্র ভগবানকে বলেছেন—হে ভগবান, তোমার যশ এবং তীর্থ (গঙ্গা) এই দুটির দ্বারাই মানুষ পবিত্র হয়—তার ভিতরের এবং বাইরের—দুই স্নানের কাজই হয়ে যায়। গঙ্গাতে অবগাহন করলে বাইরের স্নান হল আর তোমার ভক্ত সঙ্গে তোমার যশোগাথা শুনলে ভিতরের স্নান হল—তার ফলে জীবের সবরকমের পাপ চলে যায়। তার ফলে তাদের অন্তরের মালিন্য কামক্রোধ প্রভৃতি চিরতরে দূর হয়ে যায়—তার মনে দয়া, সরলতা প্রভৃতি গুণ ফুটে ওঠে—তাই প্রার্থনা সেইসব ভক্ত সঙ্গে আমাদের মিলন করিয়ে দাও। হে প্রভো! তাহলে সেইটিকেই আমরা পরম মঙ্গল বলে মনে করব। কীর্ত্তি বলতে এখানে ভগবানের লীলা কথাকে বুঝাচ্ছে, আর তীর্থ বলতে ভগবানের চরণচ্যুতা গঙ্গাকে বুঝাচ্ছে। জীবের পাপ হল দুরকম—একটি বাইরের আর একটি হল ভিতরের। বাইরের পাপের ফল নরক যন্ত্রণা ভোগ আর অন্তরের পাপের ফল প্রকৃত বাসনা কলুষ চিত্ত। ভগবান জীবকে ধন, জন, যশঃ, আয়ু, আরোগ্য, পুত্র, স্বর্গ যতই দিন—যে অনুগ্রহকে বুদ্ধিমান ব্যক্তি অনুগ্রহ বলে নেবে না। কারণ জীবনে সাধুসঙ্গ ছাড়া কোন কল্যাণ হতে পারে না। সাধুসঙ্গই একমাত্র কল্যাণের দাতা। জীব অসারে বিষয় ভোগ করে। সেখানে চিকিৎসক যদি কেউ থাকেন তাহলে সাধুই একমাত্র চিকিৎসক। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ বললেন—

ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধু বৈদ্য পায়।
তাহার প্রভাবে মায়া পিশাচী পলায়॥

এই সাধু বলতে বলা আছে যার হৃদয়ে অন্য কোন বাসনা তো থাকবেই না এমনকি মুক্তি বাসনা পর্য্যন্ত থাকবে না তিনি হলেন প্রকৃতপক্ষে সাধু। শ্রীবৈষ্ণবতোষণীকার 'সাধু' পদের প্রতিশব্দ দিলেন—'প্রোজ্ঝিতকৈতবেষু সাধুষু।' অর্থাৎ যার চিত্ত থেকে যে কোন কৈতব অর্থাৎ কপটতা চলে গেছে। কৈতব বলতে কপটতা বুঝায়। কপটতা বলতে কি বুঝায়। মহাজন বললেন—

কৃষ্ণ ভজে চতুবর্গ বাসনা—এর নাম কপটতা।

ভজছি কৃষ্ণপাদপদ্ম—কিন্তু চাইছি ধর্ম, অর্থ, কাম—এর নাম কপটতা। ধর্ম, অর্থ কামনার বিষয় চাইলেই কৃষ্ণপাদপদ্ম থেকে মনটি সরে গেল—এর নামই কপটতা। কারণ কাজে মুখে মনে একরকম না হলেই তাকে বলা হয় কপট। ধর্ম, অর্থ, কামনা তো কপটতা বটেই—এর মধ্যে মুক্তি পাবার আকাঙ্ক্ষা যাকে মোক্ষ বলা আছে সেটি হল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কপটতা। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ বলেছেন—

অজ্ঞানতমের নাম কহিয়ে কৈতব।
ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ বাঞ্ছা আদি এই সব॥
তার মধ্যে মোক্ষ বাঞ্ছা কৈতব প্রধান।
যাহা হইতে কৃষ্ণ ভক্তি হন অন্তর্ধান॥

ধর্ম অর্থ কাম বাসনা কপটতা ঠিকই কিন্তু এইসব ভোগ করে যখন মানুষ দেখে এতে তো তৃপ্তি হচ্ছে না, সবই তো নশ্বর—তখন যদি তার জীবনে সাধু গুরু বৈষ্ণবের কৃপা হয়, তাহলে তারও কোনদিন গোবিন্দ ভজনে প্রবৃত্তি জাগতে পারে। ভক্তিলাভ হয়—কিন্তু যার হৃদয়ে মুক্তি বাসনা তার পক্ষে কোনদিনই ভক্তিলাভের সম্ভাবনা নেই। শ্রীরূপগোস্বামিপাদ বলেন—

ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে। ভঃ রঃ সিঃ

মুক্তি বাসনাকে পিশাচী বলেছেন—এই পিশাচগ্রস্ত হৃদয়ে কোনওদিনই ভক্তি জাগে না। মহাজন বললেন—

যে হৃদয়ে ভূক্তি মুক্তি বাসনা ধৃষ্টা চণ্ডালিনী থাকে
সে হৃদয়ে শুদ্ধা, সাধ্বী ব্রাহ্মণী ভক্তিদেবী কখনও যান না।

তাই 'সাধু' বলতে বলা আছে—যার হৃদয় বাসনা নির্মুক্ত—মুক্তিবাসনাই

সকলের চেয়ে বড় বাসনা—কপটতা। এই কপটতাশূন্য হৃদয় যাঁর তিনি হলেন 'সাধু'। এই সাধু কৃষ্ণপাদপদ্মকে পর্য্যন্ত বশীভূত করেন—অন্য তো দূরের কথা।

শ্রীগোবিন্দজী উদ্ধবজীকে বলেছেন—সাধুরাই আমাকে বন্দী করে অন্য কেউ আমাকে সেভাবে বশীভূত করতে পারে না। এ বন্দীদশা কিন্তু কারাঘরের বন্দী নয়—এ হল প্রেমের বন্ধন। প্রীতিতে ভগবান ধরা দেন। ভক্তের অধীনতা স্বীকার করেন। ভক্তবৎসল ভগবান ভক্তের ভক্তি রজ্জুতে বাঁধা পড়েন। তাই তো অখিল ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি শ্রীবালগোপাল ব্রজেশ্বরী মা যশোমতীর ভক্তিদামবন্ধনে নিজেকে ধরা দিয়েছিলেন। ভগবান বলেছেন—'মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ।'

হরি গুণ গানে ভক্ত যেখানে মুখর হয়, ভগবান সেখানেই থাকেন—শুধু থাকেন তাই নয়—দাঁড়িয়ে থাকেন তার কথাকে মর্য্যাদা দেবার জন্য। ভক্তিলাভের মূল কারণ হল এই সাধুসঙ্গ। সাধু সঙ্গে ভগবানের কৃপা পাওয়া যায়। তাই ভজনপথের সোপান নির্দ্দেশ করা হয়েছে—আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গঃ। এইটিই হল আসল পথ।

ভক্ত ধ্রুব যখন ছয় মাস তপস্যার পরে সিদ্ধিলাভ করে ভগবানের দর্শন পেলেন তখন রাজ্যসম্পদ, স্বর্গসুখ, ব্রহ্মানন্দ, মুক্তি কিছুই চাইলেন না—এমনকি ভগবানকেও চান নি। কিন্তু এই ভক্তসঙ্গই চেয়েছিলেন। বললেন—

ভক্তিং মুহুঃ প্রবহতাং ত্বয়ি মে প্রসঙ্গো
ভূয়াদনন্ত মহতামমলাশয়ানাম্।
যেনাঞ্জসোল্বণমুরুব্যবসং ভবাব্ধিং
নেষ্যে ভবদ্গুণকথামৃতপানমত্তঃ॥ ভাঃ ৪।৯।১১

হে অনন্ত, তোমার চরণে আমার এইটিই একান্ত প্রার্থনা, যে শুদ্ধচিত্ত অমলাত্মা ভক্ত তোমার পাদপদ্মে ভক্তিকে বহন করে, তাদের চরণ প্রান্তে বসে বসে যেন তোমার কথারস নিরন্তর পান করতে পারি—তার ফলে আমি এ ভয়ঙ্কর সংসারসাগর অনায়াসে পার হয়ে যেতে পারব। আমার সংসার সাগরপারের জন্য তোমাকে চিন্তা করতে হবে না।

মদমত্ত অবস্থায় নেশার ঘোরে যেমন মানুষের বাইরের সুখদুঃখের কোন অনুভূতি থাকে না, সেইরকম কৃষ্ণমদিরাপানে মত্ত হলে কৃষ্ণভক্তের

বাইরের কোন প্রাকৃত সুখদুঃখের অনুভূতি থাকে না। দেবাদিদেব শঙ্কর নারদকে বলেছেন—

কৃষ্ণভক্তিসুধাপানাৎ দেহদৈহিকবিস্মৃতেঃ।
তেষাং ভৌতিকদেহেঽপি সচ্চিদানন্দরূপতা॥

নিরন্তর কৃষ্ণভক্তিসুধারস পান করতে করতে ভক্তের দেহে দৈহিক কোন স্মৃতি থাকে না তখন তার এই পাঞ্চভৌতিক দেহই সচ্চিদানন্দ হয়ে যায়। ভগবানের অনন্দ যাঁরা পরিবেশন করেন তাদের সঙ্গই জীবের একমাত্র কাম্য। শ্রীশুকদেবও শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রের পঞ্চম স্কন্ধে বললেন—জীবের অনাদিকালের জন্মমৃত্যুপ্রবাহ বন্ধ হয়ে যাবে অর্থাৎ মায়ার বন্ধন মোচন হবে—যদাহি মহাপুরুষপুরুষপ্রসঙ্গঃ। মহাপুরুষ বলতে এখানে ভগবান—তাঁর যাঁরা পুরুষ অর্থাৎ ভক্ত সাধু বৈষ্ণব তাঁদের সঙ্গে যখন প্রসঙ্গ হবে। শ্রীকবিরাজ গোস্বামিপাদ একটি উপমা দিয়েছেন—

নদীর প্রবাহে যৈছে কাষ্ঠ লাগে তীরে।

একখানা কাঠ নদীর স্রোতে ভেসে যাচ্ছে—কতকাল থেকে ভাসছে কে জানে—অনাদি কাল থেকে ভাসছে—কিন্তু অনন্তকাল ভাসবে না—এর বিরাম আছে—যখন ঐ কাঠখানা নদীর তীরে ঠেকে যাবে তখন তাকে আর ভাসতে হবে না—সে তখন আশ্রয় পেয়ে গেল। এখানেও তেমনি জীবেরও অনাদিকালের প্রবাহ জন্মমৃত্যুর স্রোতে জীবন চলেছে কিন্তু অনন্তকাল চলবে না। এটি অনাদি বটে—কিন্তু অনন্ত নয়, এটি সান্ত কখন এর বিরাম? যখন মানুষের জীবনে গুরুকৃপা, সাধু কৃপা মহৎকৃপা হবে। এইজন্য গুরুকৃপাকে বলা আছে—তীরসঙ্গম্। তীরসঙ্গম্ গুরুকৃপা। তীরসঙ্গম সাধুকৃপা। তাই এই সাধু গুরু বৈষ্ণবই জগতে ভূরিদাতা। সাধুগণ সকল পুরুষার্থের মাথায় নৃত্য করেন। এই সাধুগণ কৃষ্ণকে পর্য্যন্ত বশীভূত করেন। সাধুসঙ্গ মায়া ব্যাধি মোচন করে জীবকে কৃষ্ণপাদপদ্ম পাইয়ে দেন। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরমশাই বললেন—

কিবা সে করিতে পারে কাম ক্রোধ সাধকেরে
যদি হয় সাধুজনার সঙ্গ।

শ্রীমন্মহাপ্রভুও শিক্ষাষ্টকের মন্ত্রে বললেন—মানুষের জীবনে শ্রীকৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন শ্রেয় অর্থাৎ মঙ্গলকুমুদকে প্রস্ফুটিত করে—এ মঙ্গল (শ্রেয়ঃ) হল শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তির অনুকূল মঙ্গল। যে ভক্তি দিয়ে ভগবানকে বশীভূত

করা যায় সে ভক্তির সন্ধান মানুষ পেতে পারে না যদি তার মস্তক মহতের চরণরজে অভিষিক্ত না হয়। ভক্তিপথের মহাজন প্রহলাদজী, জড়ভরত এই সিদ্ধান্ত করলেন। প্রহলাদজী বললেন—

নেষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ।
ভাঃ ৭।৫।৩২

জড়ভরতেরও বাক্য আছেন—

রহূগণৈতত্তপসা ন যাতি ন চেজ্যয়া নির্বপণাদ্ গৃহদ্বা।
নচ্ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্য্যৈর্বিনা মহৎপাদরজোঽভিষেকম্॥
ভাঃ ৫।১২।১২

তাই শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রে একাদশ স্কন্ধে শ্রীঅবধূত সংবাদ প্রসঙ্গে শ্রীঅবধূতজীর বাক্য আছে যদু মহারাজের কাছে—

তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যুযাবৎ নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ।
ভাঃ ১১।৯।২৯

মানুষ দেহ পাওয়ার পরে তাড়াতাড়ি চেষ্টা করতে হবে নিঃশ্রেয়স লাভের জন্য কারণ কখন মৃত্যু এসে যাবে কিছু বলা যায় না। এ নিঃশ্রেয়স বলতে প্রেমলক্ষণা ভক্তিকেই বুঝাচ্ছে। কারণ উপনিষদে প্রেয় এবং শ্রেয় দুটি কথা আছে। প্রেয় বলতে জাগতিক যা কিছু সুখৈশ্বর্য্যকে বুঝায়—একটা প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের চৌদ্দ ভবনের যত সুখৈশ্বর্য্য আর শ্রেয় বলতে মুক্তিকে বুঝায়। এখন অবধূতজীর যে এই নিঃশ্রেয়স্—এটি প্রেয়ও নয় শ্রেয়ও নয়—কারণ মুক্তিরও অনেক উপরে এই প্রেম লক্ষণাভক্তি—ভক্ত তাই প্রেয় বা শ্রেয় (মুক্তি) কোনটির জন্যই চেষ্টা করবে না—প্রেম লক্ষণা ভক্তির জন্যই চেষ্টা করবে—যা উর্দ্ধ বা অধঃলোকে কোথাও গেলে পাওয়া যাবে না। শ্রীপ্রবুদ্ধ যোগীন্দ্র তাই ত্রেতাযুগে মহারাজ নিমির সভায় বললেন—গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় পাওয়ার পর গুরুপদাশ্রয়ী ব্যক্তির গুরুপাদপদ্মে একটাই জিজ্ঞাসা—

তস্মাৎ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয়ঃ উত্তমম্। ভাঃ ১১।৩।২১

এখানে বললেন উত্তম শ্রেয় জীবনে কি এবং কেমন করে পাওয়া যাবে সেই সম্বন্ধেই জিজ্ঞাসা করবে। এখানেও উত্তম শ্রেয়ঃ বলতে প্রেয় বা উপনিষদের শ্রেয় (মুক্তি) নয়—এই উত্তম শ্রেয় বলতে ভগবানের

পাদপদ্মে প্রেমলক্ষণা ভক্তিকেই বুঝাচ্ছে। অবধূতজীর নিঃশ্রেয়স্ এবং যোগীন্দ্রের উত্তম শ্রেয়ঃ একই অর্থে বলা হয়েছে। এটি শ্রেয় অর্থাৎ মুক্তির অনেক উপরের সম্পদ। এই প্রেম লক্ষণা ভক্তি মুক্তি (জন্মমৃত্যু নিরোধরূপ মুক্তি) সুখকেও কুৎসিৎ বোধ করিয়ে দেয় তাই এই প্রেমলক্ষণাভক্তির আর একটি নাম হল মুকু। এই মুকু দান করতে পারেন বলেই কৃষ্ণের একটি নাম মুকুন্দ। মুকুং (প্রেমলক্ষণাভক্তি) দদাতি যঃ সঃ মুকুন্দঃ। তাই জীবের শ্রেয় অর্থাৎ মঙ্গল কি শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রশ্নের উত্তরে রায় রামানন্দ বললেন—'সতাং সঙ্গতিঃ।'

প্রভু কহে,—'শ্রেয়োমধ্যে কোন শ্রেয়ঃ জীবের হয় সার?'
রায় কহে, 'কৃষ্ণভক্ত সঙ্গ বিনা শ্রেয়ঃ নাহি আর॥'

দক্ষিণভারতে গোদাবরীতীরে রসরাজ শ্রীগৌরসুন্দরের সঙ্গে মহারসিক রামানন্দ রায়ের মহামিলন হয়েছে। রসিকের সঙ্গে রসিকের রসের খেলা চলছে। একজন বক্তা একজন শ্রোতা। কিন্তু কে যে বক্তা আর কে যে শ্রোতা বুঝবার উপায় নেই। আপাতদৃষ্টিতে দেখা যায় রামানন্দ উত্তর দিচ্ছেন আর প্রশ্নকর্ত্তা শ্রীগৌরসুন্দর নিজে। গোরাচাঁদ রসে ডগমগ হয়ে প্রশ্ন করেন আর তার উত্তর রামানন্দ রায়ের শ্রীমুখে শ্রবণ করে পরম পরিতৃপ্তি লাভ করছেন। মহাপ্রভুর প্রশ্ন শুনে সেই প্রশ্ন অনুযায়ী তার উত্তরদান সাধারণের পক্ষে সম্ভব নয়। যদিও এসব প্রশ্নের উত্তর শাস্ত্রে আছে কিন্তু শাস্ত্রে থাকলেও তা খুঁজে পাওয়া যায় না এবং কৃপা ছাড়া সেটি জানা সম্ভব নয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে শাস্ত্রজ্ঞান হলেই ভগবজ্জ্ঞান হয় না। ভগবান যাঁকে তাঁর তত্ত্ব কৃপা করে উপলব্ধি করান সেই জানতে পারে—তত্ত্ব উপলব্ধি করতে পারে। ভগবানকে জানাই হল আসল জানা। ভগবান এবং ভগবানের কথা দুটি ভিন্ন বস্তু নয়। তাই ভগবানের কথাকে জানাই ভগবানকে জানা। ভগবান নিজে রসসাগর—রসঘন। কিন্তু তাঁর সেই রসদান জীবের কাছে তাঁর নিজের পক্ষে সম্ভব নয়। এ রসের ভাণ্ডারী ভগবৎ কথা এবং ভক্তিরসপাত্র মহাজন। এঁরা দুজনেও ভগবান থেকে অভিন্ন। কিন্তু অভিন্ন হয়েও এঁদের একটি বেশী ক্ষমতা আছে যে তাঁরা ভগবানের গুণগান করতে পারেন এবং জীবকে সে রস আস্বাদন করাতে পারেন যা ভগবান নিজে পারেন না। তাই ভগবানের নিজের চেয়ে তাঁর কথার দাম বেশী। হরিকথার ওপরে আর দেবতা

নেই। হরি কথাই মানুষের একমাত্র আস্বাদ্য বস্তু। ভগবান নিজে জীবের আস্বাদ্য নন। ভগবান মহারসিক। কিন্তু রসরাজ হয়েও রসের কাঙাল। গৌর আমার বড় রস পিপাসু। কিন্তু এ রস তাঁকে যোগাবে কে? রসের উপকরণ সবই ভগবানের দেওয়া। কিন্তু ভক্ত সেই রসের পরিবেশক। কারণ যে রান্না করে সে যদি নিজেই পরিবেশক হয় তাহলে তার রস আস্বাদন ভাল হয় না। একজন উপকরণ দিয়ে রান্না করল এবং আর একজন যদি পরিবেশন করে তাহলে আস্বাদকের আস্বাদন ভাল হয়। ভক্ত সেই পরিবেশক—কারণ ভক্ত হল ভগবানের প্রিয়। প্রিয়জন না হলে কি খাওয়াতে পারে? তাই ভক্তের পরিবেশন ছাড়া ভগবানের ক্ষুধার তৃপ্তি হয় না। রামানন্দ রায়কে মহাপ্রভু উপচার দিয়েছেন রসপাক করে পরিবেশন করেছেন রামানন্দ। এই রস আস্বাদন করতে বসেছেন গৌরসুন্দর নিজে। মহারাজ আজ ভোজনে বসেছেন আর ভক্ত রামানন্দ হলেন পরিবেশক।

ভগবান নিজে রসময়। কিন্তু তাঁরও সর্ব্বদা অভাব বোধ আছে শ্রীমন্নিত্যানন্দ স্বরূপে শ্রীলোচনাদাসজী পদকর্ত্তা বললেন—

রসরত্নখনি তবু কাঙাল রসের।
অদ্ভুত চরিত আমার শ্রীনিতাইচাঁদের॥

শ্রীল রামদাস বাবাজী মহারাজ এই পদের ওপর আস্বাদন করলেন—

রসখনির এই তো স্বভাব।
পূর্ণ হয়েও মানে অভাব॥

তাই ভক্তসঙ্গ ভগবানের এত প্রিয়। ভক্ত সমাগমে ভগবান নিত্য লীলাময়। শ্রুতি বললেন—'একো দেবো নিত্যলীলানুরক্তঃ।' ভগবানের নিজের স্বরূপের আনন্দ ভগবানকে তত আনন্দ দিতে পারে না। ভগবান ভক্তকে কৃপা করেন। আর ভক্তের কাছ থেকে সেই কৃপাই ভগবানের কাছে ফিরে আসে ভক্তিরূপে। তাহলে দেখা যাচ্ছে কৃপা এবং ভক্তি একই বস্তু। যাওয়ার পথে কৃপা আর আসার পথে ভক্তি। শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিজেই যা কিছু ভক্তিসিদ্ধান্ত। কৃপার ধারা হল সে অভাবকে নিত্য জাগিয়ে রাখে। অভাব বোধ না থাকলে সম্পদ মিষ্টি হয় না। জাগতিক ও পারমার্থিক দুই সম্পদ সম্বন্ধেই একই কথা। এই অভাবেই কৃপার শোভা। যার ওপর যত কৃপা তার অভাব বোধ তত বেশী। তখন মনে

হবে আমার চেয়ে সকলেই উন্নত। কেবল আমিই বঞ্চিত হলাম।

কেবল আমি রইলাম বাকী রে।
প্রেম পেতে রইলাম বাকী।
জগৎ ভেসে গেল ডুবে গেল।

মনে হবে সকলেই পূর্ণ আমিই শুধু রিক্ত। প্রাকৃত জগতে ভোজনের দ্বারা ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় কিন্তু পরমার্থ রাজ্যে যতই ভজন ভোজন হবে ততই দর্শন আকাঙ্খা ক্ষুধা বাড়বে। এই ভগবৎ দর্শনের আস্বাদনের শেষ সীমা হলেন ব্রজরামাগণ। সাধকের জীবনে অতৃপ্তিই হল কৃপার স্বরূপ, ভক্তির স্বরূপ, প্রেমের স্বরূপ।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রশ্ন—বলত রামানন্দ শ্রেয় কাকে বলে। রামানন্দ তাই উত্তর দিলেন—কৃষ্ণ ভক্ত সঙ্গ বিনা শ্রেয়ঃ নাহি আর। কারণ ভক্তসঙ্গই মানুষের জীবনে ভক্তি লাভের একমাত্র উপায়—আর ভক্তি লাভই জীবের আত্যন্তিক কল্যাণ। ভগবানও উদ্ধবজীর কাছে বললেন—'লাভো মদ্ভক্তিরুত্তমঃ।'

(৮)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরবর্ত্তী প্রশ্ন—

প্রভু কহে,—'কাঁহার স্মরণ জীব করিবে অনুক্ষণ?'
রায় কহে,—'কৃষ্ণ নাম গুণ লীলা প্রধান স্মরণ॥'

শাস্ত্রে নববিধা ভক্তি অঙ্গ যাজনের কথা উল্লেখ আছে—সত্যযুগে বসে প্রহ্লাদজী শোনালেন—

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পদসেবনম্
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্যনিবেদনম্।
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীত মুত্তমম্॥

ভাঃ ৭।৫।২৩-২৪

এরই অনুবাদ করলেন শ্রীগোবিন্দদাসজী পদকর্ত্তা—

শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণ বন্দন পাদসেবন দাস্য রে।
পূজন সখীজন আত্মনিবেদন শ্রীগোবিন্দ দাস অভিলাষ রে॥

ভক্তবীর প্রহলাদ বললেন—বিষয়ের গন্ধ লাগতে না লাগতে হরিভজন সেরে নাও। শ্রীশুকদেব বললেন—

এতন্নির্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতো ভয়ম্
যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্ত্তনম্॥ ভাঃ ২।১।১১

শ্রীহরির নামকীর্ত্তন সকলের পক্ষেই হিতকারী। শ্রীশুকদেব বললেন—

প্রায়েণ মুনয়ো রাজন্নিবৃত্তা বিধিসেধতঃ।
নৈর্গুণ্যস্থা রমন্তে স্ম গুণানুকথনে হরেঃ॥ ভাঃ ২।১।৭

মহারাজ, আমি নির্গুণ ব্রহ্মে—সেই ব্রহ্মানন্দে ডুবে ছিলাম—কিন্তু উত্তম শ্লোক ভগবানের লীলা আমার চিত্তকে আকর্ষণ করে। তাতেই আমার এই ভাগবত শাস্ত্র অধ্যয়ন। এ হল মুক্তের ভোগ। মহাপ্রভু প্রশ্ন করলেন—মানুষ কার স্মরণ করবে? রামানন্দ বললেন—কৃষ্ণ নাম গুণ লীলা প্রধান স্মরণ। 'অঘারি নামই স্মরণীয়। অঘ বলতে পাপ বুঝায়—অঘারি মানে পাপহারী। তাহলে পাপহারী ভগবানের নামই মানুষের স্মরণীয়। আর অঘারি বলতে অঘাসুরবিনাশকারী কৃষ্ণকেও বুঝায়। এখন মানুষ তো অসাড়ে পাপ করে। গীতা বাক্যে বলা আছে—

"অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ।" গীঃ ৩।৩৬

জীব অবশে পাপ করে। ওঝার মন্ত্র উচ্চারণ মাত্রে যেমন বিষধর সাপ অবশে অবনত হয়, তেমনি অপ্রকৃত চিন্তামণি স্পর্শে জীবেরও পাপসর্প নিঃশেষে দলিত হয়। অবশে বা সবশে হোক জীব যে পাপ করে সেই সমস্ত পাপ অঘনাশকারী ধ্বংস করেন। পাপ তিন রকম—কায়িক, বাচনিক এবং মানসিক। যে নাম করব বলে মনে করে আগেই তার পাপ তাপ সব পলায় দূরে—সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে অন্ধকার রাশির মত।

মহারাজ পরীক্ষিত শ্রীশুকদেবের কাছে প্রশ্ন করেছেন—এই পাপ ক্ষালনের কি উপায়? শুকদেব বললেন—মহারাজ, চান্দ্রায়ন প্রভৃতি প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা পাপক্ষালন হবে। মহারাজ এতে সন্তুষ্ট হলেন না বললেন—এতে ঠিক ঠিক পাপক্ষালন হয় না—এটি কুঞ্জরশৌচবৎ—অর্থাৎ হস্তী স্নানের মত। হাতীকে স্নান করালে পরিস্কার হল বটে কিন্তু হাতী আবার পাঁক কাদা গায়ে মাখে। তেমনি প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা পাপক্ষালন করে মানুষ আবার পাপ করে। তাই পাপক্ষালনটি আত্যন্তিক হচ্ছে না। এরপরে শুকদেব বললেন—জ্ঞান সাধনের দ্বারা—জ্ঞানকে অগ্নি বলা আছে—তাই জ্ঞান অগ্নির দ্বারা পাপের বংশ ধ্বংশ হয়ে যায়। এতে রাজা সন্তুষ্ট হতে পারলেন না—বললেন এও পাপক্ষালনের ঠিক

উপায় হল না। এটি হল বেণুগুল্মমিবানলঃ। বাঁশবনে আগুন লাগিয়ে দিলে বাঁশবন পুড়ে যায় বটে—কিন্তু তার গোড়া থেকে যায়—তার ওপর যখন বৃষ্টি পড়ে তখন আবার বাঁশের ঝাড় গজিয়ে ওঠে। তেমনি জ্ঞানাগ্নির দ্বারা পাপের বংশ ধ্বংশ হল বটে—কিন্তু আবার তার ওপর যখন অপরাধরূপ সুবৃষ্টি পড়ে তখন পাপের বংশ গজিয়ে ওঠে। তখন শুকদেব আসল কথাটি বললেন—মহারাজ, পাপক্ষালনের একমাত্র উপায় হল শুদ্ধাভক্তি—

কেচিৎ কেবলয়া ভক্ত্যা বাসুদেব পরায়ণাঃ।
অঘং ধুন্বন্তি কার্ৎস্নেন নীহারমিব ভাস্করঃ॥ ভাঃ ৬।১।১৫

সূর্য্যের কিরণ পড়লে যেমন শিশিরবিন্দু নিঃশেষে শুকিয়ে যায়—তাকে যেমন আর দেখা যায় না—তেমনি শুদ্ধাভক্তিতেই একমাত্র পাপের বংশ নিঃশেষ হয়ে যায়। তাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার বললেন—

জ্ঞানী জ্ঞানী মুক্ত দশা পাইনু করি মানে।
বস্তুতঃ চিত্তশুদ্ধি নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে॥

বহুদিনের আবর্জ্জনাপূর্ণ একটি বদ্ধ ঘরকে ভাল করে ঝাড় দিয়ে জল দিয়ে ধুলেও ঠিক বসবাসের যোগ্য হয় না—তার কষায় দোষ থেকে যায় তাই ব্যবহারের যোগ্য করবার জন্য অগুরু চন্দন জল দিয়ে ধুয়ে ধূপ ধুনা দিয়ে সুধূপিত করলে তবে বসবাসের উপযোগী হয়—তেমনি আমাদের হৃদয় ঘরটি কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্য—অনাদিকালের দুর্ব্বাসনা মালিন্যে ভরা—এই ঘরকে বসবাসের উপযোগী করতে হলে কে বাস করবেন এই ঘরে? মধুসূদন বাস করবেন—তাই অন্য উপায়ে হৃদয় ঘর মার্জ্জিত হলেও ঠিক যেন শুদ্ধ হয় না। তাকেও ভক্তি ধূপের দ্বারা সুধূপিত করলে তবে ঠিক ঠিক শুদ্ধি হবে। যেমন গঙ্গাবারি সব জিনিষকে পবিত্র করলেও সুরাকুম্ভকে (মদের কলসীকে) পবিত্র করে না। পবিত্র করতে পারে না তা নয়—পবিত্র করে না। তেমনি ভগবদ্‌বিমুখতারূপ যে সুরাযুক্ত আমাদের চিত্ত তাকে অন্য কোন প্রায়শ্চিত্ত বা অন্য কোন সাধন জ্ঞান, যোগ পবিত্র করতে পারে না—কৃষ্ণে সমর্পিত চিত্তের পাপই নিঃশেষে দূর হয়। শুদ্ধাভক্তিই পাপক্ষালনের একমাত্র উপায়। কৃষ্ণচরণারবিন্দের গুণে আকৃষ্ট হয়ে মন যদি একবারের জন্যও তাঁর চরণে যায় তাহলে সে স্বপ্নেও যম বা যমের দূতকে দর্শন করে না—

একথা শুকদেব বলেছেন। তার সকল রকমের পাপক্ষালন অনায়াসে হয়ে যায়। এইটিই ভক্তি সাধনের অন্যতম ফলশ্রুতি।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর যে প্রশ্ন ছিল—'বলত, রামানন্দ, কিং স্মর্ত্তব্যম্?' জীবের পক্ষে স্মরণীয় কি? রামানন্দ উত্তর দিলেন—'অঘারি নাম।' তার তাৎপর্য্য হল—ভগবানের পরম কৃপা। কারণ বিষ্ণু বৈষ্ণবে অপরাধ থাকলে তো মুক্তি হয় না। অঘাসুর তার উদরে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ং ভগবান এবং বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ গোপবালকদের গ্রাস করেছে—তাহলে তার আত্মা কৃষ্ণপাদপদ্মে লীন হয়ে যায় কি করে? অঘাসুরের তো এ মুক্তি পাওয়ার কথা নয়—কারণ ভগবানের চরণে আত্মা লীন হওয়ার নামই তো মুক্তি। অঘাসুরকে মুক্তি দান—এটি ভগবানের পরম কৃপা। অঘাসুরের দেহ গোপবালকদের খেলার জিনিষ হবে বলে তার ওপর ভগবানের কৃপা হল। দেহের কোন অংশ যদি কৃষ্ণসেবায় লাগে তাহলে তার দ্বারাই ভগবানের কৃপা হয়। এমন যে কৃপাকারী পাপতাপহারী শ্রীহরি তাঁর নামই জীবের সর্ব্বদা স্মরণ করা উচিত। এইটিই শ্রীমন্মহাপ্রভুর অভিলষিত। তাই তাঁর মন বুঝে রামনন্দ বললেন—অঘারি নামই স্মরণীয়॥

কেবলমাত্র শুদ্ধাভক্তি পথেই কোন স্খলন নেই, কোন পতন নেই। ভাগবত ধর্ম যিনি অবলম্বন করেন তাঁর কোন প্রত্যবায় নেই। বলা আছে—

পতিতঃ স্খলিতো ভগ্নঃ সংদষ্টস্তপ্ত আহতঃ।
হরিরিত্যবশেনাহ পুমান্নার্হতি যাতনা॥ ভাঃ ৬।২।১৫

যে কোন ব্যক্তি যদি পতিত, স্খলিত, ভগ্ন, সংদষ্ট, তপ্ত বা আহত হয় কিন্তু সে যদি অবশে হরিনাম উচ্চারণ করে তাহলে সকল যন্ত্রণার হাত হতে নিস্কৃতি পায়।

আরও বলা আছে—

সধ্রীচীনোহ্যয়ং লোকে পন্থাঃ ক্ষেমোহকুতোভয়ঃ।
সুশীলাঃ সাধবো যত্র নারায়ণ পরায়ণাঃ॥ ভাঃ ৬।১।১৫

তাই ভক্তিমার্গই সবচেয়ে সুগম পন্থা। ভগবদ্ভক্ত রাজা ভগবানকে স্তুতি করেছেন—

ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেজ্জনস্য তর্হ্যচ্যুত সৎসমাগমঃ।
সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্‌গতৌ পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে রতিঃ।
ভাঃ ১০।৫১।৫৩

মুচুকুন্দ রাজা কৃষ্ণভক্ত না হলে কি এত বল হয়? শ্যামলবরণ কৃষ্ণদর্শনে মুচুকুন্দ রাজা মুগ্ধ। একদিনের কৃষ্ণ আরাধনাও বিফল হয় না। রাজা যে একদিন অকপটে কৃষ্ণ ভজেছিলেন তার ফল পরিণামে লাভ করলেন। রাজার কাছে কৃষ্ণ নিজেকে বাসুদেব বলে পরিচয় দিলেন। অন্য কোন প্রলোভন যাঁর চিত্তকে লুব্ধ করতে পারে না—তার ওপরেই কৃষ্ণ কৃপা হয়। মুচুকুন্দ বললেন—জীব অনাদি কাল থেকে সংসার আবর্ত্তে ঘুরছে। পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যু। এর বিরাম নেই, বিচ্ছেদ নেই। এইভাবে ভ্রমণ করতে করতে যখন কোনও ভাগ্যবানের জীবনে সাধুসঙ্গ ঘটে যায় তখন সেই সাধুসমাগমের ফলে তার সদ্‌গতি লাভ হয়। পরম পুরুষ শ্রীগোবিন্দে তার রতি লাভ হয়। কৃষ্ণভক্তের কৃপায় ভক্তি লাভ এইটিই ভক্তিলাভের সহজ পথ। ভগবানে রতি লাভ এইটিই সাধুসঙ্গের মুখ্যফল। আর ভগবানে রতি জন্মালে যে সংসার নাশ হয় এটি হল আনুষঙ্গিক ফল। তার সংসারতরু সমূলে উৎপাটিত হয়।

রাজকুমারকে যদি ভূতে ধরে তাহলে তার স্বস্থতা থাকে না। তেমনি জীব নিত্য কৃষ্ণদাস—সে রাজার কুমার, অমৃতের পুত্র। তাকেও মায়াভূতে ধরেছে। জীবের এই উন্মাদ ব্যাধি সারাতে পারে একমাত্র সাধুসঙ্গ বৈদ্য। এই সাধুসঙ্গের ফলেই নাম প্রসঙ্গ হয়—কারণ সাধু গুরু বৈষ্ণবই হলেন নাম দাতা। এই অঘবিনাশকারী নামই জীবের সর্ব্বদা স্মরণীয়।

বহুদিন আগে দ্বাপরযুগে গঙ্গাতীরে একটি চিত্র হয়ে গেছে। মহারাজ পরীক্ষিতের প্রয়োপবেশনের চিত্র—সমবেত ঋষিকুল মহারাজ পরীক্ষিৎ শ্রীপাদ শ্রীশুকদেবকে প্রশ্ন করেছেন—

অতঃ পৃচ্ছামি সংসিদ্ধিং যোগিনাং পরমং গুরুম্
পুরুষস্যেহ যৎ কার্য্যং ম্রিয়মাণস্য সর্ব্বথা।
যচ্ছ্রোতব্যমথোজপ্যং যৎ কর্ত্তব্যং নৃভিঃ প্রভো।
স্মর্ত্তব্যং ভজনীয়ম্বা ব্রুহি যদ্বা বিপর্য্যয়ম্॥
নূনং ভগবতো ব্রহ্মন্ গৃহেষু গৃহমেধিনাং।
ন লক্ষ্যতে হ্যবস্থানমপি গোদোহনং ক্বচিৎ॥

ভাঃ ১।১৯।৩৪-৩৬

শ্রীশুকদেবকে দর্শন করেই মহারাজের তৃপ্তিতে বুক ভরে গেছে। তাই

তো তিনি তাঁকে এই প্রশ্ন করতে পেরেছেন। অন্য মুনির তহবিলে তেমন সাধন জমা নেই—তাই তাঁরা তাঁর উত্তর দিতে পারেন নি। অবধূতবেশে শ্রীশুকদেব সেখানে উপস্থিত। মহারাজ কৃষ্ণ দর্শনের আনন্দ পেলেন শুকদেবকে দর্শন করে। দেবর্ষিপাদ নারদ, বেদব্যাস শুকদেবকে আসনে বসালেন। কৃষ্ণসঙ্গে শুকদেব মিথিলায় বেড়িয়েছেন। মহারাজ পরীক্ষিৎ ও শুকদেব দুজনেই কৃষ্ণ-কৃপাপাত্র। তাই রাজা নিশ্চিন্ত হয়ে আছেন যে বাসনা পূরণ তাঁর হবেই। মহারাজের প্রশ্নে শ্রীশুকদেব অত্যন্ত সুখী হয়েছেন। শুকদেব আনন্দে বিভোর হয়ে বললেন—

বরীয়ানেষ তে প্রশ্নঃ কৃতোলোকহিতো নৃপ। ভাঃ ২।১।১

সংসারে মানুষ সাধারণত আত্মীয়স্বজন বিষয় নিয়েই প্রশ্ন করে—আত্মা সম্বন্ধে বড় একটা কেউ প্রশ্ন করে না। সাধারণ মানুষের অনেক কিছু শুনবার আছে, অনেক কিছু বলবার আছে, অনেক কিছু ভাববার আছে, কিন্তু যারা আত্মোপলব্ধি করতে চায়, মৃত্যুভয় নিবারণ করতে চায়, অভয়ের পাদপদ্মে পেতে চায় তাদের বেশী কিছু করবার নেই। তাদের তিনটি কাজ—হরিকে কানে নিতে হবে—যার নাম শ্রবণ, হরিকে বচনে নিতে হবে—যার নাম কীর্ত্তন আর হরিকে মনে নিতে হবে—যার নাম স্মরণ।

তস্মাৎ ভারত সর্ব্বাত্মা ভগবানীশ্বরো হরিঃ।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যশ্চেচ্ছতাভয়ম্॥ ভাঃ ২।১।৫

এখানেও শ্রবণ, কীর্ত্তন এবং স্মরণের কথা বলা হল।

শ্রুতিবাক্যেও একটি বিধি ও একটি নিষেধের কথা বলা আছে।

স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুঃ বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ।
সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ॥

শাস্ত্রে একটাই বিধি ভগবান বিষ্ণুকে স্মরণ করতে হবে—আর একটাই নিষেধ তাঁকে কখনও বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়। এ ছাড়া যত বিধি নিষেধ আছে সব এই বিধিবাক্য ও নিষেধ বাক্যের অনুগত। তাই আত্মকল্যাণ প্রার্থনা করলে হরিই একমাত্র স্মর্ত্তব্য। জীবমাত্রই মাতৃগর্ভে প্রতিজ্ঞা থাকে—'এবার জন্মে তোমায় ভজব।' তাই সকাল সকাল ভজন সেরে নিতে হবে। বয়স এগিয়ে গেলে আর কিছু করা যাবে না। কারণ ভিখারী সকাল সকাল ভিক্ষা করবে সন্ধ্যাবেলা কেউ ভিক্ষা দেয় না। তেমনি

সাধককেও জীবনের পূর্ব্বাহ্নে ভজন করে নিতে হবে—জীবনের সায়াহ্নে কিছু করা যাবে না।

শ্রীপাদ রামানন্দকে শ্রীমন্মহাপ্রভু যে প্রশ্ন করছেন—কিং স্মর্ত্তব্যম্? যদিও মহাপ্রভু এখানে স্মরণ বিষয়ে প্রশ্ন করলেন কিন্তু স্মরণটি এখানে উপলক্ষণে। স্মরণ বলতে কিন্তু কীর্ত্তন, বন্দন এদেরও বুঝাচ্ছে। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি সব যুগেই নাম সংকীর্ত্তনের মহিমা বলা আছে। কিন্তু কলিযুগ ছাড়া অন্য যুগে নামসংকীর্ত্তনকে সাধন হিসাবে প্রচার করা হয় নি। তার কারণ হল সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এই তিনযুগের মানুষের সাধনবল ছিল, তাদের সামর্থ্য ছিল, তাঁরা ধ্যান ধারণা যাগযজ্ঞ, পূজা অর্চ্চনা করতে পারতেন—তাদের যদি বলা যেত কেবলমাত্র জিহ্বা এবং ওষ্ঠ চালনে নামকীর্ত্তন করলে সাধন হবে, তাহলে তারা বিশ্বাস করতেন না—আর বিশ্বাস না করলে তো কোন কাজ হবে না। যেমন ধনবান ব্যক্তির কাছে অল্প পারিশ্রমিকের চিকিৎসক বিশ্বাসের পাত্র হয় না। তাই শাস্ত্র কলিযুগ ছাড়া অন্যযুগে নামসংকীর্ত্তনকে সাধন হিসাবে প্রচার করেন নি। কিন্তু কলিযুগের দুঃস্থ জীবের হিতৈষী হয়ে করুণা পারাবার মহাপ্রভু আবির্ভূত হলেন এবং কলিজীবের একমাত্র সাধন নামধর্ম প্রচার করলেন।

ভগবান বুদ্ধদেবকে দশ অবতারের মধ্যে গণনা করা আছে বটে কিন্তু তাঁর যে মত 'অহিংসা পরমো ধর্মঃ'—এই মতটি কিন্তু বেশীর ভাগ লোকেই গ্রহণ করে নি। কারণ এ মতটি বেদবিহিত নয়। কিন্তু মহাপ্রভু যে নামধর্ম প্রচার করলেন এটি শাস্ত্রসম্মত। কৃতযুগ অর্থাৎ সত্যযুগে ধ্যান বা তপস্যা, ত্রেতাযুগে যাগযজ্ঞ, দ্বাপরে অর্চ্চনা পূজা এবং কলিতে শ্রীনামসংকীর্ত্তন। কলিজীবের মন ধ্যান করবার উপযোগী নয়। ত্রেতাযুগের যাগযজ্ঞ তাও কলিযুগে সম্ভব নয়—কারণ দ্রব্যে, স্থান, কাল সবটাতেই অশুদ্ধি, দ্বাপরযুগের ধর্ম যে পূজা তাতেও দ্রব্যশুদ্ধি চাই—সেও কলিযুগে সম্পূর্ণভাবে হয় না।

মহারাজ পরীক্ষিতের রাজত্বকালে যখন কৃষ্ণচন্দ্র ও অর্জ্জুন দুজনেই অপ্রকট তখন কলির আবির্ভাব ঘটে। ধর্মকে কলিরাজ শক্তিহীন করছেন তাতে মহারাজ পরীক্ষিৎ কুপিত হলেন। মহারাজ পরীক্ষিৎ কুপিত হলেও কলিরাজকে দমন করেছেন কিন্তু বিনাশ করেন নি। কলিরাজ জগতের উৎপীড়ক কিন্তু তার একটি ভাল গুণ আছে—এই কলিযুগে যে

নামসংকীর্ত্তনকে অবলম্বন করতে পারবে তার আর কোন চিন্তা নেই। তার সর্ব্ব সিদ্ধি লাভ হবে। তাই মহারাজ দেখলেন কলিপুষ্পে নাম সংকীর্ত্তন মধু আছে। ফুলটিকে নষ্ট করলে যেমন তার মধুটুকু আর পাওয়া যায় না তেমনি কলিরাজকে বিনাশ করলে তার সংকীর্ত্তন মধু মিলবে না। তাই কলিকে দমন করে রাখলেন। সংসারে মানুষকে বেঁধে রাখার রজ্জু হল আসক্তি। কেউ তো দড়ি দিয়ে কাউকে বেঁধে রাখে না। এই বন্ধন শিথিল করবার একমাত্র উপায় হল ভগবানের নাম নিরন্তর করা। যেমন কটিদেশের বসন কেউ খুলে ফেলতে পারে না—কিন্তু ঐ ব্যক্তি যদি কখনও নেশা করে মাতাল হয়ে যায় তখন তার কটিদেশ হতে কখন বসন খসে যায় সে জানতেই পারে না—তেমনি মানুষ এ সংসারের আসক্তিবন্ধন কিছুতেই ছাড়তে পারে না। কিন্তু নিরন্তর কৃষ্ণনাম করবার ফলে তাতে যখন প্রেম হবে তখন সেই প্রেম মদিরা পানে মত্ত হলে কখন তার বাসনাবসন চলে যাবে সে জানতেই পারবে না। এখন অনেকের মনে হতে পারে ভগবানের নাম শুধু কীর্ত্তন করলে তাতে কি ফল হবে? এর সঙ্গে কিছু জ্ঞানচর্চ্চা, যোগ অভ্যাস করতে হবে। এটি আমরা অজ্ঞতায় ভাবি। জীবের অপরাধের ফলে নামসংকীর্ত্তনকে দুর্ব্বল সাধন বলে মনে হয়। যার ফলে অন্য অনুষ্ঠানে প্রবৃত্তি জাগে। যেমন মা যশোমতীর বিশুদ্ধ ঘন বাৎসল্যে মনে হয়েছিল গোপালের কনিষ্ঠ অঙ্গুলি বুঝি দুর্ব্বল—সে সপ্তক্রোশ ব্যাপী গিরিরাজ গোবর্দ্ধনকে সপ্তাহকাল ধারণ করতে পারবে না। তাই শ্রীদাম সুদাম সখাকে ডেকে বলেছেন—অতবড় পাহাড়টা আমার দুধের বালক গোপাল কি ধরতে পারে—তোরা একটু ধর না বাবা।

কলির আবির্ভাবে চারিদিকে ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন। তাতে ধর্ম কর্ম সব লোপ পেল। মহাজন বললেন—

কলিঘোর তিমির গরাসল জগজন
ধরম করম গেয় দূর
অসাধনে চিন্তামণি বিধি মিলাওল আনি
আমার গোরা বড় দয়ার ঠাকুর॥

কলিজীব তো গৌর পাবার জন্য বা গৌর আনার জন্য কোন সাধন করে নি। বিধাতা অসাধনে গৌরচিন্তামণিকে এনে দিয়েছেন। এখানে

জীবের অন্ধকার বলতে অনাদি কালের কৃষ্ণবিমুখতাই বুঝাচ্ছে। কিন্তু শুধু অন্ধকার দূর হলেই যে কাজ হবে তা নয়। ঘরের অন্ধকার শুধু দূর হলেই হবে না—দেবতার জন্য আসন পাততে হবে। পূজার অন্যান্য উপকরণ আনতে হবে। হৃদয়ের অন্ধকার দূর হল বটে কিন্তু ঠাকুরের সঙ্গে তো সাক্ষাৎকার হয় নি। ভক্তই হলেন মূর্তিমান ভাগবত। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে তবে বস্তুর সঙ্গে পরিচয় হবে। তখনই হৃদয় মন্দিরে ঠাকুরের প্রতিষ্ঠা হবে। কলির অন্ধকার যত গাঢ় শ্রীগৌরচন্দ্রের পূর্ণ পূর্ণতম শশীর আলো তত বেশী। তাই কলিরাজ শ্রীগৌরসুন্দরের শরণাগত হয়ে বলছেন—

যে তোমার নাম লয় তারে মোর নাহি দায়
এই সত্য করিনু নিশ্চয়।

তাহলে দেখা যাচ্ছে কলিযুগে যে আমরা উন্নতোজ্জ্বলরসপূর শ্রীকৃষ্ণনামসংকীর্ত্তনের মূল আচার্য্য ও প্রচারক শ্রীমন্মহাপ্রভুকে আমাদের একান্ত আপনার করে ঘরে পেয়েছি এটি মহারাজ পরীক্ষিতের দান। মহারাজ পরীক্ষিৎ ত্রিকালদর্শী। তাই দ্বাপরযুগে বসেও কলিযুগে ভাবী কলিজীবের দুর্গতি উপলব্ধি করেছিলেন। যার ফলে কলিজীবের দুর্গতি দূর করবার জন্য শ্রীগৌর পাদপদ্মমধু দান করে গেছেন। তাই মহারাজ শুধু মহারাজ নন তিনি মহাদাতা। তাই নিজে ভোগ না করলেও জীবের জন্য দান করে গেছেন। নিতাই গৌর কলিযুগের পতিত জীবের মহাপাবনাবতার। তাই পাপহারীর নাম উচ্চারণ করতে গেলেই কলিজীবের সকলের আগে নিতাই গৌরের নামই অবশ্য উচ্চারণ করতে হবে। পরে যে কোন অন্য নাম করা যেতে পারে। নিতাই গৌর নাম ছাড়া কৃষ্ণনাম কলিযুগে সুসিদ্ধ হবে না।

শ্রীপাদ রামানন্দকে যখন মহাপ্রভু প্রশ্ন করলেন—'কিং স্মর্ত্তব্যম্?' জীবের কি স্মরণ করা উচিত বলত রামানন্দ। এ প্রশ্নের উত্তর কি হবে এটিও মহাপ্রভুর অজানা নয়। কিন্তু নিজের নাম প্রচার ও আস্বাদনের জন্য তাঁর এই প্রচ্ছন্ন প্রশ্ন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ অবশ্য আস্বাদন করেছেন—'কৃষ্ণ নাম গুণ লীলা প্রধান স্মরণ।' এখানে একটু আবরণ দেওয়া আছে। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে শ্রীকবিকর্ণপূর গোস্বামিপাদ যিনি গৌরকরুণা সাক্ষাৎভাবে পেয়েছেন তিনি আস্বাদন করলেন—

রামানন্দও পরম কুতূহলী হয়ে মহাপ্রভুর প্রচ্ছন্ন প্রশ্নটিকে আরও আবরণে রেখে উত্তর দিলেন—'অঘারি নাম।' এ যুগ যে ছন্নতার যুগ। প্রশ্নও যেমন আবৃত উত্তরও তেমনি আবৃত। সর্বত্রই আবরণের খেলা। কৃষ্ণনাম গোবিন্দনাম কিছুই বললেন না। বললেন—'অঘারি নাম।' অর্থাৎ পাপহারীর নামই একমাত্র স্মরণীয়। এই ইঙ্গিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রতি। এই দুর্গত কলিজীবের পক্ষে পরমপাপহারী তোমার নাম স্মরণ ছাড়া কলিজীবের আর কি গতি থাকতে পারে? রামানন্দ তাই অন্তরের উল্লাসে বললেন—তোমার নাম এবং তোমারই অভিন্নস্বরূপের অর্থাৎ নিতাই চাঁদের নাম উচ্চারণই কলিজীবের একমাত্র স্মরণীয়।

(৯)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর যে শ্রীপাদ রামানন্দ রায়ের কাছে প্রশ্নের পর প্রশ্ন—সেটি তাঁর নিজের রস আস্বাদনের জন্য। রস আস্বাদন আবার দু'রকম। একটি শুধু নিজের জন্য আর অন্যটি হল যে নিজের রস আস্বাদন করলেও আনুষঙ্গে আরও অনেকে পেয়ে যায়। একা আস্বাদন করলেও অর্থাৎ অন্যকে আস্বাদন দেবার সঙ্কল্প না থাকলেও আনুষঙ্গে অনেকে পেয়ে যায়। তাই মহাপ্রভু যখন নিজেই রস আস্বাদন করতে বসেছেন—কিন্তু তার ফলে কলিজীবও কিছু পেয়ে গেল। শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিজের রস আস্বাদন কালে কলিজীবের উদ্ধার কাজটি হয়ে গেল। গৌরসুন্দর পরবর্তী প্রশ্ন করলেন—

প্রভু কহে, 'ধ্যেয় মধ্যে জীবের কর্ত্তব্য কোন্ ধ্যান?'
রায় কহে, 'রাধাকৃষ্ণপদাম্বুজধ্যান প্রধান॥'

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রশ্ন—মানুষের ধ্যানের বস্তু কি? মানুষ কি বিষয়ে ধ্যান করবে? মানুষ চিন্তা করে ধ্যান করে কোন বস্তু—যেটি তাঁর মনের প্রিয় বস্তু এবং উপকারী বস্তু। অনন্তকোটি জীব ভেদে এই ধ্যানের বস্তু বিভিন্ন। ধন, জন, পুত্র, গৃহসম্পদ, আরোগ্য, যশ, শ্রী, আয়ু, স্বর্গ প্রভৃতি। কিন্তু এ তো গেল রোগীর কথা। যাদের মস্তিষ্ক বিকৃত তাদের ধ্যানের বিষয়। ব্যাধিগ্রস্ত জীবের চিন্তার বিষয় অনেক হতে পারে কিন্তু সুস্থ লোকের পক্ষে চিন্তার বিষয় একটিই যেটি বিচার করলে দেখা যাবে সকলের উপকারী এবং সকলের প্রিয়। মায়াব্যাধিমুক্ত সুস্থচিত্ত ধৌতাত্মা যারা তাদের পক্ষে চিন্তার বস্তু কি এইটিই মহাপ্রভুর প্রশ্ন। অন্ন ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে অরুচির বস্তু হতে পারে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেটি তো অরুচির বস্তু

নয়। ব্যাধিমুক্ত যারা তাদের সকলেরই তো অন্নে রুচি আছে। সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও সরস সুখময় এমন কোন বস্তু আছে যেটি সর্ব্বদা ধ্যানের যোগ্য। তাতে দুঃখের স্পর্শ তো থাকবেই না অপ্রিয়ও হবে না। সর্ব্বদা উপকারী এবং নিত্য প্রিয় হবে। এমন কি বস্তু আছে যেটি জীবের সর্ব্বদা ধ্যেয়। শ্রীপাদ রামানন্দ মহাপ্রভুর প্রশ্ন শুনে মনে মনে চিন্তা করলেন—প্রভু গো! তোমার প্রশ্নের হার্দ্দ্য উত্তরটি খুঁজে পাওয়া কঠিন। উত্তরটি খালি চোখে ধরা পড়ে না। কিন্তু চন্দ্র সূর্য্য সম যে তোমার ভাস্বর জ্যোতি তার কৃপা কিরণে সে বস্তু খুঁজে পাব আশা করি। তোমার কৃপা যে অঘটন ঘটনপটীয়সী। অসম্ভব সম্ভব করতে পারে। তাই তোমার অযাচিত কৃপার ওপর নির্ভর করেই এর উত্তর দিই। কারণ—

পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে শৈলং মূকমাবর্ত্তয়েচ্ছ্রুতিম্।
যৎ কৃপা তমহং বন্দে কৃষ্ণচৈতন্যমীশ্বরম্॥

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত

গোদাবরী তীরে আজ বক্তার আসনে বসেছেন শ্রীপাদ রামানন্দ রায় আর শ্রোতা হলেন শ্রীমন্মহাপ্রভু। ভগবান আজ শ্রোতা হয়ে বসেছেন আর ভক্ত বক্তার আসনে। এ লীলা এর আগে কখনও হয় নি। এ যে দেখি বিপরীত লীলা। এ বড় বিচিত্র লীলা। এ লীলায় রসাস্বাদনের পরিপাটির চরম অবস্থা। রসভোগই ভগবানের একমাত্র কাজ। ভগবানের অন্য কোন কাজ নেই। তাই রস যেখানে নেই ভগবান সেখানে নেই। ব্রজের রস হল উন্নতরস। রসে যদি অবস্থান্তর ঘটে অর্থাৎ রসে যদি অন্য কোন কিছুর মিশ্রণ ঘটে তাহলে সেটি দোষের। ব্রজের রস হল খাঁটি রস। এখানে কোন ভেজাল নেই। তাই এ রসের বড় দাম। ব্রজের বাজারে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য মধুর চারি রসের দোকানী রসের পসরা নিয়ে বসেছে—এ রসে ভগবানের বড় আঠা। ভগবান এখানে বেশী করে মজেছেন। এমনই মজেছেন যে নিজের ভগবত্তা পর্য্যন্ত ভুলে গেছেন। তাই ক্ষুধাহীন, তৃষ্ণাহীন শ্রীবালগোপাল যশোদা মায়ের আঁচল ধরে একটু ননীর জন্য কেঁদেছেন। সুখময় ভগবান আনন্দের খনি আজ কাঁদছেন। ভগবত্তা ভুলে যাওয়াই এর মূল কারণ। ব্রজের রস তাঁকে যেমন তৃপ্তি দান করেছে এমন আর কেউ পারে নি। ব্রহ্মা যিনি বাক্‌পতি, ভগবান বাসুদেবের শিষ্য, পুত্র, সনকাদি মুনিগণের পিতা, যিনি পদ্মযোনি তিনি

যখন বালগোপালের স্তুতি করছেন তখন বালগোপাল কোন কথাই বলেন নি, অথচ যমলার্জ্জুন নলকূবর মণিগ্রীব যখন কৃষ্ণস্তুতি করলেন তখন ভগবান তাঁদের সঙ্গে হেসে হেসে কত কথা বলেছেন—নলকূবর মণিগ্রীব তো উপদেবতা আর ব্রহ্মা হলেন দেবোত্তম। ব্রজলীলারসে ভগবান এতই আবিষ্ট যে ভগবানের ব্রহ্মার স্তুতিতেও কোন বোধ নেই। যমলার্জ্জুন অভিশপ্ত হয়েও কিন্তু ব্রজের মাটিতে জন্ম পেয়েছে। দেবর্ষিপাদ নারদ তাঁদের ব্রজরসের অধিকার দিয়েছেন। এটি ভক্তকৃপা। ভক্তকৃপা যাঁদের ওপর হয় তাঁদের কৃপা করতে ভগবানের আপত্তি নেই। তাই যমলার্জ্জুনের সঙ্গে ভগবানের প্রীতিরস স্থাপন হয়েছে। অথচ ব্রহ্মার ওপরে ভক্তকৃপা নেই বলে তার স্তুতিতে ভগবানের ভ্রূক্ষেপ নেই।

শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মধ্যান সকল অভীষ্ট বস্তু দান করে। এই অভীষ্টদান কাজটি হল আনুষঙ্গিক আর মুখ্য কাজ হল তাপ নিবারণ। সকল তীর্থের আস্পদ হল এই পাদপদ্ম। এখন প্রশ্ন হতে পারে এই পাদপদ্ম কি কেউ ধ্যান করেছেন? তার উত্তরে বলা যায় জগতে মহাজনের মধ্যে দু'জন শীর্ষস্থানে রয়েছেন শিব দেবাদিদেব শঙ্কর আর সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতা ব্রহ্মা। তাঁরাও এই কৃষ্ণচরণ ধ্যান করেন। কাজেই শিবব্রহ্মা যখন কৃষ্ণপাদপদ্ম ধ্যান করেন তখন মানুষ ধ্যান করবে এ আর কোন্ কথা। এ তো করবেই। কারণ গীতাবাক্যে বলা আছে—

যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥ গীঃ ৩।২১

মহাজন যেটি আচরণ করেন সেইটিই অনুসরণীয়। এর ওপরও মনে হতে পারে সে কৃষ্ণপাদপদ্মের ধ্যান তো অনেকে করেছেন তাহলে সে ধ্যান করা শেষ হয়ে গিয়েছে। না, তা বলা যাবে না। কারণ ভগবানের পাদপদ্মের ধ্যান কখনও শেষ হয় না। কারণ কৃষ্ণপাদপদ্মের মাধুর্য্য কখনও শেষ হয় না, বরং উত্তরোত্তর বাড়ে। যত আস্বাদন ততই মাধুর্য্য নিত্য নবনবায়মান। নিতুই নিতুই বাড়ে। নব নব বিভ্রমশালী। গোপবালারা কৃষ্ণচরণের অনেক বিশেষণ দিয়েছেন।

প্রণতকামদং পদ্মজার্চ্চিতং ধরণীমণ্ডনং ধ্যেয়মাপদি।
চরণপঙ্কজং শন্তমঞ্চ তে রমণ নঃ স্তনেম্বর্পয়াধিহন্॥
ভাঃ ১০।৩১।১৩

বিপদে ধ্যানের যোগ্য এই পাদপদ্ম। গজরাজ যখন বিপদগ্রস্ত—সঙ্গিনী হস্তিনীর দল যখন সকলে এক এক করে বিদায় নিয়েছে—এ জগতেও তাই হয়। যখন ধনবল শরীরের সামর্থ্য থাকে তখন পাশে অনেক বন্ধু দেখা যায়—কিন্তু মানুষ যখন সব হারিয়ে ফেলে তখন দেখা যায় পাশে কেউ নেই। সংসারের চিত্রটাই শ্রীশুকদেব ধরে দিয়েছেন—গজেন্দ্র তো দৃষ্টান্ত মাত্র। পাঁচ হাজার বছর ধরে গজেন্দ্রের সঙ্গে কুমীরের যুদ্ধ। গজরাজের দেহবল মনোবল, ইন্দ্রিয়বল, সব চলে গেছে—পরমায়ুও যায় যায়, তখন গজেন্দ্র ভগবানকে স্মরণ করছে। এই কুমীরও হলেন অভিশপ্ত হূ হূ নামে এক গন্ধর্ব্ব—দেবল ঋষিকে লঙঘন করায় এই গন্ধর্ব্ব কুমীর যোনি পেয়েছিলেন। অভিশাপ মুক্তির ব্যবস্থা—তিনি যদি কোন ভক্ত চরণাশ্রয় করতে পারেন তাহলে মুক্তি হবে। তাই ভক্ত গজরাজের চরণাশ্রয় করেছেন। বিপদগ্রস্থ গজেন্দ্র আর্ত্তিভরে ভগবানকে স্মরণ্ করেছে। বৈকুণ্ঠনাথ শ্রীমন্নারায়ণ তার আর্ত্তিতে এসে সুদর্শন চক্র দিয়ে কুমীরকে বিনাশ করে গজেন্দ্রকে উদ্ধার করেছেন। শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম ভৃত্যের আর্ত্তিকে হরণ করেন। এমনকি ভৃত্যের সেবাকেও অপেক্ষা করেন না। যার কেবলমাত্র নিজেকে ভগবানের পাদপদ্মে দাস বলে অভিমান আছে, যে বলতে পেরেছে—'প্রভু, আমি তোমার হলাম'—এই বলে কায়মনোবাক্যে তাঁর চরণে নিজেকে বিকাতে পেরেছে তার সকল দুঃখ তিনি দূর করেন। শ্রীগোবিন্দপাদপদ্ম ভব সাগরের ভেলা। শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম ছাড়া জীবকে মায়ার কবল হতে আর কে রক্ষা করবে? ভগবান নিজেও বলেছেন—

মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে। গী ৭।১৪

আমার চরণে যে একান্ত ভাবে শরণাগতি নিতে পারে অর্জ্জুন, মায়ার হাত হতে সে অনায়াসে নিষ্কৃতি পেতে পারে। তাই শ্রীপাদ রামানন্দ রায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর হার্দ্দ্য জেনে তাঁরই কৃপা প্রেরণায় উত্তর দিলেন—রাধাকৃষ্ণপদাম্বুজ ধ্যানই প্রধান। মুরারির পাদপদ্মই একমাত্র ধ্যানের যোগ্য।

শ্রীমন্মহাপ্রভু রামানন্দ রায়কে প্রশ্ন করেছেন—'ধ্যেয় মধ্যে জীবের কর্ত্তব্য কোন ধ্যান?' রামানন্দ রায় উত্তর দিয়েছেন—'রাধাকৃষ্ণপদাম্বুজধ্যান প্রধান।' রাধাকৃষ্ণার্চ্চন দীপিকা গ্রন্থে শ্রীজীবগোস্বামিপাদ বলেছেন—

রাধাকৃষ্ণপদারবিন্দকে লাভ করতে পারলে জীবের আত্যন্তিক সুখ। এ কথা বলা হল কেন? আত্যন্তিক সুখ বলতে বুঝায় অভয়প্রাপ্তি এবং সুখসম্পদ প্রাপ্তি। ভগবৎসান্নিধ্য না হলে অভয় লাভ হয় না। কারণ তিনিই তো একমাত্র অভয়—আর সব জায়গাতেই তো ভয়। তাই অভয়ের চরণাশ্রয় ছাড়া তো ভয় নিবারণ হতে পারে না। দ্বিতীয় বস্তুতে অভিনিবেশ থেকেই ভয়ের উৎপত্তি। ভগবৎসেবাতে নিজেকে নিয়োগ করতে পারলে তবে সুখসম্পদ্ প্রাপ্তি। রজঃ তমঃ মায়ারহিত মায়াতীত নির্ভয় ভগবানের সান্নিধ্যে আর কোন ভয় থাকে না। চোরের ভয়ে মানুষ যেমন মহারাজার আশ্রয় নেয় এও তেমনি মায়াচোরের ভয়ে জীব রাজাধিরাজ শ্রীগোবিন্দের আশ্রয় নেয়। ভগবানের বিশেষণ আছে সৎ, চিৎ আনন্দ। এর মধ্যে সৎ ও চিৎ এ দুটি হল বিশেষণ আর আনন্দ হল বিশেষ্য। সৎ বলতে নিত্য বর্ত্তমান বুঝায় আর চিৎ বলতে স্বপ্রকাশ জ্ঞানস্বরূপকে বুঝায়। এখন এখানে প্রশ্ন হচ্ছে ধ্যানের বস্তু রাধাকৃষ্ণপদাম্বুজ বলা হল কেন? ভগবৎস্বরূপের তারতম্যে অনুভূতির তারতম্য হয়। শ্রীকৃষ্ণভগবানকে শাস্ত্রে স্বয়ং ভগবান বলা আছে। শ্রুতিবাক্যে কিন্তু ভগবৎস্বরূপমাত্রই পূর্ণ বলা হয়েছে। তাতে কোন তারতম্য বলেন নি। কিন্তু সকলে পূর্ণ হলেও ভগবৎস্বরূপের প্রকাশের তারতম্য আছে। আর এই তারতম্যের ওপরেই ভগবদনুভূতির তারতম্য নির্ভর করে। শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্র স্মৃতি পর্য্যায়ভুক্ত। সেই স্মৃতিশাস্ত্র ভগবানকে পূর্ণ পূর্ণতম বলেও তার কলা অংশ আছে একথা স্বীকার করেছেন। এখন শ্রুতি এবং স্মৃতির যে বিরোধ সেটি সমাধানের উপায় কি? এ বিচার করেছেন শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ তাঁর লঘু ভাগবতামৃত গ্রন্থে—

শক্তে র্ব্যক্তিস্তথা ব্যক্তিঃ তারতম্যস্য লক্ষণম্।

শক্তির প্রকাশ অনুযায়ী ভগবত্তার বিচার। কখনও তাঁর কলাশক্তির প্রকাশ হয়, কখনও বা অংশশক্তির প্রকাশ। কৃষ্ণ শুধু ভগবান নন তিনি স্বয়ং ভগবান। তাঁর সমান আর কেউ নেই। সুতরাং তাঁর চেয়ে অধিক তো থাকবেই না। রাজকুমার যেমন জন্মগ্রহণ করেই রাজকুমারের যোগ্যতা লাভ করে না—ক্রমশঃ বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে যখন যুবরাজের পদে অভিষিক্ত হয় তখনই তার রাজকুমারের যোগ্যতার পূর্ণতা তেমনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র পূর্ণ পূর্ণতর পূর্ণতম—এই তিন প্রকাশ। দ্বারকায়

ভগবান পূর্ণ, মথুরায় পূর্ণতর আর ব্রজভূমি শ্রীধাম বৃন্দাবনে তিনি পূর্ণতম। দ্বারকায় ভগবান রাজা পরম ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত। কিন্তু ঐশ্বর্য্যের চেয়ে মাধুর্য্যের আস্বাদ বেশী। দ্বারকায় ভগবানের শুধু ঐশ্বর্য্যের প্রকাশ। মথুরায় ভগবান ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য মিশ্রিত আর ব্রজের কৃষ্ণের শুধু মাধুর্য্য প্রকাশ। ব্রহ্ম পরমাত্মা ভগবান তিনই তত্ত্ব—কিন্তু নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম বিলাসরহিত আর লীলাময় ভগবান অনন্ত মাধুর্য্য চিদ্বিলাসমণ্ডিত। যেমন সোনার ডেলা আর সেই সোনা দিয়ে শিল্পী যেমন কুণ্ডল, হার, বালা, চুড়ি তৈরী করে। সোনায় ডেলা—খাঁটি সোনা—দামী তাতে সন্দেহ নেই কিন্তু তাতে মাধুর্য্য নেই—ব্যবহার করা যায় না। আর অলঙ্কারে মাধুর্য্যের বিকাশ—ব্যবহার করা যায়—দামী তো বটেই। দোকানদার জিনিষ বিক্রী করে কিন্তু তার উপযুক্ত খদ্দের (ক্রেতা) থাকা চাই। ব্রজের শুদ্ধ মাধুর্য্যময়ী ভূমিতে মাধুর্য্য প্রধান তৎ বিলাসের উপাসনা হয়। ক্রেতা এখানে অনুভবী মহাজন। উদ্ধবজী যে কৃষ্ণের উপাসনা করেন তিনি পরম ঐশ্বর্য্যবান। এই কৃষ্ণের মণিময় পাদপীঠে কত কত ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি শতানন সহস্রানন ব্রহ্মা তাঁদের কনককিরীট লুটিয়ে দেন। এমন যে উদ্ধব তিনিও রাধারাণীর রসোদগার ভ্রমরগীত শুনে ব্রজভূমির মাধুর্য্যে লুব্ধ হয়ে প্রার্থনা জানিয়েছেন—

সর্ব্বাত্মভাবোঽধিকৃতো ভবতীনামধোক্ষজে।
বিরহেণ মহাভাগা মহান্ মেঽনুগ্রহঃ কৃতঃ।।

ভাঃ ১০।৪৭।২৭

ভাগ্যবতী গোপনারীগণ! তোমাদের শ্রীগোবিন্দে যে সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পণ যার ফলে বিরহদশায় তোমাদের এই অবস্থা সেটি আমাকে দর্শন করিয়ে আমাকে পরম অনুগ্রহ দান করলে।

ভগবানের এই মাধুর্য্য চিদ্বিলাস আস্বাদনের অভিলাষে উদ্ধবজী করজোড়ে প্রার্থনা জানিয়েছেন—

বন্দে নন্দব্রজস্ত্রীণাং পাদরেণুমভীক্ষ্ণশঃ।
যাসাং হরিকথোদগীতং পুনাতি ভুবনত্রয়ম্।।

ভাঃ ১০।৪৭।৬৩

এখন প্রশ্ন হচ্ছে ব্রজে কৃষ্ণ বিশুদ্ধ মাধুর্য্যাবগ্রাহী হলেও তাঁর ঐশ্বর্য্য লোপ পায় কিনা। মাধুর্য্যে ভরপূর হলেও তাঁর ঐশ্বর্য্য লোপ পায় না। যেমন

উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে অগ্নির স্নান। ষোড়শোপচারে অগ্নি পূজায় অগ্নিকে স্নান করানোর বিধি আছে। এখন জল দিয়ে যে অগ্নিকে স্নান করান হয় তাতে অগ্নির তেজস্বিতার কিছু হানি হয় না। তবু তো সেখানে জল অগ্নি অপেক্ষা ভিন্ন। কিন্তু তাতেও অগ্নির তেজ কিছু ম্লান হয় না। তেমনি ব্রজে কৃষ্ণ মাধুর্য্যাবগাহী হলেও তাঁর ঐশ্বর্য্যের কোন হানি হচ্ছে না। এখানে কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণমাধুর্য্য ভিন্ন নয়। মাধুর্য্য প্রধান কৃষ্ণই হলেন ব্রজের কৃষ্ণ। ইনিই ব্রজবাসীর কৃষ্ণ। এই কৃষ্ণই উপাস্য। 'আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়ঃ।' এখন শ্রীপাদ রামানন্দ যে বললেন রাধাকৃষ্ণ পদাম্বুজ ধ্যান করতে হবে—কৃষ্ণের সঙ্গে রাধার নাম উল্লেখ করলেন কেন? কৃষ্ণকে অধীন করতে রাধার প্রয়োজন।

ব্রজের কৃষ্ণ রসরাজ রসিকেন্দ্র চূড়ামণি রসিকশেখর। এই রস আবার চার প্রকার। দাস্য সখ্য বাৎসল্য ও মধুর। রস দ্বিনিষ্ঠ। একটি পাখী যেমন দুটি ডানার ওপর ভর করে চলে—একটি ডানা বাদ দিলে সে উড়তে পারে না—তেমনি রসপক্ষীরও দুটি ডানা—একটির নাম আশ্রয়তত্ত্ব আর একটির নাম বিষয়তত্ত্ব। এই দুটি না থাকলে রসের আস্বাদন হয় না। রস যেখানে তৈরী হয় তাকে বলা হয় আশ্রয়তত্ত্ব আর সেই রস যে ভোগ করে তাকে বলা হয় বিষয়তত্ত্ব। রসের বিচারে দেখা যায় গোকুলের কৃষ্ণ পূর্ণতম। ব্রজভূমি পেটিকাতে চারটি কুঠরি। দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। এর মধ্যে মধুররসের কুঠরি বড় গোপনীয়, রসের চরম। গোকুলে সম্বন্ধহীন কৃষ্ণ পাওয়া যাবে না। এই চার রকম রসের খেলায় প্রথমটি হতে দ্বিতীয়টির আস্বাদনের উৎকর্ষ। আবার দ্বিতীয়টি হতে তৃতীয় এবং তৃতীয় হতে চতুর্থটির উৎকর্ষ। এইভাবে আস্বাদনের উৎকর্ষ আছে বলেই শ্রীশুকদেব বলতে পেরেছেন—

তত্রাতিশুশুভে তাভি র্ভগবান্ দেবকীসুতঃ।
মধ্যে মনীনাং হৈমানাং মহামরকতো যথা॥ ভাঃ ১০।৩৩।৬

রসের বিচারের চরমসীমা গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে। উপাস্য মন্ত্র এই পর্য্যন্ত গিয়েছেন। গোস্বামিপাদগণ কিন্তু আর একটু অগ্রসর হয়েছেন। শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ তাঁর শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে বলেছেন—

রাধাপ্রেয়ান্ বিধুর্জয়তি।

গোপরামাদের প্রত্যেকেই কৃষ্ণকে এমন করে ভালবেসেছেন যে তাদের

প্রত্যেকের কাছেই কৃষ্ণ ঋণী হয়েছেন। কিন্তু তার মধ্যে আবার কনককেতকী রাই যখন কৃষ্ণপাশে থাকেন তখন যুগলের মিলিতরসে যেন বন্যা বয়ে যায়। পদ্মপুরাণে বাক্য আছে—

যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যা কুণ্ডং প্রিয়ং তথা।
সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা॥

রাধারাণী গোবিন্দের যেমন প্রিয়া তাঁর কুণ্ড অর্থাৎ রাধাকুণ্ডও গোবিন্দের তেমনি প্রিয়। সকলগোপীর মধ্যে রাধারাণীই গোবিন্দের অত্যন্ত প্রিয়া। শ্রীমদ্ভাগবতেও বলা আছে—

অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ॥

ভাঃ ১০।৩০।২৪

এই বধূই সার্থক কৃষ্ণ আরাধনা করেছেন—যার ফলে আর সকলকে ত্যাগ করে ভগবান হরি তাকে নিয়ে গোপনে চলে এসেছেন।

রাধারাণীর প্রতি গোবিন্দের প্রেম যে সবচেয়ে বেশী এর প্রমাণ হবে কি করে—যদি গোবিন্দ রাধারাণীর জন্য সকলকে ত্যাগ করতে পারেন তাহলে সেইটিই প্রমাণ হবে। শ্রীজয়দেব কবি তাঁর গীতগোবিন্দ কাব্যে উত্তর দিলেন—গোবিন্দ তো তাই করেছেন—

কংসারিরপি সংসারবাসনাবদ্ধশৃঙ্খলাম্।
রাধামাদায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরীঃ॥

কংসারি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র রাধারাণীকে হৃদয়ে ধারণ করে আর সব গোপরামাকে ত্যাগ করে গেছেন। এতেই প্রমাণিত হল যে রাধারাণীর প্রতি গোবিন্দের প্রেম সবচেয়ে বেশী।

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামিপাদ তাঁর বিলাপকুসুমাঞ্জলি গ্রন্থে বলেছেন—রাধাসঙ্গে কৃষ্ণই উপাস্য।

এছাড়া শ্রীগোবিন্দের শ্রীমুখের উক্তিও আছে—

কিশোরীদাস মুই পীতবাস ইহাতে সন্দেহ যার রে।
কোটিজন্ম যদি আমারে ভজয়ে বিফল ভজন তার রে॥

শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—আমি কিশোরীমনি (রাধারাণীর) দাস—তাই তোমরা যদি কেউ আমাকে পেতে চাও তাহলে মনিবকে বল—তিনি যদি আদেশ করেন তাহলে আমি তোমার কাছে যেতে পারি। কারণ আমি যখন দাস

তখন মনিবের আদেশের মুখাপেক্ষী। তাই রাধারাণীর চরণাশ্রয় ছাড়া কৃষ্ণ ভজলেও কৃষ্ণ পাওয়া যাবে না। তাই রাধাকৃষ্ণপদাম্বুজই ধ্যানের যোগ্য।

পদ্মের (অম্বুজের) সঙ্গে রাধাকৃষ্ণ পদযুগলের উপমা দেওয়া হয়েছে। এ উপমার সার্থকতা কি? পদ্মের তিনটি গুণ আছে—কোমলতা, লৌহিত্য ও সৌগন্ধ্য। রাধাকৃষ্ণ চরণযুগলের লৌহিত্য (রক্তিমা) ভক্তের চিত্তকে পাদপদ্মে অনুরাগী করবে। অনুরাগের রং হল লাল। কষ্ট করে চিত্তকে পাদপদ্মে দিতে হবে না। পাদপদ্মের মাধুরী নিজে থেকেই চিত্তকে অনুরাগী করে আকর্ষণ করবে। রাধাকৃষ্ণ চরণ যুগল এত কোমল যে সে কোমলতা উপাসকের ধ্যানের যদি কোন ত্রুটি হয়—তাতে অপরাধ গ্রহণ করবে না। আর পদযুগলের সৌগন্ধ ভক্তের চিত্তকে আকর্ষণ করে যেমন পদ্মের সৌগন্ধ ভ্রমরকে আকৃষ্ট করে। তাই উপমা এখানে সার্থক হয়েছে। তবু একটি কথা আছে। আমরা রাধাগোবিন্দের চরণযুগলকে প্রাকৃত পদ্মের সঙ্গে উপমা দিই—কারণ অপ্রাকৃত পদ্মের সঙ্গে আমাদের কোন সম্বন্ধ নেই। কিন্তু প্রাকৃত পদ্মের সঙ্গে ভগবানের চরণের উপমা হয় না। কারণ প্রাকৃত পদ্ম ফোটে এ জগতের সরোবরে। সেখান থেকে তুলে এনে ঘরে রাখলে কিছুক্ষণ পরে গন্ধ ম্লান হয়ে যায়, রং ফ্যাকাসে হয়ে যায়, বিবর্ণ হয়ে যায়, আর কোমলতাও অত থাকে না—কঠিন হয়ে যায়। তাই প্রাকৃত পদ্মের সঙ্গে উপমা হয় না। কিন্তু রাধাকৃষ্ণের চরণপদ্ম ফোটে অপ্রাকৃত প্রেম সরোবরে—ভক্ত ভজন দিয়ে তা তুলে এনে হৃদয় ঘরে রাখে। কিন্তু তাতে সে চরণ কমলের গন্ধ ম্লান হয় না—বর্ণও বিবর্ণ হয় না, আর কোমলতাও নষ্ট হয় না। বরং শ্রীগুরুপাদপদ্মের আনুগত্যে ভজনে যার যেমন অগ্রগতি তার হৃদয়ে সে চরণকমল ক্রমশঃ উজ্জ্বল হতে উজ্জ্বলতর উজ্জ্বলতম হবে। ভক্তের উৎকণ্ঠা লালসা ঘর্ষণে দিনে দিনে উজ্জ্বল হবে। তাই প্রাকৃত পদ্মের সঙ্গে উপমা হয় না। তবু দিতে হয়—কারণ অপ্রাকৃত পদ্মের সন্ধান আমাদের জানা নেই।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর যে প্রশ্ন—বলত রামানন্দ 'ধ্যেয় মধ্যে জীবের কর্ত্তব্য কোন ধ্যান?' শ্রীপাদ রামানন্দ মহাপ্রভুর কৃপাপুষ্ট কণ্ঠে উত্তর দিলেন—

রাধাকৃষ্ণপদাম্বুজ ধ্যান প্রধান।

(১০)

সর্ব্বাবতারী শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীপাদ রামানন্দ রায়কে লোভাতুর হয়ে পরবর্ত্তী প্রশ্ন করছেন—'ক্ব শ্রেয়ম্?'

প্রভু কহে, 'সর্ব্বত্যজি জীবের কর্ত্তব্য কাঁহা বাস?'
রায় কহে, 'ব্রজভূমি বৃন্দাবন যাঁহা লীলারাস॥'

প্রশ্নকর্ত্তা শ্রীমন্মহাপ্রভু আজ গোদাবরীতীরে থাকলেও তিনি কিন্তু নিত্য বৃন্দাবনবিহারী। তিনি প্রশ্ন করলেন শুধু কোথায় বাস করা উচিত? কার বাস করা উচিত এ প্রশ্ন কিন্তু করা হয় নি। কার বাস করা উচিত এটি আমাদের প্রকরণ থেকে বুঝে নিতে হবে। কারণ যে প্রকরণ চলছে সেটি হল কৃষ্ণ প্রেমভক্তির প্রকরণ। তাই কৃষ্ণপাদপদ্ম লোভে লোভী যে ব্যক্তি তার কোথায় বাস করা উচিত এইটিই হচ্ছে প্রশ্ন। সাধারণ মানুষের পক্ষে কোথায় বাস করা উচিত এ পরিচয় নীতিশাস্ত্র দিয়েছেন। যেখানে ভাল নদী আছে, ব্রাহ্মণের বাস আছে, ভাল রাজা আছেন, সদ্বৈদ্য আছেন সেখানেই বাস করা উচিত। কিন্তু কৃষ্ণভক্তিরসে যাদের লোভ হয়েছে তাদের কোথায় বাস করা উচিত এই প্রশ্নই শ্রীমন্মহাপ্রভু করেছেন—এই লোভ কিন্তু কৃষ্ণকৃপা ছাড়া হয় না। পদ্যাবলীতে দ্বাদশাঙ্কে শ্রীপাদ রামানন্দ রায় কৃত শ্লোক আছে—

কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতিঃ
ক্রীয়তাং যদি কুতোঽপি লভ্যতে।
তত্র লৌল্যমেব মূল্যমেকলং
জন্মকোটি সুকৃতৈ র্ন লভ্যতে॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-মধ্যলীলা

জীবের বুদ্ধি মায়ার দ্বারা আবৃত। তাই মহাজন বললেন—কৃষ্ণভক্তিরসে ভাবনা দেওয়া মতি যদি কোথাও কিনতে পাও তো কিনে নাও। কবিরাজমশাই যেমন বড়ি তৈরী করে তাতে ছাগলের দুধ বা কোন পাতার রসের ভাবনা দেন—অর্থাৎ সেই বড়ি ঐ দুধে বা রসে একবার করে ডোবান একবার করে ওঠান—একেই ভাবনা দেওয়া বলে—তাহলে ঐ দুধের বা পাতাররসের গুণ বড়িতে সংক্রামিত হবে—তার ফলে ঐ বড়ি রোগীকে খাওয়ালে কাজ হবে। তেমনি আমাদের মায়াচ্ছন্ন বুদ্ধিকে কৃষ্ণভক্তিরসে একবার করে ডোবাতে হবে—সে উঠে আসবে

নিজে থেকেই চেষ্টা করে ওঠাতে হবে না—কিন্তু চেষ্টা করে ডোবাতে হবে—এইজন্যই কাজ কঠিন হয়। এই ডোবাতে ওঠাতে কৃষ্ণভক্তিরস বুদ্ধিতে সঞ্চারিত হবে একেই বলা হয় ভাবনা দেওয়া। এমনি করে যে কৃষ্ণভক্তিরসে ভাবনা দেওয়া মতি হবে তা যদি কোথাও কিনতে পাওয়া যায় ত কিনে নাও। কোথায় যে পাওয়া যায় তার ঠিকানা কিন্তু জানা নেই। মানুষের কোন জিনিষ কিনতে হলে মূল্য সংগ্রহ করতে হয়। আমাদের মূল্যেরই সংগ্রহ নেই তা জিনিষ কিনব কেমন করে? মূল্য বলা হল একমাত্র লোভ। এ মূল্য কিন্তু যেখানে সেখানে মেলে না। সাধু গুরুবৈষ্ণবের পাদপদ্ম বাজারে লোভ (লৌল্য) মূল্য পাওয়া যায়। এখন কোন ব্যক্তির যে লোভ হয়েছে তা বুঝা যাবে কেমন করে? লোভে অন্য সব বস্তু ত্যাগ হয়ে যাবে। কৃষ্ণপাদপদ্মে লোভ জন্মালে আর অন্য কোন জিনিষ ভাল লাগবে না।

শ্রীসূতমুনি বলেছেন—

তদ্রসামৃততৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাদ্রতিঃ ক্বচিৎ।

ভগবানের লীলারসে নামরসে যার চিত্ত মজেছে তার আর অন্য কোন কিছু ভাল লাগবে না। কোটিজন্মের শাস্ত্র বিহিত কর্মেও এই কৃষ্ণভক্তিরসে লোভ হয় না। এই লোভ যে দুর্লভ অর্থাৎ আমার যে এই লোভ নেই এটি অনুমানের দ্বারা বুঝতে হবে না। প্রত্যক্ষেই বেশ বুঝা যাবে। যে লোভ যা দিয়ে কৃষ্ণ ভক্তিরসভাবিতামতি পাওয়া যায় তা আমার নেই। আমার তো অন্য সব প্রাকৃত বস্তুতে লোভ আছে। কিন্তু কৃষ্ণপাদপদ্মে লোভ নেই। এখন এই লোভ সংগ্রহের উপায় কি? যদি লোভ পাওয়ার লোভ থাকে তাহলে আত্মসমর্পণ করতে হবে। কৃত কর্মের দ্বারা হবে না। সাধুগুরু বৈষ্ণবের কাছে এই লোভ জমা আছে। তাঁদের চরণে আত্মসমর্পণ করতে পারলে সেই আত্মসমর্পণ নালিকা পথে সাধুগুরু বৈষ্ণবের লোভ জীবে সঞ্চারিত হয়।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে—গৌরসুন্দর তো নিজেই নন্দনন্দন—

নন্দের নন্দন যেই শচীসুত হইল সেই
বলরাম হইল নিতাই।

তাই তিনি তো ভালই জানেন কৃষ্ণভক্তিলোভীদের কোথায় বাস করা উচিত। তবে তিনি কেন আবার রামানন্দ রায়কে এ প্রশ্ন করলেন?

কৃষ্ণ যে গৌর হয়েছেন—তিনি কৃষ্ণ হয়েও আজ গৌর স্বরূপে তিনি কৃষ্ণভক্তির কাঙ্গাল। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ বললেন—

কৃষ্ণদাস অভিমানে যে আনন্দসিন্ধুরে।
কোটি ব্রহ্মানন্দ তার আগে নহে এক বিন্দুরে।

কৃষ্ণদাস অভিমানী ব্যক্তির কাছে চতুর্ব্বর্গও তৃণের মত তুচ্ছ মনে হয়। সালোক্যাদি মুক্তি ভক্ত অঙ্গুলি না ছোঁয়। কৃষ্ণভক্তিধন একমাত্র কৃষ্ণভক্তেরই সম্পদ, এ সম্পদ কৃষ্ণও পেতে পারেন না। কৃষ্ণ নিজে ভগবান হলেও কৃষ্ণভক্তি আস্বাদন করতে পারেন না। কৃষ্ণভক্তি আস্বাদন করেন ভক্ত। তাই কৃষ্ণভক্তি আস্বাদন করবার জন্য আজ শ্রীগৌরসুন্দর রাধারাণীর ভাবকান্তি অঙ্গীকার করে ভক্ত সাজলেন। রাধারাণীর কাজ একমাত্র কৃষ্ণসেবা। সেবার প্রধান অর্থ হল সুখ দেওয়া। কৃষ্ণকে সুখ দেওয়াই হল রাধার কাজ। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের বাঞ্ছাপূর্ত্তির মূর্ত্তি হলেন শ্রীমতী রাধাঠাকুরাণী। 'কৃষ্ণের যতেক বাঞ্ছা রাধাতেই রহে।' কৃষ্ণের বাসনা পূরণ রূপ আরাধনা করেন বলেই তাঁর নাম রাধিকা।

কৃষ্ণবাঞ্ছা পূর্ত্তি রূপ করে আরাধনে।
অতএব রাধিকা নাম পুরাণে বাখানে॥

তাই রাধারাণীর কৃপাতেই আজ কৃষ্ণ কৃষ্ণভক্তিরস আস্বাদন করছেন। রস যখন তিনি আস্বাদনই করছেন তখন আবার কাঙ্গাল কেন? ভক্তির স্বভাবই তাই। যার চিত্তে ভক্তির পরিমাণ যত বেশী সে তত কাঙ্গাল। প্রাকৃত রাজ্যে দেখা যায় যে যত রিক্ত তার দৈন্য তত বেশী। কিন্তু ভক্তিরাজ্যে যে যত পূর্ণ সে তত দীন। এটি ভক্তির বিচিত্র স্বভাব। বৃহদ্ভাগবতামৃত এবং লঘুভাগবতামৃত গ্রন্থে প্রসঙ্গ আছে দেবর্ষিপাদ নারদ মহারাজ যুধিষ্ঠির এবং পিতামহ ভীষ্মকে কৃষ্ণভক্তি আলোচনা প্রসঙ্গে প্রহ্লাদ চরিত্র বর্ণনা করছেন—রাজসূয় যজ্ঞে যে যার নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত আছেন কিন্তু নারদ তো কৃষ্ণকথা প্রসঙ্গহীন হয়ে থাকতে পারেন না—তাই তিনি সেই প্রসঙ্গই করছেন। দেবর্ষিপাদ নারদ যখন প্রহ্লাদের ভক্তির কথা বলছেন তখন মহারাজ যুধিষ্ঠির বিমনা হয়ে পড়লেন—বললেন, আহা! ভক্তের কি মহিমা! খেদ করে মহারাজ বলছেন—কই দেবর্ষিপাদ সে ভক্তি তো আমার হল না। ভক্তির বিলাসই এইরকম। তা না হলে প্রহ্লাদের ভক্তির কোটিগুণ বেশী ভক্তি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের।

তাই দেবর্ষিপাদ নারদ বললেন—মহারাজ, এতে আপনার দুঃখের কোন কারণ নেই। কারণ এ জগতে আপনাদের ভাগ্যের কি তুলনা আছে? মুনি ঋষি যোগী ধ্যানী জ্ঞানী তারা খুঁজে খুঁজে একবার গোবিন্দ দর্শনের লালসায় আপনাদের ঘরে আসেন—কারণ আপনাদের ঘরে গোবিন্দ প্রেমে বশীভূত হয়ে বাস করেন। তার ওপর আরও কথা আছে। এ জগতে সকলে কৃষ্ণকে সেবা করে—আর সেই কৃষ্ণ আপনাদের সেবা করেন। মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে পথ দেখিয়ে অন্তঃপুর থেকে রাজসভায় আবার রাজসভা থেকে অন্তঃপুরে নিয়ে যান। আবার অর্জ্জুনের রথের সারথ্য করেছেন ভগবান নিজে অর্থাৎ কিঙ্করত্ব করেছেন—ভৃত্যত্ব করেছেন। তাই নারদ বলছেন—প্রেমে তো আপনারা প্রেমের ঠাকুরটিকে দাস করে রেখেছেন মহারাজ!

সমস্ত শাস্ত্র বিচার করে দেখা গেছে কৃষ্ণে ভক্তিই সর্ব্বোত্তম। এই কৃষ্ণভক্তির মহাজন বা ভাণ্ডারী হলেন শ্রীমতী রাধাঠাকুরাণী। ভক্তির রাজকোষ শ্রীমতী রাধাঠাকুরাণীর সর্ব্বস্ব চুরি করেছেন কৃষ্ণ। তাই তিনি আজ সর্ব্বোত্তমরূপেই ভক্তি পেয়েছেন বলে সর্ব্বোত্তমরূপে কাঙ্গাল। যার যত ভক্তি সে তত কাঙ্গাল। যেমন জলকে যদি কূয়া কাটতে বলা হয় তাহলে তার যেমন কিছুতেই তৃপ্তি হয় না—যতই গভীর হোক না কেন সে চায় আরও গভীর হোক—তেমনি ভগবানে ভক্তিলাভও বরাবর অতৃপ্ত। ভক্তির খনি লাভ করেও তিনি কাঙ্গাল। দৈন্যগর্ত্তেই ভক্তিবারি জমা হয়। অহঙ্কারের অভিমানের উচ্চতায় ভক্তিজল দাঁড়ায় না। শ্রীমন্নিত্যানন্দ স্বরূপে পদকর্ত্তা শ্রীলোচনদাসজীর পদ আছে—

রসরত্নখনি তবু কাঙ্গাল রসের।
অদ্ভুত চরিত আমার শ্রীনিতাই চাঁদের॥

পরমারাধ্য শ্রীগুরুমহারাজ ১০৮ শ্রীল রামদাস বাবাজী মহারাজ অক্ষর দিলেন—

রসখনির এই তো স্বভাব।
পূর্ণ হয়েও মানে অভাব॥

নিত্যানন্দ তত্ত্বই শ্রীবলদেব তত্ত্ব—এই তত্ত্বই সেবক তত্ত্ব।

পিপাসার্ত্ত ব্যক্তি যেমন জিজ্ঞাসা করে জল কোথায় পাওয়া যাবে? কৃষ্ণভক্তিরসের মহাজন শ্রীগৌরসুন্দরও তেমনি একবিন্দু কৃষ্ণভক্তিরস

কোথায় পাওয়া যাবে এই সম্বন্ধে কাতর হয়ে রামানন্দ রায়কে প্রশ্ন করছেন। গৌরকৃপায় তো রামানন্দের কিছু অজ্ঞাত নেই। এ হল ভগবানের দিয়ে গ্রহণ। যেমন শ্রীগোবিন্দ চন্দন, পুষ্প, গঙ্গাজল মানুষকে দিয়ে আবার নিজে সেইটি গ্রহণ করেন, আবার সেই গ্রহণের বিনিময়ে মানুষকে ফল দেন—নিজেরই দান কিন্তু সেটি আর তাঁর মনে নেই—তাই মানুষের এই দানেরই ভগবান ফল দান করেন। ভগবানের অন্য স্বরূপেও যে এ উদাহরণ নেই তা নয় কিন্তু গৌরস্বরূপে এ উদারতা সবচেয়ে ভাল পেকেছে। ভক্তিদানই হল সর্ব্বোত্তম দান। বলা আছে—

এ ভক্তি তো কাকেও দিই নাই
যে ভক্তি আমাকে সম্বন্ধের বন্ধনে বাঁধে
যে ভক্তি আমাকে বশ করে অধীন করে

পুত্র সখা প্রাণপতি করা—এই সম্বন্ধের বন্ধনে বাঁধা এ ভক্তি তো কাকেও দিই নাই।

গোবিন্দ তো চোর—কিন্তু ইচ্ছা করে কি চোর ধরা পড়তে চায়? মনের মত লোকের কাছেই ভক্তিরজ্জু প্রেমরজ্জুতেই তিনি একমাত্র বাঁধা পড়েন। তাই তাঁর মনের মত লোকের চরণে যারা শরণ নেয় তাদের কাছেও তিনি বাঁধা পড়েন।

কৃষকের অজ্ঞাতে ভগবান যেমন রাত্রিতে তার ভূমি সুবৃষ্টির দ্বারা পূর্ণ করে রাখেন—কৃষক জানতেই পারে না সেইরকম রামানন্দ রায়ের অজ্ঞাতে শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁর নিজের ভক্তিসিদ্ধান্তজলে রামানন্দের হৃদয়ক্ষেত্র পরিপূর্ণ করে রেখেছেন। রামানন্দ জানতেই পারেন নি কখন গৌরসুন্দর তাঁর হৃদয়ক্ষেত্র ভক্তিসিদ্ধান্ত জলে প্লাবিত করে দিয়েছেন। এ খবর অজ্ঞাত হলেও পূর্ণতার অনুভূতি তাঁর হয়েছে। তাই মহাপ্রভুর প্রশ্নের উত্তরে তাঁর শ্রীমুখে সিদ্ধান্তের স্বতঃসিদ্ধ স্ফূর্ত্তি। কৃপাসূর্য্যের আকর্ষণে সমুদ্রের লবণাক্ত জলরাশির এ যেন অমৃতোপম সুমধুর বর্ষণ। বর্ষণধারায় প্রশ্নকর্ত্তা ও উত্তরদাতা দুজনেই সিক্ত হচ্ছেন। এ বড় বিচিত্র লীলা।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রশ্ন করা শেষ হয়েছে কিন্তু শুনবার আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয় নি। শুনবার ইচ্ছা প্রবল। এও বড় বিচিত্র। মহাপ্রভুর একটি নিজস্ব আশয় আছে। যার দিকে লক্ষ্য রেখে তিনি কথা বলছেন। তাই সে জায়গায় না পৌঁছানো পর্য্যন্ত তাঁর শুনবার আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হবে না।

তিনি প্রেরণা দিয়ে রামানন্দকে তাঁর লক্ষ্য স্থানে ধীরে ধীরে নিয়ে যাচ্ছেন। যে আনন্দে মহাপ্রভুর হৃদয় ভরপুর সে আনন্দকে যদি সাগরের সঙ্গে তুলনা করা যায় তাহলে ব্রহ্মানন্দ তার কাছে খাতোদকসম। কারণ শিববাক্য আছে—

নারায়ণপরাঃ সর্ব্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি।
স্বর্গাপবর্গনরকেম্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ॥ ভাঃ ৬।১৭।২৩

ভগবৎপরায়ণ ব্যক্তি কোথাও থেকে ভয় পায় না। স্বর্গ, অপবর্গ, মুক্তি নরক সকলের প্রতি তাদের সমান দৃষ্টি।

মানুষ কোন্ অবস্থায় পৌঁছুলে সকলের প্রতি সমদৃষ্টি হতে পারে? যখন তার কোন বস্তুতেই প্রয়োজন বোধ থাকে না। প্রয়োজন বোধেই মানুষের কোন বস্তুতে আদর, অত্যন্ত আদর আবার অনাদর হয়ে থাকে। আর প্রয়োজন না থাকলে সব বস্তুই তার কাছে সমান। শ্রীপাদ রামানন্দ রায় তাঁর অভিপ্রায় জানিয়েছেন। ভক্তিরসিক যিনি হবেন তিনি মদনবিহ্বল গোপরামাদের অঞ্জলিভরে শ্যামামৃত পান করবার পরে যেটুকু অবশিষ্ট ভূমিতে পড়বে সেইটুকু পান করে তৃপ্ত হবেন। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র অখিল রসামৃতমূর্ত্তি। গোপী আনুগত্যে কৃষ্ণপাদপদ্ম মাধুর্য্য আস্বাদনই হল বৈষ্ণবদর্শনের সিদ্ধান্ত সার।

শ্রীভগবানের কৃপার ধারা দু'রকম। একটি সাধারণ দৃষ্টি আর একটি লোভজাগানো দৃষ্টি। এ দৃষ্টি সকলের উপর নয়। প্রথমটি মায়িক কৃপা অর্থাৎ অচিৎ কৃপা আর দ্বিতীয়টি হল চিৎ কৃপা বা চিন্ময়ী কৃপা। এর মধ্যে সাধারণের প্রতি সাধারণী কৃপা আর ভক্তের প্রতি অসাধারণী কৃপা। সাধারণী কৃপা ভগবান মায়ার হাত দিয়ে পরিবেশন করান আর দ্বিতীয়টি নিজে বা নিজজন দিয়ে পরিবেশন করান। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ বললেন—

কৃষ্ণ যদি কৃপা করে কোন ভাগ্যবানে।
গুরু অন্তর্য্যামিরূপে শিখান আপনে॥

কৃপা হলেন স্বৈরবিলাসিনী। কৃষ্ণকৃপা যখন যাকে অনুগ্রহ করেন তখন তার আর লোক ব্যবহার থাকে না। সে তখন লোকধর্ম বেদধর্ম ছাড়ি শ্রীকৃষ্ণ ভজয়।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীপাদ রামানন্দ রায়কে প্রশ্ন করেছেন—কোথায় থাকা

উচিত? মানুষের কোথায় থাকা উচিত এই যদি প্রশ্ন হয় তাহলে বিচারে দেখা যায় মানুষ তো দুই প্রকার। দৈব এবং আসুর। বিষ্ণুভক্তঃ স্মৃতঃ দৈবঃ আসুরস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ। অর্থাৎ যারা কৃষ্ণভক্ত তারাই দৈব এবং তার বিপরীত অর্থাৎ যারা অভক্ত তারাই আসুর। দেবতা এবং অসুরের যেমন বসতিস্থানের ভেদ আছে, অসুরের পাতালপুরী আর দেবতার স্বর্গলোক। তেমনি জীব অনুসারে বসতিস্থানের তারতম্য আছে। মহাপ্রভু কিন্তু জীবের প্রকারভেদ সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন নি। কোন জীব কোথায় বাস করবে সে প্রশ্ন করেন নি। কেবলমাত্র প্রশ্ন করেছেন কোথায় বাস করা উচিত? ভক্ত এবং অভক্ত জীবের এই দুটি কোটি। গৌরসুন্দরের পক্ষে কিন্তু অভক্তদর্শন হয়ে ওঠে না—সূর্য্য যেমন চেষ্টা করলেও অন্ধকার দেখে না। শ্রীল গুরুমহারাজ ১০৮ শ্রীল শ্রীপাদ রামদাস বাবাজী মহারাজ কীর্ত্তন প্রসঙ্গে বলেছেন—

ভাবনিধি গৌরাঙ্গ আমার অভাবের সঙ্গ করে না
ওমা ওর কি গরজ বালাই ভাবের অভাব দেখতে পারে না।
স্বভাব জাগায়ে করে সঙ্গ।
অভাব ঘুচায়ে স্বভাব জাগায়।
মহাপ্রভুর স্বরূপ হল স্বরূপ জাগানো স্বরূপ।
স্বরূপ জাগানো স্বরূপ দেখে স্বরূপ জেগে উঠল সবার।

স্বরূপ জাগানো স্বরূপ গৌর দেখে সকলের স্বরূপ জেগে ওঠে।

এখানে অভাব বলতে কিন্তু পারমার্থিক সম্পদের অভাব বলা হচ্ছে। কারণ আর্থিক সম্পদ সকলেরই কিছু না কিছু আছে। এমনকি পাগলেরও কিছু আর্থিক সঞ্চয় আছে। সম্পত্তি কিনবার সময় যেমন ভাল করে দলিল দেখে নেওয়া হয় কোথাও সেটি বন্ধক দেওয়া আছে কি না বা অন্য কোন ভাগীদার আছে কিনা—তা আমাদের যখন এই দেহ সম্পত্তি গ্রহণ করা হয়েছে তখন কিন্তু তা দেখা হয় নি। দেহটি কিন্তু অপরের কাছে গচ্ছিত আছে। তারা চাইলেই দিয়ে দিতে হবে। পরের সম্পত্তিতে মমত্ববোধকে পাকা করার ফলেই আমরা অন্যায় করেছি। সেইজন্যই আমাদের এত দুঃখ। দেহ গেহ পুত্র পরিজন এসব ধনের চিহ্ন নয়। এ জগতে যত দোষ সব দরিদ্রের। ধনীই একমাত্র নির্দ্দোষ। তেমনি পরমার্থ জগতেও দেখা যায় প্রেমধন যার নেই সেই দরিদ্র। প্রেমধনে

যে ধনী সেই হল প্রকৃত ধনী। এ জগতের ধন তো তৃপ্তি মেটাতে পারে না। কারণ সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মারও বাসনা আছে। জাগতিক ধন মানুষকে সুখ দিতে পারে না। ভগবানের কাছে সকাম ব্যক্তি যে প্রার্থনা করে তখন তিনি তাদের সে বাসনা পূরণ করেন কিন্তু তাদের পরমার্থ দান করেন না। কারণ প্রার্থিত বস্তু পেয়েও তাদের আবার অর্থী হতে হয়। আর যারা নিষ্কাম তারা না চাইলেও ভগবান তাদের নিজ পাদপল্লব দান করেন।

সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণাং নৈবার্থদোযৎপুনরর্থিতা যতঃ।
স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতামিচ্ছাপিধানং নিজপাদপল্লবম্॥
ভাঃ ৫।১৯।২৮

লক্ষ্মীর যদি কামনা করতে হয় তাহলে লক্ষ্মীপতিরই উপাসনা করতে হবে। কৃষ্ণ আঁচল ভরে ভিক্ষা দেবেন। তাঁর কাছে ভিক্ষা পেয়ে আঁচল ভরে যাবে। তখন আর অন্য কারো কাছে আঁচল পাতবার দরকার হবে না। অন্য দেবতার কাছে প্রার্থনার বস্তু পেলে পাওয়ার তৃষ্ণা বেড়েই যাবে। কিন্তু কৃষ্ণ প্রার্থনীয় বস্তু দেবার সঙ্গে সঙ্গে তৃষ্ণা মিটিয়েও দেবেন। পিপাসাতে জল দেওয়াই চিকিৎসা নয়—পিপাসা মেটানই হল প্রকৃত চিকিৎসা। হরি বিজ্ঞ ব্যক্তি তাই পিপাসা মিটিয়ে দেন।

জীব অজ্ঞ আমি বিজ্ঞ বিষয় কেন দিব?
স্বচরণামৃত দিয়া বিষয় ভুলাইব॥

কৃষ্ণভক্তি যার নেই সেই হল এ জগতে দরিদ্র। সেই ব্যক্তিই হল অভাবী। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরণ কি? একে তো তাঁর স্বরূপ জাগানো স্বরূপ তাই সেই স্বরূপ দেখে সকলেরই স্বরূপ জেগে ওঠে। বলা আছে—

হরি বলি বাহু তুলি প্রেমদিঠে চায়।
করিয়া কল্মষ নাশ প্রেমেতে মাতায়॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমদৃষ্টি মাত্রেই জীবের পাপ চলে যায়—এর কারণ কি? এর কারণ আর কিছুই নয়—এটি হল বস্তুর স্বভাব। আলোর স্বভাব যেমন অন্ধকার নাশ করা। অন্য কোনও বস্তু দিয়ে যেমন অন্ধকার দূর করা যায় না। ভগবানের পাদপদ্মে বিমুখতা হল জীবের হৃদয়ের অশুদ্ধির মূল কারণ। ভগবৎ বিস্মৃতির নাম অজ্ঞান আর ভগবৎ স্মৃতি হল জ্ঞান। সূর্য্যের প্রচণ্ড কিরণের প্রয়োজন যেমন বালসূর্য্য দিয়ে কাজ

হয় না, মধ্যাহ্ন সূর্য্যের জন্য অপেক্ষা করতে হয়—গৌর হলেন সেই মধ্যাহ্ন সূর্য্য। তাই তাঁর দৃষ্টিমাত্রে জীবের যে কল্মষ নাশ এটি অন্য কোনও ভগবৎ স্বরূপের দ্বারা সম্ভব নয়। ভগবানে জীবের অরুচি স্বাভাবিক হয়ে গেছে। কারণ জীব বাসনারোগগ্রস্ত। রোগগ্রস্ত মানুষের যেমন প্রধান খাদ্য অন্নে রুচি হয় না তেমনি হরিগুণ কীর্ত্তন যা আত্মার প্রধান খাদ্য ভগবানের রূপ গুণ লীলা প্রভৃতিতে বাসনা রোগগ্রস্ত জীবের তেমনি স্বাভাবিক অরুচি। জীবের এই রোগ দূর করবার জন্য চারজন চিকিৎসক আছেন—শাস্ত্র, সাধু, গুরু এবং ভগবান। তুলসীদাসজী বলেছেন, এরা সকলে একই ব্যক্তি। ভগবানই শাস্ত্র, সাধু, গুরুরূপে প্রকাশ হন। ভগবান সাক্ষাতে দাঁড়ালে তাঁর সম্বন্ধে জীবের অরুচি তৎক্ষণাৎ নাশ হয়। লোকের রুচি ভিন্ন বটে—কিন্তু ভগবানের বিষয়ে সকলের রুচি সমান হওয়া উচিত। কিন্তু হয় না। কারণ ভগবান এবং ভগবানের রুচি এই দুটি ভিন্ন বস্তু, ভগবানে রুচি নেই কিন্তু রুচি আছে ভক্তে। ভগবানে তো জীবের রুচি হওয়া উচিত, কিন্তু হয় না। অনুশীলন করতে করতে রুচি হয়। পিত্তবিকারী রোগীর যেমন মিছরি তেতো লাগে কিন্তু মিছরি খেতে খেতে যেমন যেমন পিত্তবিকার রোগ সারে তেমনি তেমনি মিছরি মিষ্টি লাগে—তেমনি আমাদের অবিদ্যা পিত্ত বিকার রোগ যতই সারবে ততই ভগবানে রুচি হবে এবং ভগবানকে মিষ্টি লাগবে। ভগবানের আদেশের গৌরবেও ভগবানে আমাদের রুচি হয় না। কারণ রুচি ভগবানে নেই—আছে ভগবানের ভক্তে। কৃষ্ণে আছে ভগবত্তা আর কৃষ্ণ ভক্তে আছে রুচি। এই কৃষ্ণরুচি মুর্ত্তিমতী হলেন শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী রাধাঠাকুরাণী। কৃষ্ণপ্রেম মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে ঠাকুরাণী হয়েছেন—তাই তাঁর নাম ভালবাসা ঠাকুরাণী। অন্যান্য অবতারে ভগবান জীবকে আদেশ করেছেন, উপদেশ করেছেন—কিন্তু জীবকে দিয়ে আদেশ পালন করাতে পারেন নি। অর্থাৎ ভগবান বললেও জীব তা শোনে নি। গীতা এবং ভাগবতে ভগবান তত্ত্ব কথা অনেক বলেছেন—কিন্তু মানুষ তা শোনে নি। ভগবান শ্রীগোবিন্দের উপদেশ বাক্য 'সর্ব্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ'—এই বাক্যের প্রথম অংশটুকু অর্থাৎ 'সর্ব্বধর্মান্ পরিত্যজ্য' মানুষ গ্রহণ করেছে কিন্তু শেষের অংশটুকু—মামেকং শরণং ব্রজ—এটি আর মানুষ নিতে পারে নি। তাই

গৌর ভগবান এবারে কৃষ্ণরুচিকে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন। রুচিকে জীবের চোখের সামনে ধরে দেখাতে পারলে আর জীবের রুচির অভাব হবে না। এইটাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর অভিপ্রায়। গৌর হলেন রুচি এবং কৃষ্ণ একসঙ্গে তাই গৌর দেখে জীবের আর কোন অভাব থাকছে না। সকলেই ভাব পেয়ে যাচ্ছে। গৌর খাদ্য কৃষ্ণ এবং ক্ষুধা রুচি একসঙ্গে নিয়ে এসেছেন। তাই যারা গৌর দেখছে তারা খাদ্য এবং ক্ষুধা একসঙ্গে পেয়ে যাচ্ছে। তাদের আর আলাদা করে ক্ষুধা রোজগার করতে হচ্ছে না। তাই যারা গৌর দেখছে তারাই কৃষ্ণ বলে কাঁদছে। এর তাৎপর্য্য কি? তারা দেখছে বাইরে গৌরকান্তি যা কৃষ্ণরুচি ভিতরে কিন্তু কৃষ্ণ স্বয়ম্। রুচির বর্ণ হল গৌরকান্তি। গৌর আমার বাহু তুলে হরি বলে প্রেম দিতে চায়। গৌরের এ বাহু কোন বাহু? গোপী কণ্ঠে আলিঙ্গিত কৃষ্ণবাহু এখন কৃষ্ণরুচি শ্রীমতী রাধাঠাকুরাণীর বাহুর সঙ্গে একত্র মিলিত হয়েছে সেই বাহু আজ উর্দ্ধে তুলে তিনি হরি বলছেন। গৌরহরি আজ হরি বলছেন মানে হরি আজ হরি বলছেন। নিজের নাম নিজেই বলছেন। এ বড় বিচিত্র লীলা। শ্রীমতী মূর্ত্তিমতী কৃষ্ণপ্রেম। কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণরুচি দুইই সমুদ্র। কৃষ্ণ যদি করুণাসাগর হন কৃষ্ণরুচি তাহলে হলেন অগস্ত্য। কৃষ্ণরুচিই তো কৃষ্ণকে ভোগ করে। যেমন ক্ষুধা খাদ্যকে ভোগ করে। কৃষ্ণরুচি হল ভোক্তা আর কৃষ্ণ নিজে হলেন ভোগ্য। কৃষ্ণের প্রতি অঙ্গেই করুণার বিকাশ—তার মধ্যে আবার নয়ন প্রধান। সেই প্রেমনয়নে যার প্রতি চাইছেন—সেই প্রেমে মাতোয়ারা হচ্ছে। নয়ন হতে অবিরত ধারে পতিতের জন্য জলধারা ঝরে পড়ছে। সেই বন্যায় জীবের পাতিত্য কোথায় ভেসে গেল। জীবের অনাদি বহির্মুখতা বশে ভক্তিপথে যে বাধা ছিল তার নাশ হল। কৃষ্ণভক্তিরস আস্বাদনের জন্য আজ কৃষ্ণ আবির্ভূত হয়েছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রশ্ন করেছেন—কোথায় বাস করা উচিত? এখানে সিদ্ধান্ত হচ্ছে—কৃষ্ণপ্রেমমদিরাপানে লুব্ধচিত্ত যারা তাদের কোথায় বাস করা উচিত? সাধকের সাধন স্থান মহিমার উপরেও অনেকখানি নির্ভর করে। শ্রীপাদ রামানন্দ রায় মহাপ্রভুর অভিপ্রায় বুঝে উত্তর দিচ্ছেন ব্রজে এব। কৃষ্ণভক্তিরসলুব্ধ যারা তাদের একমাত্র ব্রজেতেই বাস করা উচিত। কারণ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড প্রাকৃত সৃষ্টি হলেও শ্রীমথুরামণ্ডল এই প্রাকৃত সৃষ্টির

মধ্যে পড়ে না। বলা আছে—'মথুরা ভগবান্ যত্র নিত্যং সন্নিহিতো হরিঃ।' নিত্য বলায় মহাপ্রলয়ের সময়েও যে ভগবান মথুরায় অবস্থান করেন এইটিই বুঝা গেল। মহাপ্রলয়ের সময়েও যে ভগবান শ্রীসুদর্শনের উপরে মথুরামণ্ডলকে ধারণ করেন। বৃন্দাবনভূমির প্রশংসা করেছেন ব্রহ্মা বাকপতি বেদবক্তা। ব্রজরমনী সকলেই হলেন মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মী—এরা কান্তাবর্গ আর কান্ত হলেন পরমপুরুষ শ্রীগোবিন্দ নিজে। কৃষ্ণ কৃপাতেই ব্রহ্মা কৃষ্ণদর্শন করেছিলেন। স্বর্গের কল্পতরু প্রাকৃত আর বৃন্দাবনের প্রতি বৃক্ষলতা অপ্রাকৃত কল্পতরু কল্পলতা। এখানকার ভূমি চিন্তামণিময়। চিন্তামণিময় ভূমি আর কল্পবৃক্ষময় বন। বৃন্দাবনের প্রতি রজঃকণা কোটি কোটি চিন্তামণিকেও তুচ্ছ করে—সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা যেথায় গুল্ম হতে বাঞ্ছা করেন। কিন্তু ভিখারী যেমন রাজার কাছে রাজমুকুট প্রার্থনা করলে মাত্রা ছাড়ানো প্রার্থনা হয় ব্রহ্মার বৃন্দাবনে তৃণজন্ম প্রার্থনাও সেইরকম। তাই বালগোপালের শ্রীমুখে প্রসন্নতা দেখা গেল না। ব্রহ্মা তাতে বিস্মিত হলেন। কিন্তু ব্রজভূমির রসে ব্রহ্মার লোভ হয়েছে তাই সে লোভ তিনি ছাড়তে পারলেন না। বালগোপালের শ্রীচরণে প্রার্থনা জানালেন—'ব্রজে আমাকে একখানা নির্জীব পাথরের বা কাঠের পাটার জন্মও যদি দয়া করে দাও প্রভু—তাহলেও ব্রজবাসীর চরণরজ পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করব। সে ব্রজবাসী হয়ত নীচ জাতি হাড়ি চণ্ডাল হতে পারে—কিন্তু ব্রজবাসী তো বটে। ব্রহ্মার আজ মনে হচ্ছে—সৃষ্টিকর্ত্তার পদমর্য্যাদা কিছু নয়—সে সৌভাগ্যকেও সৌভাগ্য বলে মনে করি না—ব্রজে জন্মই হল প্রচুর সৌভাগ্য—যাকে ব্রহ্মা ভূরিভাগ্য বলেছেন।

গোলোক অপেক্ষাও ভূবৃন্দাবনের লীলার মাধুরী এবং বৈশিষ্ট কোনও কোনও অংশে বেশী। শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতগ্রন্থে গোপকুমার বলেছেন—কৃষ্ণপ্রেম দিয়ে তৈরী শ্রীমদ্ভাগবত তাই ভাগবত পরমসুন্দর। শ্রীমদ্ভাগবত অর্থাৎ শ্রীযুক্ত ভাগবত অর্থাৎ পরম প্রেমযুক্ত ভাগবত। স্বামিপাদ শ্রী পদের অর্থ করেছেন—পরম সৌন্দর্য্যযুক্ত। শ্রীমতি সুন্দরে ভাগবতে পরমো ধর্মোনিরূপ্যতে। শ্রীমদ্ভাগবত এবং কৃষ্ণতনু অভিন্ন। কৃষ্ণের সৌন্দর্য্য যেমন কৃষ্ণকে মুগ্ধ করে শ্রীমদ্ভাগবতের সৌন্দর্য্যও তেমনি জগৎকে মুগ্ধ করে। পরমপ্রেম—সম্পত্তিমান। এর প্রতি ছত্রে ছত্রে প্রতি বর্ণে অমৃত ক্ষরিত হয়েছে।

বয়ন্তু ন বিতৃপ্যান উত্তমঃ শ্লোকবিক্রমে।
যচ্ছৃণ্বতাং রসজ্ঞানাং স্বাদু স্বাদু পদে পদে॥ ভাঃ ১।১।১৯

ভক্তি সম্পত্তিটি ভগবানের নিজস্ব। কিন্তু তিনি এটি প্রায় কাউকে দিতে চান না। শ্রীশুকদেব বললেন—

মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ বললেন—

কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি মুক্তি দিয়া।
কভু প্রেমভক্তি না দেন রাখেন লুকাইয়া॥

শ্রীভগবানের শ্রীমুখের উক্তি—

আমি চিরকাল নাহি করি এই প্রেমভক্তি দান
এই ভক্তি বিনু জগতের নাহি অবস্থান॥
জীব কিছুতেই স্থির হতে নারে।

যতই সাধন করুক না কেন—জীব কিছুতেই স্থির হতে নারে। পুত্র, সখা, প্রাণপতিকরা এই সম্বন্ধ লক্ষণা ভক্তির আশ্রয় না পেলে

জীব কিছুতেই স্থির হতে নারে।

ভক্তিই জগতের ধারক। ভক্তি না থাকলে সৃষ্টি কাজই সম্ভব হয় না। শ্রীজীব গোস্বামিপাদ সৃষ্টির এই রহস্য উদ্‌ঘাটন করেছেন। পূর্ব্বকল্পে ভক্তি অঙ্গযাজনকারী অসিদ্ধ জীবের প্রতি করুণাবশতঃ তাদের ভজনের অবকাশ দেবার জন্য সৃষ্টি হয়েছে আর আনুষঙ্গে অন্য জীবের সৃষ্টি।

এই প্রেমলক্ষণা ভক্তি দানের জন্যই ভক্তরূপে শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব। ব্রজরসে ভরপূর গোরাচাঁদ আজ প্রেমাবেশে রামানন্দ রায়কে প্রশ্ন করেছেন—বলত রামানন্দ, সাধকের কোথায় বাস করা উচিত? কোথায় গেলে কৃষ্ণপ্রেমমদিরা পান করা যায়? কোথায় কৃষ্ণরস জমা আছে? সে খবর দিতে পার রামানন্দ? মহাপ্রভুর বাক্যের এইটিই তাৎপর্য্য।

ব্রজভূমি হলেন রসের ভূমি—তাই প্রেম পঞ্চম পরুষার্থের দাতা। সুতরাং প্রেমাস্বাদন যারা করতে চান তাঁদের একমাত্র বাসযোগ্য স্থান হলেন ব্রজভূমি। শ্রীগৌরমণ্ডল ও ব্রজমণ্ডল অভিন্ন। ঠাকুর নরোত্তম বলেছেন—

শ্রীগৌরমণ্ডলভূমি যেবা জানে চিন্তামণি
তার হয় ব্রজভূমে বাস।
মহাজনের আস্বাদন আছে—আমরা নিতাই ভজে যাব।
পূর্ণ ব্রজ নদীয়া যটে।

শ্রীপাদ রামানন্দ মহাপ্রভুর প্রশ্নের উত্তরে তাই বলেছেন—সর্ব্বত্যজি জীবের কর্ত্তব্য একমাত্র ব্রজভূমিতে বাস—যেখানে লীলামুকুটমণি শ্রীরাস-লীলার প্রকাশ

প্রভু কহে, সর্ব্বত্যজি জীবের কর্ত্তব্য কাঁহা বাস?
রায় কহে, ব্রজভূমি বৃন্দাবন যাঁহা লীলা রাস।

(১১)

শ্রীগোদাবরী তীরে এক বিচিত্র লীলা। স্বয়ং ভগবান শ্রীগৌরসুন্দরের প্রশ্নের পর প্রশ্ন—আর রায় রামানন্দ শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাপুষ্ট কণ্ঠে উত্তর দিচ্ছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরবর্ত্তী প্রশ্ন—

প্রভু কহে, 'শ্রবণ মধ্যে জীবের কোন শ্রেষ্ঠ শ্রবণ?'
রায় কহে, 'রাধাকৃষ্ণ প্রেমকেলি কর্ণরসায়ন॥'

ভগবানের প্রশ্ন—কিং শ্রবণয়োরানন্দী? রামানন্দ উত্তর দিলেন—বৃন্দাবন ক্রীড়ৈকা। ব্রজলীলা কথাই একমাত্র শ্রবণের আনন্দদায়ক। যে কোনও ইন্দ্রিয়ই বিষয় গ্রহণ করুক না কেন—ইন্দ্রিয় কিন্তু ভোক্তা নয়—ইন্দ্রিয় বিষয় গ্রহণ করে মনের কাছে পাঠায়—মন সেটি রসিয়ে রসিয়ে ভোগ করে। কারণ মনই আসল ভোক্তা। সব খবর তার কাছেই পাওয়া যায়। মন সব সময় আনন্দ চায়। মন মহারাজ তাই ইন্দ্রিয়কে বিষয়ের কাছে পাঠায়। জগতে যত সুখের সামগ্রী মানুষ ভোগ করে—তাকে সুখ বলে মনে করে—বিচারে দেখা যায় কোনটিই সুখ নয়—কারণ জগতের সব বিষয়ই তো অল্প—অল্পে সুখ নেই—ভূমাতেই সুখ। শ্রুতি বলেছেন—ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি। সুতরাং জগতের ক্ষণিক বিনাশী বিষয়ভোগে সুখ হবে কি করে? তাই জাগতিক বিষয়মাত্রই ত্যাজ্য। জগতে যত সুখের বস্তু সেটি সুখ নয়—সুখের আভাস—সুখের প্রতিবিম্ব। যেমন মরুভূমিতে জল নেই—যাকে জল বলে মনে হয়—সেটি জল নয়—জলের আভাস। দেখতে জলের মত। এজগতেও তাই—যাকে সুখ বলে মনে হয়—সেটি সুখ নয়—দেখতে সুখের মত। মানুষের চিত্রে দেহের রক্ত মাংস মেদমজ্জা, অস্থি চর্ম

প্রাণ কিছুই পাওয়া যায় না—পাওয়া যার কেবল খানিকটা কাগজ আর রঙ। তাই মানুষে যে সুখ সে সুখ চিত্রে নেই। তেমনি এই চৌদ্দ ভুবনে যত সুখৈশ্বর্য্য—সবই মায়ার রঙ্—সুখের মত দেখতে কিন্তু সুখ নয়। আত্মাই সুখ। শুধু সুখ নয়—এর নাম আনন্দ। কারণ সুখ এবং আনন্দ দুটি বস্তু আছে। সুখ এ জগতে নয় সুখের আভাস—সেটি স্বার্থপর, সঙ্কীর্ণ, অনুদার—আর আনন্দ নিঃস্বার্থ উদার। সুখ অল্প আর আনন্দ বিরাট। ভূমা সুখ নিজেকে সুখী করতে চায়—আর আনন্দ নিজেকে বিলিয়ে দিতে চায়। সুখ অন্ধকার আর আনন্দ হল আলো। এই আনন্দের আবার স্তরভেদ আছে। ব্রহ্মানন্দ, পরমাত্মানন্দ এবং ভগবদ্বিগ্রহের সেবানন্দ, নামানন্দ, লীলারসের আনন্দ। শ্রীমদ্ভগদগীতায় ভগবান অর্জ্জুনদেবকে উপলক্ষ্য করে বললেন—

সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষামি তে হিতম্॥

গীঃ ১৮।৬৪

ভগবান উপদেশ দিয়েছেন—গুহ্য, গুহ্যতর এবং গুহ্যতম। এই তিন স্তরের ব্যাখ্যা না করলে সর্ব্ব গুহ্যতম পদের সমাধান হবে না। এইভাবে আনন্দের মীমাংসা করা যাবে। কৃষ্ণ মাধুর্য্য হল মাধুর্য্যের অবধি। এর উপরে আর মাধুর্য্য নেই। শাস্ত্রে না হয় এ কথা হল—কিন্তু এর বিচার কি? ভগবান হলেন রসস্বরূপ আর জীব হল সেই রসের ভোক্তা। ভগবদানন্দ এই রস ভোগের চরম অবস্থা। ভগবানের যে কোন রূপই পূর্ণ রসময়। কোথাও এতটুকু ন্যূনতা নেই কিন্তু যেখানে যে রসের বিকাশ যত বেশী হয়েছে সেই স্বরূপের মাধুর্য্য তত বেশী। তাই তো ব্রহ্মা কৃষ্ণ স্বরূপে মাধুর্য্যের চরম বিকাশ উপলব্ধি করে স্তুতি করেছেন—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥

ব্রহ্মসংহিতা—৫ম অধ্যায়

বলা আছে—কৃষ্ণের যে মাধুর্য্য নাহি নারায়ণে। দ্বারকাপতি মথুরাপতি এবং ব্রজপতি—এদের মধ্যে আবার মাধুর্য্যের তারতম্য আছে। ব্রজনাথের মাধুর্য্য সকলের ওপরে। লীলামাধুর্য্য, প্রেমমাধুর্য্য, বেণুমাধুর্য্য, রূপমাধুর্য্য—এই চারটি মাধুর্য্যের স্থান হল ব্রজভূমি। গোবিন্দ ব্রজধাম ছেড়ে অন্য

ধামে যান বটে, কিন্তু এই চারটি মাধুর্য্য ব্রজভূমি ছেড়ে কখনও অন্য কোথাও যায় না। মাধুর্য্য ধামকে চেনে কিন্তু গোবিন্দকে চেনে না। তাই তো ব্রজবাসী ব্রজের রজে পড়ে থাকে—ব্রজ ছেড়ে অন্য কোথাও যায় না। ব্রজবাসী গোবিন্দকে ছেড়েছেন (গোবিন্দ বৃন্দাবন ছেড়ে জয়পুরে গেছেন) কিন্তু ব্রজবাসী ব্রজভূমি ত্যাগ করেন নি। এর তাৎপর্য্য কি? গোবিন্দের প্রকাশ তিন প্রকার। দ্বারকার কৃষ্ণ পূর্ণ, মথুরায় পূর্ণতর আর ব্রজে সেই কৃষ্ণই পূর্ণতম। ব্রজভূমির মাধুর্য্যে স্বয়ং কৃষ্ণচন্দ্রেরও লোভ আছে। ললিতমাধবনাটকে প্রসঙ্গ আছে—মথুরায় থাকার সময় কৃষ্ণের ব্রজলীলার জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠা হয়েছে। এতই উৎকণ্ঠা যে রাজ্যভোগ কণ্টক বলে মনে হচ্ছে। অথচ লীলাসূত্র অনুযায়ী তখন কৃষ্ণকে ব্রজে পাঠানও চলে না। তখন নারদের পরামর্শে নারদ শিষ্য যোগমায়া লীলাশক্তি ভরতমুনিকে দিয়ে ব্রজলীলা নাটক লেখালেন। দেবর্ষিপাদ ও যোগমায়ার শিক্ষায় গন্ধর্ব্বগণ অভিনয় করবেন। মথুরাভূমি হল রঙ্গমঞ্চ। শ্রোতা এবং দর্শক হলেন স্বয়ং গোবিন্দ, বলদেব, উদ্ধবজী। ব্রজলীলার দর্শনে গোবিন্দ নিজেই বিস্মিত। যাঁরা লীলা তাঁরও আকর্ষণ। অভিনয় দর্শন করতে করতে কৃষ্ণ এতই অভিভূত হয়ে গেছেন যে তিনি ভুলে গেছেন যে এটি অভিনয়। বিরহিণী রাধাকে নিকুঞ্জে প্রতীক্ষারতা দেখে কৃষ্ণ নিজে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। তখন উদ্ধব তাঁকে নিরস্ত করেন—বললেন সখা, এ যে অভিনয়। শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধে বলা আছে—

বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভগর্দ্ধেঃ
পরং পদং ভূষণভূষণাঙ্গম্॥ ভাঃ ৩।২।১২

ভগবানের নিজের মূর্ত্তি সৌভাগ্যাতিশয়ের পরাকাষ্ঠা—নিজেই সেই মূর্ত্তিতে মুগ্ধ হয়েছেন। ভূষণ গোবিন্দ অঙ্গে থেকে গোবিন্দ অঙ্গকে সাজায় না—ভূষণ নিজেই সাজে। ভগবানের নিজের মূর্ত্তি দর্শনে নিজেরই বিস্ময়। ভাবছেন—'আমি এত সুন্দর'। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ বললেন—কৃষ্ণস্বরূপ হলেন আত্ম পর্য্যন্ত সর্ব্বচিত্তহর। কৃষ্ণ মাধুর্য্য আনন্দের এবং রসময়তার সবচেয়ে বেশী বিকাশ। জীবের পরমার্থ বলতে যা কিছু তা ব্রজলীলায় আছে। ভগবানের অনেক নাম তার মধ্যে গোপীজনবল্লভ নামে তিনি যত তৃপ্ত হন এমন আর কিছুতে হন না। দ্বারকার কৃষ্ণ, মথুরার কৃষ্ণ এবং ব্রজের কৃষ্ণ তিনই শ্রীগুরুপাদপদ্মের করুণায় জীব দান গ্রহণ করে।

দানে যদি সবই পাওয়া যায় তাহলে সবচেয়ে মূল্যবান যেটি সেইটিই মানুষ নেয়। তাই ব্রজের কৃষ্ণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাস্য এবং সেই ব্রজলীলা কথাই শ্রবণে সবচেয়ে বেশী আনন্দ দান করে।

সখা উদ্ধবজীবকে একবার কৃষ্ণচন্দ্র ব্রজে পাঠান। ব্রজবাসী তখন কৃষ্ণ বিরহে আকুল। উদ্ধবের সঙ্গে ব্রজবাসী কৃষ্ণকথা আলাপ করেছেন। উদ্ধবজী ব্রজবাসীর কৃষ্ণপ্রেম দর্শনে অবাক হয়ে গেছেন। তাও তো ব্রজবাসীকে কৃষ্ণবিরহ দশায় উদ্ধবজী দর্শন করেছেন—উদ্ধব ভাবছেন— আমরাও তো কৃষ্ণবিরহ ভোগ করি। কৃষ্ণ যে সর্ব্বদা আমাদের কাছে থাকেন তা তো নয়—কত সময় আমাদের ছেড়ে অন্য কত জায়গায় যান—আমরা হয়তো তাঁর বহুদিন দর্শনই পাই না—কিন্তু সেই কৃষ্ণবিরহে তো আমাদের এরকম হয় নি। তবু তো ব্রজবাসীকে কৃষ্ণ মিলনের অবস্থায় দর্শনের সৌভাগ্য হয় নি। তবে অনুমান করা যায় বিরহে যাদের বেদনা যত বেশী—মিলনে তাদের আনন্দ তত বেশী। কারণ বিরহে যদি বেদনা না থাকে তাহলে মিলনেও আনন্দ হবে না। এইটি অনুভব করেই উদ্ধবজী বলেছেন—

বন্দে নন্দব্রজস্ত্রীণাং পাদরেণুমভীক্ষ্ণশঃ।
যাসাং হরিকথোদগীতং পুনাতি ভুবনত্রয়ম্॥

ভাঃ ১০।৪০।৬৩

নন্দব্রজের যত ব্রজরমণী আছেন তাঁদের চরণের একটি ধূলিকণাকে আমি বারে বারে প্রণাম করি বন্দনা করি—তাঁদের অর্থাৎ ব্রজস্ত্রীণাং তো বহুবচন দেওয়া আছে। তাহলে তো তাঁদের চরণে তো অসংখ্য ধূলিকণা—তবে উদ্ধবজী তাঁদের একটি রজঃকণাকে প্রণাম করলেন কেন? উদ্ধবজীর পক্ষ হয়ে টীকাকার বলছেন ব্রজরমণীর চরণে অসংখ্য রজঃকণা থাকতে পারে কিন্তু আমার তো একটি ধূলিকণার বেশীকে প্রণাম করার অধিকার নেই—আর তা ছাড়া প্রয়োজনও নেই। কারণ একটি রজকণারই এমন সামর্থ্য আছে যে আমার সকল বাসনা পূরণ করে দিতে পারে। তাই আর অন্যের কাছে প্রার্থনার প্রয়োজন হয় না। যেমন একজন গৃহস্থ যদি এমন দয়ালু হন যে ভিখারীর আঁচল ভরিয়ে ভিক্ষা দিলেন—তাহলে সেই ভিখারীর যেমন অন্য কোন দরজায় ভিক্ষাপাত্র পাতবার দরকার হয় না—এও সেইরকম। উদ্ধবজী নন্দ

ব্রজরমণীদের চরণরেণুকেই বন্দনা করেছেন কিন্তু মথুরানাগরী বা দ্বারকা মহিষীদের চরণরজকে বন্দনা করেন নি। কিন্তু ব্রজরামাদের কৃষ্ণপ্রেমে উদ্ধবজী এমনই আকৃষ্ট হয়েছেন যে তাঁদেরই বন্দনা করেছেন এবং বারে বারে প্রণাম করেছেন। গোপীপ্রেমের মহিমা উদ্ধব বুঝেছেন। তাঁদের কি এমন মহিমা? ভ্রমরগীত প্রসঙ্গে দিব্যোন্মাদ দশায় রাধারাণী বলেছেন— কৃষ্ণদূত তুই এখানে কেন এসেছিস্? আমরা তো ভিখারিণী, তরুতলবাসিনী। আমাদের কাছে তোর প্রার্থনা কি থাকতে পারে? বৃহস্পতির ছাত্র উদ্ধব রাজ্য, সম্পদ, স্বর্গ এমনকি ভগবান কৃষ্ণকে পর্য্যন্ত বিশেষভাবে জানে তবে কেন সে কৃষ্ণ হারিয়ে যারা ক্রন্দনকে সার করেছে সেই কৃষ্ণহারাদের চরণে মাথা লুটিয়ে দিয়েছে? উদ্ধবজীর ব্রজরামাদের চরণে মাথা লোটানোর তাৎপর্য্য হল গোপীদের যে প্রেম তা উদ্ধবজী কখনও কোথাও দেখেন নি। গোপীদের কৃষ্ণপ্রেম দেখে উদ্ধব তাঁদের মহিমা বুঝেছেন। ব্রজরামাদের চরণে প্রণত হয়েও উদ্ধবজীর সাধ্বস বোধ হয়েছে। তাই ব্রজরামারা যে পথে চলে যান সেই পথের একটি ধূলিকণাকে বন্দনা করেছেন। কৃষ্ণপ্রেমের মূর্ত্তি কেমন সেটি প্রত্যক্ষ করবার জন্য কৃষ্ণকৃপাই উদ্ধবজীকে ব্রজে পাঠিয়েছেন। মহাজন বলেছেন—

এই প্রেমা নৃলোকে না হয়।

এই প্রেমের কণা পেলেই উদ্ধবজীর জীবন কৃতার্থতা লাভ করবে। ব্রজভূমির মহিমা কৃষ্ণ নিজে দিয়েছেন। তাই ব্রজলীলাকথা বা ব্রজের যে কোন বস্তুর যদি কেউ উপাসনা করে তাহলে তার অনায়াসে কৃষ্ণপ্রাপ্তি হবে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু লোভাতুর হয়ে প্রশ্ন করলেন—বলত রামানন্দ, কিং শ্রবণযোরানন্দি? অর্থাৎ শ্রবণ যুগলের আনন্দের জিনিষ কি? এখানে কার কানের আনন্দ তা কিন্তু বলা হয় নি। শ্রীপাদ রামানন্দ রায় উত্তর দিলেন— বৃন্দাবন ক্রীড়ৈকা। অর্থাৎ বৃন্দাবনের লীলাকথাই একমাত্র শ্রবণের আনন্দ দান করে। কান কথা শোনে। শব্দই শ্রবণ ইন্দ্রিয়ের একমাত্র গ্রাহ্য বস্তু। ভাল কথা শোনাতেই কানের আনন্দ। কানে গয়না পরালে কানের আনন্দ হয় না। মানুষের আনন্দ হতে পারে কিন্তু কান সে আনন্দ ভোগ করে না। কৃষ্ণগুণময় কুণ্ডল এইটিই কানের অলঙ্কার। শ্রীপাদ রামানন্দ তো এ সিদ্ধান্ত করে দিলেন কিন্তু এখন এই সিদ্ধান্তের বিচার করবে কে? বিচার করবে জীব অর্থাৎ মানুষ। ক্ষুৎক্ষাম মহাপ্রভু বসেছেন প্রস্তুত ভোজ্যের

আশায়। রসপিপাসু গৌরসুন্দরের ভোজ্যদ্রব্য প্রস্তুতের বিলম্ব সহ্য হয় না। ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তিকে যদি বলা যায় উনান জ্বালি, হাঁড়ি চড়াই, অপেক্ষা কর—তাহলে তার সহ্য হয় না। রামানন্দ রায়ের সিদ্ধান্ত শুনে শ্রীমন্মহাপ্রভু কোন কথা বললেন না। অর্থাৎ এতে যে তাঁর সম্মতি আছে তা বুঝা গেল। কাজেই এ সিদ্ধান্তের কোন খণ্ডন হল না।

ব্রজভূমির যত আনন্দ সে আনন্দ ব্রহ্মাণ্ডে নেই। ব্রহ্মাণ্ডের অতীত বৈকুণ্ঠেও সে আনন্দ নেই। শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্রে দ্বিতীয় স্কন্ধ থেকে আরম্ভ করে নবম স্কন্ধ পর্য্যন্ত বলবার পরে দশম স্কন্ধের প্রথম থেকে শ্রীশুকদেব শ্রীভগবানের লীলাকথা আরম্ভ করেছেন। শেযে দ্বাদশ স্কন্ধে বললেন—

যস্তূত্তমঃ শ্লোকগুণানুবাদঃ সংগীয়তেঽভীক্ষ্ণমমঙ্গলঘ্নঃ।
তমেব নিত্যং শৃণুযাদভীক্ষ্ণং কৃষ্ণেঽমলাং ভক্তিমভীপ্সমাণঃ॥
ভাঃ ১২।৩।১৫

উত্তমঃ শ্লোক অর্থাৎ যাঁর শ্লোক অর্থাৎ যশোগাথা উত্তম অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অথবা উদগত হয়েছে তমোগুণ অর্থাৎ প্রকৃতির সত্ত্ব রজঃ এবং তমঃ এই তিনটি গুণই যাঁর যশোগাথা থেকে—তাঁকেই উত্তমঃশ্লোক বলা হয়। এই ভগবানের গুণকীর্ত্তন যদি নিরন্তর করা যায় তাহলে সবরকম পাপ নাশ পায়। সুতরাং কৃষ্ণপাদপদ্মে যারা ভক্তি লাভ করতে চায় তারা সর্ব্বদা তাঁর গুণকীর্ত্তন কানে শুনবে।

শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রে দশম স্কন্ধে যদিও দ্বারকালীলা, মথুরালীলা এবং বৃন্দাবনলীলা সবই বলা হয়েছে তবু তার মধ্যে বৃন্দাবনলীলাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। প্রিয়সখা উদ্ধবজীর সঙ্গে শ্রীগোবিন্দজী যে কথা বলেছেন—তাতে বৃন্দাবনলীলাই যে তাঁর সবচেয়ে প্রিয় এই কথাই বলেছেন। দ্বারকায় একবার শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে দ্বারকা মহিষী সত্যভামাদেবী বলেছিলেন—প্রভু শ্রীবৃন্দাবনলীলাই যদি আপনার সবচেয়ে প্রিয় হয় তাহলে এখানেই আপনি সেই বৃন্দাবনলীলা রচনা করুন। ষোল হাজার একশ আট মহিষী হোক গোপরামা আর বেণু, বিষাণ, ধেনু এ সব যোগাড় করতে আর অসুবিধা হবে না। কিন্তু সেটি তো সম্ভব নয়—কারণ ব্রজরস ব্রজভূমি ছেড়ে তো অন্য কোথাও যাবে না। মহিষীগণ কখনও গোপী হতে পারবেন না। গোপীরা সকলে হলেন মহাভাবস্বরূপিণী। এই মহাভাব যেটি প্রেমের ঘনতম অবস্থা—এই সমর্থারতি একমাত্র গোপরামা ভিন্ন

আর কারো নেই। তাই দ্বারকার মহিষীরা তো এই ভাব পেতে পারেন না। এই মহাভাবকে কৌস্তভমণির মত বলা হয়েছে। কৌস্তভমণি যেমন শুধু হরি বক্ষেই শোভা পায়—হরি বক্ষ ছেড়ে যেমন অন্য কোথাও যায় না—অধিরূঢ় মহাভাবও তেমনি রাধারাণী এবং গোপরামাদের ছেড়ে অন্য কোথাও যায় না। শ্রীশুকদেব যদি শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রে রাধারাণী বা গোপরামাদের নাম উচ্চারণ করতেন তাহলে তাঁর মহাভাবকে স্পর্শ করা হত। আর মহাভাবকে স্পর্শ করলে তাঁর চেতনা থাকত না—তাহলে মহারাজ পরীক্ষিৎকে আর কৃষ্ণ কথা শোনান সম্ভব হত না। কৃষ্ণকথা কইতে কইতে এমনিতেই তো শুকদেব বহুবার মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছেন যার ফলে রাজধানী থেকে মৃদঙ্গ ঘণ্টা এনে বাদ্য বাজিয়ে শ্রীশুকদেবের চৈতন্য সম্পাদন করতে হয়েছে। সুমেরু শৃঙ্গকে যেমন মক্ষিকা মুখে ধারণ করতে পারে না—শ্রীশুকদেবও তেমনি রাধারাণীর নাম জিহ্বায় উচ্চারণ করতে পারেন নি।

এই ব্রজরস তো বটেই—তার মধ্যে সর্ব্বোত্তম হলেন রাধারাণীর প্রেম—এর ভূমি হলেন শ্রীধাম বৃন্দাবন। তাই শুনতে হয় তো শ্রীধাম বৃন্দাবনের লীলাই শ্রোতব্য—এইটিই শ্রবণের আনন্দদায়ক। এ ছাড়া কর্ণের আনন্দদায়ক বস্তু আর হতে পারে না তাই।

শ্রীধাম বৃন্দাবনের কথাকে বাক্‌পতি ব্রহ্মা বললেন—কথা গানম্। বৃন্দাবনের কথাই হল গান—এখানে আর সুরতাল লয় যোগের দরকার হয় না। কথা কইলেই মনে হয় যেন সুস্বরলহরীতে গান হচ্ছে। শ্রীজীবপাদ বলেছেন—যেখানকার কথাই গান—সেখানে কিমুত গানম্—সেখানে যদি আবার সুরতাল লয় যোগে গান করা যায় তাহলে তার মহিমা না জানি কেমন। এই বৃন্দাবনলীলা কথা হৃৎকর্ণরসায়ন। কানে শুনলে রসায়নের কাজ করে। রসায়ন একরকম কবিরাজী ওষুধ—শুধু ওষুধ নয় পথ্যও বটে। রসায়ন বলা হয় তার কারণ হল রোগীর যেটুকু রোগ আছে সেটুকু তো দূর করেই উপরোক্ত পুষ্টি দান করে অর্থাৎ দুর্ব্বলতা সারায়। আমাদের কানে এবং হৃদয়ে এক রোগ আছে আবার পুষ্টির অভাব আছে, অর্থাৎ দুর্ব্বলতা আছে। কানের রোগ হল বিষয় কথা শ্রবণে রুচি—আর দুর্ব্বলতা অর্থাৎ পুষ্টির অভাব হল হরিকথা বেশীক্ষণ শুনতে না পারা। দুর্ব্বল রোগী যেমন দুপা হাঁটতে পারে না—বসে পড়ে তেমনি আমাদের

কানও বেশীক্ষণ ভগবানের কথা নিতে পারে না—অর্থাৎ পরমার্থ পথে হাঁটতে পারে না এইটাই দুর্ব্বলতা। কানের যেমন হৃদয়েরও তেমনি। হৃদয়ের রোগ হল বিষয়চিন্তা, সংসারের চিন্তা আর পুষ্টির অভাব অর্থাৎ দুর্ব্বলতা হল ভগবৎ চিন্তা বেশীক্ষণ করতে না পারা। এখন এই ব্রজলীলা কথা শ্রবণ জীবের পক্ষে রসায়নের কাজ করে। কানের রোগ দূর করে পুষ্টি দান করে আবার হৃদয়ের রোগ দূর করে পুষ্টি দান করে। কান তখন বিষয় কথা শুনতে চাইবে না আর ভগবানের কথা অনেকক্ষণ শুনতে পারবে। হৃদয়ও বিষয় চিন্তা করতে চাইবে না আর ভগবানের চিন্তা অনেকক্ষণ করতে পারবে। তখনই বুঝতে পারা যাবে যে কানের এবং হৃদয়ের রোগ ভাল হচ্ছে এবং পুষ্টিও লাভ হচ্ছে।

এইজন্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর যে প্রশ্ন—বলত রামানন্দ, কিং শ্রবণয়োরানন্দি? রামানন্দ গৌরসুন্দরের কৃপাপুষ্ট কণ্ঠে উত্তর দিলেন—বৃন্দাবনক্রীড়ৈকা। শ্রীবৃন্দাবনবিহারী শ্রীব্রজবিহারীর সঙ্গে ব্রজবধূদের যে বিশেষ ক্রীড়া অর্থাৎ মধুররসের ক্রীড়া অর্থাৎ লীলাকথা যারা শ্রদ্ধা করে নিজ নিজ শ্রীগুরুপাদপদ্মের আনুগত্যে শ্রবণ কীর্ত্তন করবে, শ্রীশুকদেব ভাগবতী কথার যিনি বক্তা তিনি তার ফলশ্রুতি দিলেন—তাদের ভগবানে পরাভক্তি অর্থাৎ শুদ্ধা ভক্তি একা ভক্তি লাভ হবে এবং তখুন হৃদরোগ অর্থাৎ কামনা রোগ নিঃশেষে চলে যাবে। এতটুকু দেরী হবে না—যেমন আলো জ্বালবার সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার দূরীভূত হয়। ভগবানও গীতাবাক্যে বলেছেন—

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতিসোঽর্জ্জুন॥ গীঃ ৪।৯

অর্জ্জুন, আমার জন্ম কর্ম যারা দিব্য বোধে অর্থাৎ অপ্রাকৃত বোধে জানে তাদের নিজেদের জন্ম কর্ম অর্থাৎ কর্মফলে যে গতাগতি তা চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়।

তাই শুনতে হয় তো ব্রজলীলা কথাই শুনতে হবে। এইটিই মহাপ্রভুর হার্দ্দ্য।

(১২)

শ্রীপাদ রামানন্দ রায় সন্নিধানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আর একটি প্রশ্ন হল—বলত রামানন্দ, 'কিমুপাস্যমত্র?' উপাস্যের মধ্যে কোন উপাস্য প্রধান? শ্রীপাদ রামানন্দ এই প্রশ্নের উত্তরে বললেন—

শ্রেষ্ঠ উপাস্য যুগল রাধাকৃষ্ণ নাম॥

রামানন্দের উত্তর—'মহসী রাধাকৃষ্ণাভিধে।' রাধাসহ কৃষ্ণই উপাস্য। প্রথম কথা হল কৃষ্ণ উপাস্য হবেন কেন? প্রশ্ন হচ্ছে—উপাস্য কে হবেন? তার উত্তরে বলা যায় যিনি স্বাধীন তিনিই উপাস্য হবেন। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে দেবতার শ্রেষ্ঠ আসনে বসে আছেন সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা আর দেবাদিদেব শঙ্কর। তাঁরাও শ্রীগোবিন্দের অধীনতা স্বীকার করেন। তাই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের চরণের একটি বিশেষণ আছে শিববিরিঞ্চিনুতম্—ব্রহ্মা যে সৃষ্টি কাজ করেন আর শিব যে রুদ্ররূপে সংহার কাজ করেন—সব গোবিন্দের আদেশে। ব্রহ্মা বলেছেন—

সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহং হরো হরতি তদ্বশঃ॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে আমি সৃষ্টিকাজ করি আর শিবও তাঁরই আদেশে সংহার কাজ করেন। ভগবৎ স্বরূপ মাত্রের অবশ্য ঐ জাতীয় অধীনতা নেই। তবু অংশাংশী সম্বন্ধে অধীনতা আছে। অর্থাৎ যে কোন ভগবৎ স্বরূপের যেমন ভগবানের পুরুষাবতার, লীলাবতার, গুণাবতার যে কোন স্বরূপের অধীন যে শিববিরিঞ্চি তা বলা যাবে না বটে, কিন্তু স্বয়ং ভগবান অবতারী শুধু অবতারী নন, সর্ব্বাবতারী কৃষ্ণচন্দ্রের যেহেতু অংশ কলা এইসব অবতার তাই এদের সঙ্গে স্বয়ং ভগবানের অংশাংশী সম্বন্ধ থাকায় তাঁদেরও অধীন শিববিরিঞ্চি এটি অবশ্যই স্বীকার করতে হয়। শ্রীমদ্ভাগবত বলেছেন—

"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।" ভাঃ ১।৩।২৮

স্বয়ং ভগবানের একটি লক্ষণ আছে। শাস্ত্র বললেন—'অনন্যাপেক্ষি যদ্রূপং স্বয়ং রূপম্ তদুচ্যতে।' এরই অনুবাদ করলেন শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ—

যাঁর ভগবত্তা হইতে অন্যের ভগবত্তা।
স্বয়ং ভগবান শব্দের তাহাতেই সত্তা॥

ব্রহ্মাও বললেন—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ
অনাদিরাদি র্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥

সেই গোবিন্দই হলেন পরম ঈশ্বর—অর্থাৎ তাঁর ওপরে আর ঈশ্বর নেই। তিনি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ—তিনি অনাদি এবং আদি দুই—তিনি সর্ব্বকারণ-কারণম্। এখন প্রশ্ন হতে পারে তিনি অনাদি এবং আদি দুইই হন কি

করে? অনাদি এবং আদি তো দুটি পরস্পরবিরুদ্ধ। তখন সিদ্ধান্ত করা হয়েছে তিনি সকলের আদি অর্থাৎ তাঁর থেকে আর সকলের প্রকাশ— তাই তিনি আদি আর তাঁর কোন আদি নেই—এইজন্য তিনি অনাদি। আর যত যত কারণ আছে সেই সব কারণেরও কারণ তিনি—তাই তিনি সর্ব্বকারণকারণম্। তাই বিচারে 'স্বাধীন' আখ্যা একমাত্র শ্রীগোবিন্দই পেতে পারেন এবং সে আখ্যা পেয়েছেনও।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র পরম স্বাধীন তাই বিচারে তিনিই উপাস্য—এ কথা শ্রীমদ্ভগবদগীতায় এবং শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রে সুষ্ঠুভাবে আলোচিত হয়েছে। শ্রীগোবিন্দ শ্রীমুখে বলেছেন—

সর্ব্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। গী ১৮।৬৬

আরও বললেন—

সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ। গীঃ ১৮।৬৪

এই কথাতে ভগবান সব ছেড়ে তাঁকেই ভজনা করবার উপদেশ দিয়েছেন—অর্জ্জুনের কৃপায় তো মানুষ গীতাশাস্ত্র লাভ করেছে। আর মহারাজ পরীক্ষিতের কৃপায় শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্র লাভ করেছে। গীতা অপেক্ষা ভাগবতের উৎকর্ষ এই কারণে—কারণ গীতায় মানুষ তত্ত্বের অনুসন্ধান পাচ্ছে আর শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্রে পাচ্ছে তত্ত্ব এবং লীলা দুইই। কারণ গীতায় ভগবান বক্তা তাই নিজের লীলাকথা নিজে বলতে পারেন নি—কারণ ভগবান যদি নিজের লীলাকথা নিজে বলেন তাহলে তা মানায় না—আর শ্রীমদ্ভাগবতে ভক্ত শ্রীশুকদেব বক্তা তাই ভগবানের লীলা কথা প্রাণভরে বলেছেন। তত্ত্ব হল পুষ্প আর লীলা হল তার সৌরভ। ফুলের আদর হয় তখনই যখন তাতে সৌরভ থাকে। গীতা অর্জ্জুনদেবের দান আর ভাগবত মহারাজ পরীক্ষিতের দান। তাই অর্জ্জুনের চেয়ে পরীক্ষিতের দান বেশী। তাই অর্জ্জুনের চেয়ে মহারাজ পরীক্ষিতের উৎকর্ষ একথাও স্বীকার করতে হবে। আর তাছাড়া অর্জ্জুনের নাতি পরীক্ষিৎ অতএব ভগবানেরও নাতি। স্নেহ এবং কৃপা হল নিম্নগামী। তাই ভগবান যদি অর্জ্জুনের চেয়ে মহারাজ পরীক্ষিৎকে বেশী স্নেহ বা কৃপা করে থাকেন তাতে অর্জ্জুনেরও ক্ষোভের বা দুঃখের কোন কারণ থাকতে পারে না। মহারাজ পরীক্ষিৎ কলিরাজাকে দমন করেছেন— তাই কলির প্রভাব তখনও বিস্তৃত হয় নি। কলিরাজ তাঁর থানা বসিয়েছেন

কিন্তু তাঁর শাসন তখনও চালু হয় নি। মহারাজের উপরে শমীকমুনির পুত্র শৃঙ্গীর অভিশাপের কথা শমীক মুনি শিষ্য গৌরমুখকে দিয়ে মহারাজের কাছে পাঠাবার আদেশ করলেন। গৌরমুখ এ দুঃসংবাদ মহারাজের কাছে নিয়ে যেতে রাজী না হওয়ায় ছল খুঁজছেন। বললেন—পায়ে কাঁটা ফুটেছে—চলতে পারছি না। তখন শমীক মুনি বলছেন—মহারাজ পরীক্ষিৎ এখনও জীবিত আছেন—কেবলমাত্র তাঁর ওপরে ব্রহ্মশাপ হয়েছে যে সাতদিন পরে তিনি চলে যাবেন। এতেই কলির প্রভাব কতদূর বিস্তৃত হয়ে পড়েছে যে গুরুর সামনে শিষ্য মিথ্যা কথা বলছে। এতে লজ্জিত হয়ে গৌরমুখ মহারাজের কাছে খবর নিয়ে গেলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধে শ্রীশুকদেব আক্ষেপ করে বলেছেন—

কলৌ ন রাজন্ জগতাং পরং গুরুম্
ত্রিলোকনাথানত পাদপঙ্কজম্।
প্রায়েণ মর্ত্ত্যা ভগবন্তমচ্যুতং
যক্ষ্যন্তি পাষণ্ড বিভিন্ন চেতসঃ॥ ভাঃ ১২।৩।৩৭

শ্রীশুকদেব বলছেন—মহারাজ, কলির লোক পাষণ্ডগণের বিচারে হতবুদ্ধি হয়ে জগতের পরমগুরু ত্রিলোকনাথ ভগবান অচ্যুতের পূজা আর প্রায় করবে না। ত্রিলোক বলতে ঊর্দ্ধ, মধ্য এবং অধঃ এই তিনলোককে বুঝাচ্ছে। 'প্রায়েণ' এখানে একটি কথা আছে—তাতে বুঝাচ্ছে একেবারে কেউ ভজবে না তা নয়, কেউ কেউ ভজবে। তবে বেশীর ভাগ লোকই ভজবে না। পাষণ্ড বলা হয় তাদের যারা বেদ বিরুদ্ধ বা বেদ বহির্ভূত কাজ করে। ভাবী কলিযুগের এই অবস্থার সূচনা ত্রেতা যুগেও দেখা গেছে। বনপথে শ্রীরামচন্দ্র চলেছেন—রামচন্দ্র আগে মাঝে সীতামা এবং পিছনে সেবক বিগ্রহ শ্রীলক্ষ্মণজী। হঠাৎ রামচন্দ্র বলে উঠলেন—বনভূমির পথ আগাছায় ঢেকে গেছে। পথ দেখা যাচ্ছে না। উপবৃক্ষের নামই আগাছা। আগাছা পথকে ঢেকে ফেলেছে। এর থেকে বুঝা যাচ্ছে আগামী কলিযুগে উপধর্ম্ম প্রকৃত ধর্ম্মপথকে আচ্ছন্ন করবে।

শ্রীকৃষ্ণ উপাসনাই যে শ্রেষ্ঠ উপাসনা—এ সংবাদ বারবারই পাওয়া যায়। ভগবান নিজেই বলেছেন—

মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে। গীঃ ৭।১৪

শ্রীগোবিন্দকে একবার আশ্রয় করতে পারলে মায়া আর তার কাছে

আসতে পারে না। কৃষ্ণ ভিন্ন অন্য দেবতার আরাধনায় মায়াকে উত্তীর্ণ হওয়া যায় না। সনকাদি মুনিগণ একবার পৃথুরাজকে বলেছিলেন—মহারাজ, যদি কৃষ্ণ ছাড়া অন্য কোন দেবতার আরাধনা করে মায়া উত্তীর্ণ হবার বাসনা করেন—তাহলে সে চেষ্টা হবে কুকুরের লেজ ধরে সাগর পার হবার প্রচেষ্টার মত।

কৃচ্ছ্রো মহানিহ ভবার্ণবমপ্লবেশাং ষড়্‌বর্গনক্রমসুখেন তিতিরর্ষন্তি।
তৎ ত্বং হরের্ভগবতো ভজনীয়মঙ্ঘ্রিং কৃত্বোড়ুপং ব্যসনমুত্তর দুস্তরার্ণম্॥
ভাঃ ৪।২২।৪০

অর্থাৎ কৃষ্ণ উপাসনাই যে শ্রেষ্ঠ—তিনিই যে পরম উপাস্য এইটিই স্থির সিদ্ধান্ত পাওয়া গেল। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কৃষ্ণ না হয় উপাস্য হলেন কিন্তু রাধাকৃষ্ণ যুগল উপাস্য এ কথা বলবার সার্থকতা কি? রাধাকৃষ্ণার্চ্চনদীপিকা গ্রন্থে শ্রীজীব গোস্বামিপাদ সিদ্ধান্ত করেছেন—রাধা ছাড়া কৃষ্ণ উপাসনা হয় না। শ্রুতিও রাধার সঙ্গে মাধবের মিলিত বিগ্রহের উপাসনার কথা বলেছেন। এখন রাধা ছাড়া যে কৃষ্ণ উপাসনা হয় না—তার পক্ষে যুক্তি কি? কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান হলেও বিচারে তার তারতম্য আছে। দাসের প্রভু কৃষ্ণ অপেক্ষা সখার সখা কৃষ্ণ উৎকৃষ্ট, আবার সখা কৃষ্ণ অপেক্ষা মায়ের বাৎসল্য কৃষ্ণ আরও বড়। আবার তার চেয়ে গোপীজনবল্লভ মধুর রসের কৃষ্ণ আরও বড়। তাই শ্রীশুকদেব বললেন—

তত্রাতি শুশুভে তাভির্ভগবান্ দেবকীসুতঃ।
মধ্যে মণীনাং হৈমানাং মহামরকতো যথা॥
ভাঃ ১০।৩৩।৭

আবার তার চেয়ে রাধার সঙ্গে মিলিত মাধবের উৎকর্ষ সকলের চেয়ে বেশী। রাধা সঙ্গে মিলিত স্বরূপে কৃষ্ণই ভগবত্তার চরম সীমা। রাধারাণীই কৃষ্ণের সকলের চেয়ে প্রিয়। রাধার সঙ্গে মিলিত হয়েই কৃষ্ণ মদনমোহন হন। অন্যথা তিনি নিজেই মুগ্ধ হয়ে পড়েন। কৃষ্ণ বিশেষ্য, আর ভগবান হলেন বিশেষণ। রাধাপ্রেয়ান্ কৃষ্ণই সকলের চেয়ে উৎকৃষ্ট। এতে যুক্তি হচ্ছে যেমন করেই হোক্ জীবের উচ্ছলিত পরমানন্দ চাই। সূর্য্যের তাপ যেটি জীবের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন, সেটি বালসূর্য্য দিতে পারে না। মধ্যাহ্ন ভাস্করের জন্য অপেক্ষা করতে হয়। সেইরকম শ্রীগোপীজনবল্লভ হলেন সেই মধ্যাহ্ন ভাস্কর—চিদ্বিলাসের পূর্ণতম স্বরূপ। তাই কৃষ্ণ

উপাসনায় পরমানন্দ লাভ হয়। কৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তিই অনন্তকোটি গোপবালার রূপ নিয়েছে। কৃষ্ণের সঙ্গে তাদের ভিন্নতা নেই। সর্ব্বতোভাবে অভিন্নতা। তাই রাধারাণীর সঙ্গে বা গোপরামারাদের সঙ্গে কৃষ্ণের বিলাসে কোন দোষ হতে পারে না। কারণ গোপরামারা কৃষ্ণ ভিন্ন নয়। তত্ত্বে এখানে পরকীয়া কেউ নেই। গোপীরা সকলেই কৃষ্ণের স্বকীয়া। পরমসামর্থ্যবান কৃষ্ণই একমাত্র তাঁর স্বরূপা শক্তি বা যে কোন শক্তির এইভাবে রূপ দান করতে পারেন। যেটি অন্যের পক্ষে সম্ভব নয়। দ্বিতীয় বস্তুতে অভিনিবেশ হলেই ভয় হয়। জীবাত্মাই চিৎ। এর নামই আমি। দেহ ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি যা কিছু সবই এই আমির থেকে ভিন্ন অর্থাৎ দ্বিতীয় বস্তু। এই দ্বিতীয় বস্তুতে অভিনিবেশের ফলে ভয়ের উৎপত্তি। মায়াতরণের সাধনরূপ যে কর্ম, যোগ জ্ঞান যা কিছু বলা আছে সবগুলিই ত্যাগ করতে হবে। সংসারেও দেখা যায় নিজের ভিন্ন পরের বস্তু নিতে গেলেই দণ্ড ভোগ করতে হয়। আমাদের অভিনিবেশ তো সর্ব্বদা দ্বিতীয় বস্তুতে। অর্থাৎ আমি জীবাত্মা ছাড়া অন্য দেহ ইন্দ্রিয়তে অভিনিবেশ। কাজেই আমাদের তো শাস্তি ভোগ করাই উচিত। কিন্তু ভগবান পরম করুণাময় বলে শাস্তি দেন না। দ্বিতীয় বস্তুতে প্রীতিই হল দুঃখের কারণ। তাই এই প্রীতি যত কমান যাবে ততই সুখ। এই দ্বিতীয় বস্তুরই অপর নাম মায়া। স্বরূপের বিস্মৃতিই হল দুঃখ। গোপরামারা কৃষ্ণ ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু নন। শ্রীশুকদেব একটি সুন্দর উপমা দিয়েছেন—'যথার্ভকস্বপ্রতিবিম্ববিভ্রমঃ।' একটি বালক যেমন স্বচ্ছ দর্পণে নিজের প্রতিবিম্ব দেখে অন্য বালক মনে করে তার সঙ্গে সেইরকম ব্যবহার করে—তার সঙ্গে খেলা করে, আদর করে, মুখ ভেঙচায়—গোপবালাদের সঙ্গে কৃষ্ণের বিলাসও ঠিক সেইরকম। কৃষ্ণের নিজ স্বরূপ শক্তিকেই রূপ দিয়েই তিনি তার সঙ্গে বিহার করেছেন—এরা কৃষ্ণ ছাড়া অন্য কেউ নয়—তাই গোপরামাদের সঙ্গে কৃষ্ণের বিহারে কোন পাতিত্য দোষ আসে না।

পরে আবার প্রশ্ন হতে পারে—বেশ, কৃষ্ণ না হয় জীবের উপাস্য হলেন কিন্তু তার সঙ্গে আবার রাধারাণী কেন? তার উত্তরে বলা যায় এই কৃষ্ণ উপাসনাটি জানাবে কে? কেমন করে কৃষ্ণ উপাসনা করতে হয় এটি জানে কে? যদি কেউ কৃষ্ণ উপাসনা করে থাকে তার কাছে জানা যাবে। তখন বুঝা যাবে কিভাবে কৃষ্ণকে উপাসনা করলে তিনি

সুখী হন। সুতরাং কথা এসে পড়ে যে প্রথম উপাসনা করেছেন রাধারাণী এবং সকলে তাঁর কাছেই কৃষ্ণ উপাসনা জেনেছেন, এমন কি শাস্ত্র পর্য্যন্ত। সুতরাং রাধারাণী প্রথম উপাসিকা বলে শ্রীমতী রাধারাণী পরম উপাস্যা। অন্যদিকে সঃ খলু প্রেয়সীবশঃ। রাধারাণীর বশীভূত কৃষ্ণ নিজে। কৃষ্ণ নিজেকে রাধারাণীর দাস বলে পরিচয় দিয়েছেন—

কিশোরী দাস মুই পীতবাস ইহাতে সন্দেহ যার।
কোটি জন্ম যদি আমারে ভজয়ে বিফল ভজন তার॥

রাধারাণী হলেন কৃষ্ণের মনিব। রাধারাণীর অনুমতি ছাড়া গোবিন্দ তো কোথাও যেতে পারেন না। তাই রাধারাণী সন্তুষ্ট হলে কৃষ্ণ নিজে সুখী হন। আবার কৃষ্ণ না ভজলে রাধারাণী সুখী হন না। তাই শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরমশাই বললেন—

কৃষ্ণনাম গানে ভাই রাধিকা চরণ পাই
রাধা নাম গানে কৃষ্ণচন্দ্র।

তাই দেখা যাচ্ছে রাধারাণীর চরণ ভজলে কৃষ্ণ সুখী হন—আবার কৃষ্ণ ভজনে রাধারাণী সুখী হন—তাই সিদ্ধান্ত হল রাধারাণী সহ কৃষ্ণই হলেন উপাস্য।

আর তাছাড়া আরও একটি কথা—ভজনে আশ্রয় বিষয় তত্ত্ব আছেন। আশ্রয় তত্ত্বকে অবলম্বন করে বিষয়তত্ত্বের ভজন এইটিই হল ভজনের কৌশল। রাধারাণী হলেন আশ্রয়তত্ত্ব আর গোবিন্দ হলেন বিষয়তত্ত্ব—তাই রাধারাণীর চরণাশ্রয় করেই কৃষ্ণ ভজতে হবে—একা কৃষ্ণ ভজলে কৃষ্ণ পাওয়া যাবে না—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের শ্রীমুখের উক্তিই প্রমাণ পাওয়া গেল। ব্রজলীলায় যে নিয়ম নদীয়া লীলাতেও সেই একই নিয়ম। এখানে শ্রীনিতাইচাঁদ হলেন আশ্রয় তত্ত্ব আর গৌরসুন্দর হলেন বিষয়তত্ত্ব—তাই নিত্যানন্দ চরণাশ্রয় ছাড়া গৌর পাওয়া যাবে না। তার পক্ষে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখের বাক্য প্রমাণ—

তিলার্দ্ধেক নিত্যানন্দে যার দ্বেষ রহে।
ভজিলেও সে কভু আমার প্রিয় নহে॥

আরও বলেছেন—

মুখেও যে জন বলে মুই নিত্যানন্দ দাস।
নিশ্চয় দেখিবে আমার স্বরূপ প্রকাশ॥

শুধু মুখে যদি কেউ বলে, আমি নিত্যানন্দ দাস তাহলে সে গৌরস্বরূপ অনুভব করবে। কিন্তু গৌরবস্বরূপের অনুভব তো প্রেম ছাড়া হবে না—কারণ ভগবানের অনুভব তো প্রেম ছাড়া হয় না—প্রেমলাভও একমাত্র শ্রীনিত্যানন্দচরণাশ্রয়েই হবে। বলা আছে—

গোপীগণের যেই প্রেম কহে ভাগবতে।
আমার একলা নিত্যানন্দ হইতে পাইবে জগতে॥

তাই নিতাই চরণ আশ্রয় করে গৌর ভজন—এতেই গৌর প্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী। নিতাই কৃপা ছাড়া যেমন গৌর পাওয়া যায় না—তেমনি রাধারাণীর কৃপা ছাড়া কৃষ্ণ মেলে না। তাই রাধাসহ কৃষ্ণ হলেন উপাস্য।

কৃষ্ণপ্রেম তো রাধারাণীর সম্পত্তি। কৃষ্ণের কাছে তো কৃষ্ণপ্রেম থাকতে পারে না। রাধারাণী কৃষ্ণ ভালবাসেন—তাই কৃষ্ণপ্রেমের ভাণ্ডারী হলেন রাধারাণী। এই কৃষ্ণপ্রেমের আস্বাদনের জন্য তাই রাধারাণীর চরণাশ্রয় করতে হবে। কৃষ্ণপ্রেমে বিষ এবং অমৃতের একত্র মিলন। তপ্ত ইক্ষু চর্ব্বণের মত মুখ জ্বলে যায়, তবু ত্যাগ করা যায় না। কৃষ্ণপ্রেম যার কাছে থাকে তাকেই 'কৃষ্ণ' বলে কাঁদতে হয়। তাই রাধারাণী কাঁদেন। সখীরা রাধারাণীকে বলেছেন—সখি কাঁদ আরও কাঁদ। তখন বলেছিলাম না—কৃষ্ণ ভালবাসিস্ না—কৃষ্ণ ভালবাসলে কাঁদতেই হয়—এ কান্নার বিরাম নেই—'রাধা বাষ্পময়ী ন যাতি বিরতিম্'—কৃষ্ণ বলে কাঁদায় রাধার বিরাম হয় না।

এখন জীবের উপাস্য রাধারাণীর সঙ্গে কৃষ্ণচন্দ্র এটি তো সিদ্ধান্ত হল—কিন্তু শ্রীমতী রাধারাণী যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ উপাসনা করেন—যাঁর ওপরে আর কৃষ্ণ উপাসনা হয় না—তাঁর যদি নয়নধারার বিরাম না থাকে—তাহলে সেই রাধাগোবিন্দকে ভজনা করে জীবের আনন্দ পাওয়ার উপায় কি? তখন মহাজন সিদ্ধান্ত করছেন—

সুখময় কৃষ্ণ করেন সুখ আস্বাদন।
ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ॥

ব্রজভূমির তরুলতা, পশুপাখী, ভৃঙ্গ, কোকিল, ময়ূর, শ্রীযমুনা, গিরিরাজ গোবর্দ্ধন, সখাসখী, মাতাপিতা, গোপরামাগণ সবই আনন্দময়। আনন্দের দেবতাকে আনন্দের পুষ্প নিবেদন করে পূজা করা হচ্ছে। আনন্দই ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করেছে। এইটিই রসের পরিপাটি। লীলাশক্তি যোগমায়া

তাঁর শক্তি জীবে দেখাবার জন্য গোবিন্দকেও নিজের বশে রাখেন। গোবিন্দও লীলায় নিজের ইচ্ছায় চলতে পারেন না। যোগমায়া নিজ স্বাতন্ত্র্যে লীলা সংগঠন করেন। কারিকরের হাতে একই ছানা চিনি পাকের ফলে যেমন ভিন্ন ভিন্ন রূপ লাভ করে লীলাশক্তিও তেমনি একই চিৎ এবং আনন্দকে মিশ্রিত করে কত ভাবেই না রূপ দিয়েছেন। ব্রজে কোনও দুঃখ নেই। সবই আনন্দময়। তবে দুঃখ না থাকলে তো আনন্দকে চেনা যায় না। যেমন অন্ধকার না থাকলে আলোক জানা যায় না। তাই ব্রজে আনন্দের মূর্ত্তিকে বুঝবার জন্য পাশে ক্রন্দন রাখা হয়েছে। কিন্তু সে ক্রন্দন প্রাকৃত জগতের ক্রন্দন নয়। এ ক্রন্দনও আনন্দের। এ ক্রন্দনের উপাদান আনন্দ। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ বলেছেন আনন্দই পুরুষার্থ। গোপীপ্রেম হল পুরুষার্থ শিরোমণি। ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ পেরিয়ে প্রেম হচ্ছে পঞ্চম পুরুষার্থ। এরই নাম ভক্তি। তাই গোপীপ্রেমে যদি দুঃখ থাকে তাহলে তাকে পুরুষার্থ কেমন করে বলা যাবে? তাই আসলে এটি দুঃখ নয়। এও আনন্দের এক রূপ। তাই তার পুরুষার্থ হতে বাধা নেই। শিবকে পার্ব্বতী জিজ্ঞাসা করলেন—শ্রীরাধিকার প্রেম কেমন? তার উত্তরে শিব বলেছেন—শ্রীমতী তাঁর অঙ্গের প্রতিটি অংশ কৃষ্ণ প্রয়োজনে বিলীন করার প্রার্থনা জানিয়েছেন। তাঁর শরীরের জল অংশ যেন কৃষ্ণের ক্রীড়া সরোবরে মিলিত হয়। তাঁর শরীরের ক্ষিতি অংশ কৃষ্ণ চরণদলিত পথের সঙ্গে যেন মিশে যায়, তাঁর শরীরের তেজ অংশ যেন কৃষ্ণের দর্পণে মিলিত হয়।

এখন প্রশ্ন হতে পারে—গোপীপ্রেমে যেটি দুঃখের অংশ সেটি আবার কি করে আনন্দ দিয়ে গড়া হবে? এর উদাহরণ একটিই পাওয়া যায়—হিমঘন অর্থাৎ বরফ খুব শীতল কিন্তু অনেকক্ষণ যদি খুব জোরের সঙ্গে বরফ চাপান হয় তাহলে গরম বোধ হয়। তেমনি সুখের অনুভূতিকে বজায় রাখবার জন্য দুঃখের অনুভূতি পাশে রাখা হয়েছে। চিনির পুতুলের নখ, জুতো, ছাতা, ছড়ি, টেরি, চশমা, ঘড়ি সবই যেমন চিনি তেমনি আনন্দময় ভগবানের সবই আনন্দ দিয়ে গড়া। গৌরলীলায় এটি আরও স্পষ্ট। তাই মহাজন গেয়েছেন—

মধুর মধুর গৌর কিশোর
মধুর মধুর হাট

মধুর মধুর সব সহচর
মধুর মধুর নাট
সবাই মত্ত মধুরে।

শ্রীকৃষ্ণ কর্ণামৃতে শ্রীল বিল্বমঙ্গল ঠাকুর বললেন—

মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো
মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্।
মধুগন্ধি মৃদুস্মিতমেতদহো
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্॥

রসরাজ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের রসময় বিগ্রহ আস্বাদনের জন্য জিহ্বার প্রয়োজন। কারণ জিহ্বাই রসাস্বাদন করে। মহাভাব স্বরূপিনী শ্রীমতী রাধারাণী হলেন এই জিহ্বার মূর্তি। কৃষ্ণেরই হ্লাদিনী শক্তি শ্রীমতী রূপে মূর্তি পরিগ্রহ করেছে। কুণ্ডল যেমন সোনা ছাড়া আর কিছু নয়—তেমনি শ্রীমতী রাধারাণী কৃষ্ণেরই হ্লাদিনী শক্তি ছাড়া অন্য কিছু নয়। শক্তি শক্তিমানেতেই বদ্ধ থাকে। কিন্তু রসই যদি সমস্ত বস্তু হয়, সেই রস আস্বাদনের যদি কেউ না থাকেন তাহলে রসের পুষ্টি হয় না। মিছরির কুঁদো আছে কিন্তু তাকে আস্বাদন করবার যদি লোক না থাকে তাহলে রসের পুষ্টিও হয় না—রসের আদরও হয় না। তাই রসিকশেখর রসরাজ শ্রীগোবিন্দ পরম সামর্থ্যবান বলে তাঁরই হ্লাদিনী শক্তিকে রূপ দান করে ভিন্ন করে দাঁড় করিয়ে তাকে দিয়ে নিজেকে অর্থাৎ রসরাজকে আস্বাদন করিয়েছেন। লীলার পুষ্টির জন্য রাধা কৃষ্ণ দুটি দেহের পৃথক পৃথক অবস্থান হয়েছে। মহাজন বললেন—

রাধা কৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি।
অন্যোন্যে বিলসয়ে রস আস্বাদন করি॥

এই কৃষ্ণস্বরূপ এবং তাঁর লীলা সহচরী শ্রীমতী রাধারাণী এক সঙ্গে তাই জীবের উপাস্য হয়েছেন। কৃষ্ণ হলেন খাদ্য এবং রাধারাণী হলেন ক্ষুধা। কৃষ্ণ হলেন রস এবং রাধারাণী হলেন রুচি। ক্ষুধা বা রুচি না থাকলে তো রস বা খাদ্য আস্বাদন করা যায় না। তাই কৃষ্ণকে আস্বাদন করবার জন্য ক্ষুধা বা রুচি নিয়ে রাধারাণী জীবের কাছে দাঁড়িয়েছেন। একজন রস ভোগ করবেন আর একজন রস দান করবেন। রাধারাণী রসদাত্রী তাই আশ্রয়তত্ত্ব আর কৃষ্ণচন্দ্র হলেন রসভোক্তা তাই বিষয়তত্ত্ব।

আশ্রয়তত্ত্বকে অবলম্বন করে বিষয়তত্ত্বের ভজন—তাই রাধারাণীর শ্রীচরণ আশ্রয় করে বিষয়তত্ত্ব গোবিন্দ ভজন—তবে গোবিন্দ প্রাপ্তি সম্ভব হবে। একা বিষয়তত্ত্ব ভজলে বিষয়তত্ত্ব প্রাপ্তি হবে না। আশ্রয়তত্ত্বকে বাদ দিয়ে বিষয়তত্ত্বকে ভজলে প্রাপ্তিও হবে না—আস্বাদন তো হবেই না। কারণ কৃষ্ণচন্দ্র স্বরূপে খাদ্য আছে, ক্ষুধা নেই, রস আছে, ভাব নেই—তাই কৃষ্ণচন্দ্র নিজে আস্বাদন করবার ক্ষুধা দিতে পারেন না—রুচি দিতে পারেন না। এ রুচি বা ক্ষুধা দান করবেন শ্রীমতী রাধারাণী। আর আস্বাদন করতে না পারলে ভগবানকে পেয়েও লাভ নেই। সুতরাং বিচারে রাধারাণীর সঙ্গে কৃষ্ণচন্দ্রই জীবের উপাস্য।

কৃষ্ণ আস্বাদনের চরম মূর্ত্তি হলেন শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী। অন্য আর যে কেউ কৃষ্ণ আস্বাদন করুন সেটি শ্রীমতীর কৃপাতেই সম্ভব হয়। যিনি শ্রীমতীর চরণাশ্রয় যত বেশী করতে পারেন তিনি তত বেশী কৃষ্ণ মাধুর্য্য আস্বাদন করতে পারেন। কারণ কৃষ্ণপ্রেম না পেলে কৃষ্ণ আস্বাদন হয় না। তাই কৃষ্ণমাধুর্য্য আস্বাদন করতে হলে রাধারাণীর চরণাশ্রয় একান্ত প্রয়োজন। তাই রাধারাণীকে বাদ দিয়ে কৃষ্ণ উপাসনাও হবে না—আস্বাদন তো পরে আছে। শ্রীপাদ রামানন্দ রায় তাই মহাপ্রভুর প্রশ্নের উত্তরে বললেন—

প্রভু কহে, উপাস্যের মধ্যে কোন্ উপাস্য প্রধান?
রায় কহে, শ্রেষ্ঠ উপাস্য—যুগল রাধাকৃষ্ণ নাম॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন এর আগে প্রশ্ন করেছিলেন—'ক স্থেয়ম্'—বলত রামানন্দ, কোথায় বাস করা উচিত—তখন রামানন্দ মহাপ্রভুর হার্দ্য বুঝে উত্তর দিয়েছিলেন—ব্রজে এব প্রভু, বৃন্দাবনেই বাস করা উচিত। কারণ সাধক এমন কোন সাধন করতে পারে না—যার দ্বারা সে নিজেই উঠতে পারে—তাই কারো অবলম্বন চাই। পারিপার্শ্বিক অবস্থাও একটি বড় সহায়। ব্রজে পড়ে থাকলেই লাভ। মহাজন বাক্য আছে দেহে অথবা মনে ব্রজে বাস করবে। ব্রজে রজোরাণীর কাছে ভিক্ষার আঁচল পাতলে আর কিছু অপূর্ণ থাকবে না। তিনি আঁচল ভরে ভিক্ষা দেবেন। শ্রীরূপগোস্বামিপাদ বলেছেন—

অহো মধুপুরী ধন্যা বৈকুণ্ঠাচ্চ গরীয়সী।
দিনমেকং নিবাসেন হরৌ ভক্তিঃ প্রজায়তে॥

ভঃ রঃ সিঃ ১।২।২০৫

অন্য কোথাও বাস করতে অসমর্থ হলে ব্রজে বাস করবে—এ কথা নয়। কারণ ফল কিছু কম নয়। বরং মথুরামণ্ডলে বাস করার ফল বেশী।

অন্যেষু পুণ্যতীর্থেষু মুক্তিরেব মহাফলম্।
মুক্তেঃ প্রার্থ্যা হরের্ভক্তির্মথুরায়ান্তু লভ্যতে॥
ত্রিবর্গদা কামিনাং যা মুমুক্ষুণাঞ্চ মোক্ষদা।
ভক্তীচ্ছোর্ভক্তিদা কস্তাং মথুরাং নাশ্রয়েদ্বুধঃ ॥

ভঃ রঃ সিঃ ১।২।২৩৩-৩৪

যে কোন সাধক যে কোন সাধন করুক না কেন সবই প্যারীজীর দয়া। তাই প্যারীজীর আনুগত্যে ব্রজের দয়া হবে। এই দয়া পাওয়ার উপায় কি? যাঁকে শ্যামসুন্দর দয়া করেছেন তাঁর দয়া পেলে তবে শ্যামসুন্দর দয়া করবেন। তবে রজোরাণীর কৃপা হবে। ব্রজের ভূমি সাধন ভূমি। এই ভূমিতে রাজার দুলালও ক্লেশ বরণ করে রজোরাণীর কৃপা পাবার জন্য। ব্রজের ভূমিতে পড়ে থাকলে আপনিই সাধন হবে। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মশাই বললেন—

শ্রীগৌড়মণ্ডল ভূমি যে বা জানে চিন্তামণি
তার হয় ব্রজভূমে বাস।

ভগবৎ স্বরূপ দুর্জ্ঞেয় অর্থাৎ জানা কঠিন কিন্তু অজ্ঞেয় অর্থাৎ জানা যায় না একথা বলা হয় নি। ভগবানকে যতদিন মানুষ জানতে আরম্ভ না করেছে ততদিন মানুষ বেশ নিশ্চিন্তে থাকতে পারে—কিন্তু যেদিন থেকে তার জানা আরম্ভ হয়েছে সেদিন থেকে তার আর বিরাম নেই। অপার অগাধ অর্থাৎ মাধুর্য্য আস্বাদনের শেষ নেই, তল নেই, সীমা নেই। এ অনন্তের আস্বাদনের আর শেষ হবে না। ভগবানকে বুঝে নেওয়ার জন্যই সাধন। ভক্তিমহারাণীর কারখানায় নয়টি চাকার মাঝখানে চিত্তবসন যখন টেনে নেবে তখনই আকর্ষণ বুঝা যাবে। তখন আর কিন্তু কিছুতেই সে মাধুর্য্যপানে তৃপ্তি হবে না। শ্রীমতী রাধারাণী বলেছেন—

জনম অবধি হাম রূপ নেহারঁলু
নয়ন না তিরপিত ভেল
লাখ লাখ যুগ হিয়া পর রাখলুঁ
তবু হিয়া জুড়ন না গেল॥

তখন অবস্থা হবে—

না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছো গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো
কেমনে পাইব সই তারে॥

সান্নিপাতিক রোগীর দুরন্ত পিপাসা যেমন কলস কলস জলপানেও তৃপ্ত হয় না, তেমনি সাধকের ক্ষুধা এবং কৃষ্ণপাদপদ্ম মাধুর্য্যরূপ খাদ্য এই দুটির কোনটিরই যদি নিবৃত্তি না হয় তাহলে কোনটিরই শেষ হবে না। সিদ্ধিলাভ করেও সাধক অপূর্ণ থাকবে। আস্বাদনের এইরকমই ধারা—রাধারাণীর আস্বাদনেরই যখন শেষ নেই—তখন কার আস্বাদন আর সম্পূর্ণ হবে? এই রাধারাণীর কৃপা তাই যার প্রতি যতটুকু তার কৃষ্ণ আস্বাদন ততটুকু পরিমাণে সম্ভব।

এখন রামানন্দ রায় যে সিদ্ধান্ত করলেন—রাধারাণীর সঙ্গে কৃষ্ণচন্দ্র হলেন জীবের উপাস্য—এটি যুক্তিতে কি করে টিকবে? তার উত্তরে বলা যায় যে রাধারাণীর প্রেমই হলেন সাধ্যশিরোমণি। তাই গোবিন্দকে যিনি যতই বশীভূত করতে পারেন—তার মধ্যে রাধারাণী সর্ব্বশ্রেষ্ঠা।

ইহার মধ্যে রাধার প্রেম সাধ্যশিরোমণি।
যাহার মহিমা সর্ব্বশাস্ত্রেতে বাখানি॥

রাধারাণীর জন্য কৃষ্ণচন্দ্র অন্য গোপরামাদের ত্যাগ করেছেন—এতেই রাধারাণীর প্রতি কৃষ্ণের প্রেমের গাঢ়তা প্রকাশ পাচ্ছে। কৃষ্ণ বাঞ্ছা পূর্ণ করাই রাধারাণীর কাজ।

কৃষ্ণের যতেক বাঞ্ছা রাধাতেই রহে।
কৃষ্ণবাঞ্ছা পূর্ত্তিরূপ করে আরাধনে।
অতএব রাধিকা নাম পুরাণে বাখানে॥

এই রাধারাণীর সৌভাগ্য-গুণ দ্বারকামহিষী দেবী সত্যভামাও কামনা করেন। রাধারাণীর কাছেই সকল কলাবিলাস ব্রজরামাগণ শিক্ষা করেন। লক্ষ্মী পার্ব্বতী যাঁর সৌন্দর্য্যাদিগুণ বাঞ্ছা করেন। রাধারাণীর পাতিব্রত্য দেবী অরুন্ধতী পাবার অভিলাষ করেন। এককথায় বলা যায় রাধারাণীর গুণ গণনা কৃষ্ণ নিজেও করতে পারেন না। সুতরাং জীব ক্ষুদ্রবুদ্ধি সে তো গণনা করতে পারবেই না। তাই রাধারাণীর সঙ্গে কৃষ্ণ ভজলে কৃষ্ণপ্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী।

শ্রীগোদাবরী তীরে আজ রসসাগর শ্রীপাদরামানন্দের সঙ্গে রসিকেন্দ্র-চূড়ামণি শ্রীগৌরসুন্দর রসরাজ গৌরাঙ্গনটের মহামিলন। এই মিলনে দুজনেই প্রেমের আস্বাদনে ভোরা। রসে মাতোয়ারা। দুজনের ইষ্টগোষ্ঠীতে এক অপূর্ব্ব রসের তরঙ্গ, ভাবের লহরী উঠেছে। ভাবের এক অপূর্ব্ব উচ্ছলন হয়েছে।

১২ (ক)

এরপরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরবর্ত্তী প্রশ্ন—রামানন্দ রায়ের কাছে—আস্বাদনের লোলুপতায় প্রশ্ন করেছেন—বলত রামানন্দ—

মুক্তি ভক্তি বাঞ্ছে যেই কাঁহা দুঁহার গতি?
স্থাবরদেহ দেবদেহ যৈছে অবস্থিতি॥

ভক্তিরসিক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রশ্ন—যারা মুক্তি বাঞ্ছা করে তাদের কি গতি আর যারা ভক্তি বাঞ্ছা করে তাদেরই বা কি গতিলাভ হয়—বলত রামানন্দ।

রামানন্দ মহাপ্রভুর কৃপাপুষ্ট কণ্ঠে উত্তর দিলেন—

স্থাবরদেহ দেবদেহ যৈছে হয় স্থিতি।

এখানে শ্রীগৌরসুন্দর যে প্রশ্ন করেছেন—

মুক্তি ভক্তি বাঞ্ছে যেই কাঁহা দুঁহার গতি?

জীবের গতি অর্থাৎ স্থান নির্ণয়ে মহাপ্রভুর উক্তির তাৎপর্য্য নয় কিন্তু ভক্তির উৎকর্ষ খ্যাপন করাই তাৎপর্য্য। যারা মুক্তি চায় তাদের কোথায় স্থিতি হয় আর যারা ভক্তি বাঞ্ছা করে তাদের কোথায় স্থিতি? শ্রীপাদ রামানন্দের উত্তর—

স্থাবরদেহ দেবদেহ যৈছে হয় স্থিতি।

যারা মুক্তি বাঞ্ছা করে অর্থাৎ মুক্তি চায় তারা স্থাবরদেহ পায়। এই স্থাবরদেহ তমোগুণের দ্বারা জড়ীকৃত। তাই অস্পষ্ট চৈতন্য। তাদের সুখদুঃখের অনুভূতিও তাই অতি ক্ষীণ। প্রায় নেই বললেই হয়। জড়বৎ মোহগ্রস্ত অবস্থা তাঁদের। আচার্য্য শঙ্কর তাঁর ভাষ্যে বলেছেন,—মানুষের মৃত্যুর পর আত্মা চন্দ্ররশ্মি ধরে আবার জন্মগ্রহণ করে। ধান, যব, গম প্রভৃতি শস্যে চাঁদের কিরণের সঙ্গে আত্মা প্রবেশ করে এবং অস্পষ্টরূপে থাকে। সেই খাদ্য পুষ্ট হলে মানুষের মধ্যে শুক্রকীটরূপে সেই আত্মা জন্মলাভ করে। যে শস্যে যে জাতীয় আত্মা সেই শস্য সেই জাতীয়

লোকে খাবে। শস্য অবহননের সময় আত্মার ব্যথা লাগে না। কারণ আত্মা তখন মোহগ্রস্থ অচেতনের মত। দিনের মধ্যে মানুষেরও নিদ্রার সময় তমোগুণের অভিভব হয়।

মুক্তি যদিও অনেক রকম আছে—এখানে কিন্তু মুক্তি বলতে ব্রহ্মসাযুজ্যরূপ মুক্তিকেই বুঝাচ্ছে। সাল্যোক্যাদি মুক্তিতে বুঝাচ্ছে না। কারণ সালোক্য, সাষ্টি, সারূপ্য, সামীপ্য প্রভৃতি চারপ্রকার যে মুক্তি—বিশেষ করে সামীপ্য মুক্তি ভক্তি ছাড়া তো হয়ই না। তাই এখানে সাযুজ্য মুক্তিই ধরা হয়েছে। সাযুজ্য মুক্তি আবার দু'রকম। ব্রহ্ম সাযুজ্য এবং ঈশ্বর সাযুজ্য। তার মধ্যে যারা ঈশ্বর সাযুজ্য মুক্তি প্রার্থনা করে তারা অতি ঘৃণ্য। কারণ যদি কোন ব্যক্তি রাজভোগের অধিকারী হয়ে ভৃত্যের ভোগ প্রার্থনা করে তাহলে তার যেমন অত্যন্ত দুর্ভাগ্য বুঝতে হবে তেমনি ঈশ্বরের সাযুজ্য লাভ করেও যে ঈশ্বরের পাদপদ্ম সেবা প্রার্থনা না করে তার সঙ্গে লীন হতে চায় তার মত দুর্ভাগা আর কেউ নেই। ঈশ্বর সাযুজ্য যাঁরা লাভ করেন তাঁদের সুখদুঃখের কোন অনুভূতি থাকে না। তাঁদের কাছে অদুঃখং অসুখং সমম্। আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তির নামই মুক্তি। মুক্তিতে সুখপ্রাপ্তি নেই—মায়া পরিত্যাগ মাত্র হয়। আত্মা ভিন্ন দেহই হল আমাদের দ্বিতীয় বস্তু। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-পরিজন, স্ত্রী পুত্র, গেহ, ধন সবই দেহসম্বন্ধীয়। এরা হল দ্বিতীয়ের পল্লব। মুক্ত অর্থাৎ মায়াশূন্য অবস্থায় স্বরূপে থাকা। এ অবস্থা হল উদ্বেগশূন্য। পরের জিনিষকে নিজের বলে মনে করায় জীবের দুঃখের অন্ত নেই। দেহ গেহ, পুত্র, পরিজন সবই তো পরের। পরের কাছে বন্ধকী আছে। যখনই চাইবে তখনই ফিরিয়ে দিতে হবে। এগুলি যে পরের জিনিষ এই বোধটিকে পাকা করতে হবে। পাণ্ডবেরা যখন বনবাসে তখন দুর্য্যোধনের রাজ্যে রস বসে গেছে। মমতায় দুর্য্যোধন রাজ্য চলে যাওয়ায় যত দুঃখ পেয়েছেন মৃত্যুবরণে তত দুঃখ পান নি। বাক্যের প্রচণ্ড শক্তি আছে—'আমার' 'আমার' এই বাক্য ত্যাগ করতে হবে। তাই মহাজন বলেন প্রভুর ইচ্ছা। মায়ার কাছ থেকে ছেড়ে যাওয়ার নামই মুক্তি। নাস্তিকবাদীরা বলেন—বিষয় ভোগ করতে করতে নটিনীর মত আপনিই বিষয় ভোগ ছেড়ে যাবে। এতে সাধনের কোন অপেক্ষা নেই। ভগবান বলেন—নাস্তিকবাদও মায়ার ছলনা। মানুষ যাতে মায়া ছেড়ে না যায় সেজন্য মায়ারই এটি

ছল। কারণ সাধন করলেই তো মায়া ছেড়ে যাবে। মায়া নিজে কি মায়া বিনাশের ওষুধ দিতে পারে? ভগবান বললেন—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥ গীঃ ৭।১৪

ভগবানের মায়া ত্রিগুণাত্মিকা! তাই জীববন্ধন কাজে বড় পটীয়সী। ভগবান বললেন—মায়া দুরত্যয়া—পার হওয়া কঠিন কিন্তু অনত্যয়া অর্থাৎ পার হওয়া যায় না—একথা বলেন নি। বিষ্ণুমায়া অতিক্রম করা কঠিন। দেবাদিদেব শঙ্কর বলেছেন—আমরা সর্ব্বজ্ঞ হয়েও যাঁর মায়া জানতে পারি নি—কিন্তু স্বয়ং তাঁর মায়ায় আবৃত হয়ে আছি। তবে শিবকে মুগ্ধ করতে যে বিষ্ণুমায়ার দরকার কাঙ্গাল জীবকে মুগ্ধ করতে সে বিষ্ণুমায়া প্রয়োগের দরকার হয় না। ভগবানের ইচ্ছায় ভগবানের মায়া সকলকে আক্রমণ করতে পারে। দেবর্ষিপাদ নারদও একবার এই বিষ্ণুমায়ায় মুগ্ধ হয়েছিলেন—ব্রহ্মাও এর হাত থেকে রেহাই পান নি। তবে ভগবানের পাদপদ্মে যারা একান্তভাবে শরণাগতি নিতে পারে তারাই এই দুস্তরা মায়ার হাত হতে অনায়াসে নিষ্কৃতি পেতে পারে।

যাঁরা মুক্তি বাঞ্ছা করেন—সিদ্ধাবস্থায় তাঁদের গতি হল ব্রহ্মসাযুজ্য—এই ব্রহ্মসাযুজ্যকে বৃক্ষাদি স্থাবরদেহে অবস্থিতির মত বলা হয়েছে। তার কারণ হল বৃক্ষ পর্ব্বত প্রভৃতি স্থাবর দেহাবিষ্ট জীব প্রাকৃতিক নিয়মে সামান্য কিছু আনন্দ অঁনুভব করতে পারলেও যেমন আনন্দের বৈচিত্রী অনুভব করতে পারে না, সেইরকম ব্রহ্মসাযুজ্য প্রাপ্ত জীবও আনন্দময় ব্রহ্মের সঙ্গে তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হয়ে আনন্দসত্তায় লীন হয়ে যায় বটে, যার ফলে সামান্যমাত্র আনন্দ অনুভব করে কিন্তু ব্রহ্মে আনন্দ বৈচিত্রীর অভাব আছে বলে কোনও রূপ আনন্দ বৈচিত্রী অনুভব করতে পারে না।

আবার যারা ভক্তি বাঞ্ছা করেন সিদ্ধাবস্থায় নিজের নিজের ভাব অনুযায়ী তাঁরা পার্ষদগতি লাভ করে শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের কাছেই অবস্থান করেন। তাঁরা নিজের ভাবানুকূল শ্রীকৃষ্ণ সেবাও লাভ করতে পারেন। তাই তাঁদের এই সেবা প্রাপ্তিকে দেবদেহে অবস্থানের মত বলা হয়েছে। তার কারণ হল দেবদেহে যেমন জীব স্বচ্ছন্দভাবে নানারকম সুখ ভোগ করে থাকে, শ্রীকৃষ্ণের পার্ষদভক্তও তেমনি বিবিধ বৈচিত্র্যময় লীলারস আস্বাদন করে আনন্দ বৈচিত্রী অনুভব করতে পারেন।

এখন এখানে একটি বিশেষ কথা আছে—কোনও কোনও গ্রন্থে পাঠান্তর দেখা যায়—মুক্তি ভুক্তি বাঞ্ছা যেই কাঁহা দুঁহার গতি?

এখন এই ভুক্তি বলতে ইহকালের সুখভোগ বা পরকালের স্বর্গাদি সুখভোগকে বুঝায়। এই সুখ যাঁরা ইচ্ছা করেন তাঁদের প্রতি ভক্তিমহারাণীর কখনও কৃপা হয় না। শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদ বললেন—

ভুক্তি মুক্তি স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবৎ ভক্তিসুখাস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ।।

মহাজন বললেন—

যে হৃদয়ে ভুক্তি মুক্তি বাসনা ধৃষ্টা চণ্ডালিনী থাকে সে হৃদয়ে শুদ্ধা সাধ্বী ব্রাহ্মণী ভকতি দেবী কখনও যান না।

কারণ এই ভুক্তি বাসনা অর্থাৎ ইহলোক এবং পরলোকের ভোগের আকাঙ্ক্ষা আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা কামনা ছাড়া আর অন্য কিছু নয়। তাই ভুক্তি বাসনা যাদের আছে তাঁরা কৃষ্ণপ্রেম কখনই পেতে পারেন না। কারণ পরের পয়ারে যে শুষ্ক জ্ঞানী (অরসজ্ঞ) এবং প্রেমিক ভক্ত (রসজ্ঞ) বলা হয়েছে তাতে 'ভুক্তি' পাঠ হলে তার সামঞ্জস্য থাকে না। কিন্তু 'ভক্তি' পাঠ হলে তার সামঞ্জস্য থাকে। তাই 'মুক্তি ভক্তি' পাঠই সমীচীন বলে মনে হয়। 'ভুক্তি' পাঠ লিপিকর প্রমাদ বলেই মনে হয়।

এইভাবে মুক্তি বাসনা এবং ভক্তি বাসনা যাদের তাদের গতি কেমন—স্থাবরদেহে এবং দেবদেহে—এ কথা বলবার পর শ্রীপাদ রামানন্দ ভাবছেন—এর পরে কি বলা যায়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর তো আর প্রশ্ন নেই। এতক্ষণ তো প্রশ্ন অনুযায়ী রামানন্দ উত্তর দিয়েছেন—এখন যা বলব তাতে মহাপ্রভুর সুখ হবে কি না কি জানি। এই মনে করে ক্ষণকাল চিন্তা করে বললেন।

অরসজ্ঞ কাক চুষে জ্ঞান নিম্বফলে।
রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাম্র মুকুলে॥
অভাগিয়া জ্ঞানী অস্বাদয়ে শুষ্ক জ্ঞান।
কৃষ্ণপ্রেমামৃত পান করে ভাগ্যবান্॥

এখানে শ্রীপাদ রামানন্দ রায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন বুঝে মুক্ত ও ভক্ত এই দুই এর পার্থক্য দেখাচ্ছেন। ভক্তিরসে অনভিজ্ঞ ব্যক্তি অর্থাৎ ভক্তিতে যাদের আদর নেই—যারা ভক্তিরস আস্বাদন করতে জানে না তারা

শুষ্ক জ্ঞান চর্চ্চা করে। কিন্তু ভক্তি বাদ দিয়ে শুধু জ্ঞান সাধনে আনন্দ লাভ হয় না—পরিশ্রমই শুধু সার হয়। জ্ঞানমার্গের সাধককে বললেন কাক। যাঁরা জ্ঞানমার্গের সাধক তাঁরা সাযুজ্য মুক্তি চান কিন্তু তাঁরা প্রেমরসের মর্ম্ম জানেন না। যেমন কাক সুস্বাদু আমের মুকুল খায় না, অথচ স্বাদহীন নিমফল খায় সেইরকম জীবব্রহ্মের অভেদকারী জ্ঞানমার্গের সাধকের ভক্তিরসে রুচি নেই—তাঁরা জীবব্রহ্মের অভিন্নতা প্রতিপাদন করেন—তাঁরা বলেন, জীব সাধন করে সাধনের চরম দশায় ব্রহ্মে লীন হয়ে জীবই ব্রহ্ম হয়ে যায়। কিন্তু এতে তো লীলারসের আস্বাদন নেই, কোন আনন্দ বৈচিত্রী নেই। তাই তাঁরা হলেন অরসজ্ঞ, রসের আস্বাদন পান না—জানেনও না। কারণ ভক্তি বাদ দিয়ে শুধু শুষ্ক জ্ঞান চর্চ্চায় শুধু পরিশ্রম—আনন্দ লাভ হয় না। বাক্‌পতি ব্রহ্মা বলেছেন—তূঁষের (ধানের খোসা) ওপর পাড় দিলে পায়ে ব্যথাই সার হয়—তাতে যেমন এক কণা চাল পাওয়া যায় না তেমনি জ্ঞানী ভক্তি বাদ দিয়ে শুধু জ্ঞান চর্চ্চা করে আনন্দ পায় না—কিন্তু শুধু পরিশ্রম সার হয়। আনন্দই তো জীবের প্রাপ্তি। আনন্দ পাওয়ার জন্যই তো মানুষ যা কিছু করে। জ্ঞানী ভক্তি বাদ দিয়ে শুধু জ্ঞান চর্চ্চা করাতে এই আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়। ভগবান শ্রীগোবিন্দজীও গীতা বাক্যে বললেন—অর্জ্জুন—

ক্লেশোঽধিকতর স্তেষামব্যক্তাসক্ত চেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥ গীঃ ১২।৫

যাঁদের চিত্ত নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মে আসক্ত তাঁদের সিদ্ধিলাভের জন্য বেশী কষ্ট করতে হয় আর ভক্তিমার্গে যারা সাকার সগুণ ভগবানের আরাধনা করে তাদের পরিশ্রম কম অথচ তাদের পাওনা বেশী। কারণ নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মে নিষ্ঠা লাভ করা দেহাভিমানী ব্যক্তির পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর। তাই রামানন্দ রায় বলছেন—যেমন কাক রসের আস্বাদন জানে না—সে অরসজ্ঞ তাই তেতো নিমফল খায়—কারণ রসাল আমের মুকুলের আস্বাদ সে জানে না। তেমনি ভক্তির আস্বাদ যারা জানে না—ভক্তিতে যাদের সমাদর নেই তারা মুক্তিকেই পরম সুখ বলে মনে করে। এই মুক্তির আস্বাদ পাঁচ রকম। সালোক্য অর্থাৎ ভগবানের সঙ্গে এক লোকে বাস করা, সার্ষ্টি ভগবানের সমান ঐশ্বর্য্য লাভ, সামীপ্য ভগবানের

কাছে থাকা, সারূপ্য ভগবানের সমান রূপ লাভ করা, এবং সাযুজ্য ভগবানে লীন হয়ে যাওয়া। এই সাযুজ্য মুক্তি আবার দু'রকম। ব্রহ্মসাযুজ্য এবং ঈশ্বরসাযুজ্য। ব্রহ্মসাযুজ্য মুক্তির চেয়ে ঈশ্বরসাযুজ্য মুক্তি আরও ঘৃণ্য। কারণ ব্রহ্মে তো লীলামাধুর্য্য, রূপমাধুর্য্য রসমাধুর্য্য প্রেমমাধুর্য্যের প্রকাশ নেই—তাই তাতে লীন হলেও কোনও রকমে সহ্য করা যায় কিন্তু ঈশ্বরসাযুজ্য অর্থাৎ ঈশ্বরে লীন হওয়া এটি কিছুতেই সহ্য করা যায় না। কারণ ঈশ্বর হলেন ষড়ৈশ্বর্য্যশালী লীলাময় শ্রীবিগ্রহ। তাঁর রূপমাধুর্য্য, রসমাধুর্য্য, লীলামাধুর্য্যের অনন্ত প্রকাশ। তাই সেই মাধুর্য্য আস্বাদন না করে সে রস আস্বাদন থেকে বঞ্চিত হয়ে যদি শুধু তাতে লীন হয়ে যায়—তাহলে তার চেয়ে মূর্খতা আর কি হতে পারে? যেমন ঘনভরা খাদ্য আছে কিন্তু কেউ যদি সেই খাদ্য আস্বাদন না করে উপবাস দিয়ে পড়ে থাকে, তাহলে লোকে তাকে মূর্খই বলে। ঘরে খাদ্য না থাকলে তো উপবাস দিতেই হবে। ব্রহ্মের স্বরূপে মাধুর্য্যরূপ খাদ্য নেই—অর্থাৎ মাধুর্য্যের প্রকাশ নেই—তাই সেখানে লীন হওয়া ছাড়া উপায় নেই—কিন্তু ভগবানের ঘরে অনন্ত মাধুর্য্য খাদ্য তাই সে খাদ্য আস্বাদন না করে যদি কেউ ভগবানে লীন হয়ে যায় সে তো মূর্খ অর্থাৎ রস আস্বাদন থেকে বঞ্চিত হল। তার দুর্ভাগ্য। মুক্তিতে আনন্দের আস্বাদন নেই। নিম্বফলের মত দেখতে সুদৃশ্য কিন্তু আস্বাদ নেই। আস্বাদনই তো প্রাপ্তি। তাই সাধক রামপ্রসাদ বললেন—

চিনি হতে চাই না মাগো
চিনি খেতে ভালবাসি।

চিনি হয়ে গেলে তো আর চিনির আস্বাদন পাওয়া যাবে না। তেমনি ঈশ্বরে লীন হয়ে গেলে তো আর ঈশ্বরের মাধুর্য্য আস্বাদন করা যাবে না। জ্ঞানী এটি বুঝে না—তাই তাকে অরসজ্ঞ কাকের সঙ্গে উপমা দেওয়া হয়েছে। আর ভক্তি রসলোভী যিনি ভক্তিরস আস্বাদন করতে জানেন—তিনি হলেন রসজ্ঞ কোকিল। রস আস্বাদন করতে জানে কোকিল তাই সে তেতো নিমফলে লুব্ধ হয় না—রসাল আমের মুকুল আস্বাদন করে—ভক্তও তেমনি জ্ঞান নিম্বফলে লুব্ধ হয় না—কিন্তু ভগবানের অনন্ত লীলা মাধুর্য্য আস্বাদন করে ভরপুর হয়ে থাকে। শ্রীপাদ বাবাজী মহারাজ কীর্ত্তন প্রসঙ্গে অক্ষর দিলেন—

বল কে লুব্ধ হয় নিম্বফলে

রসাল আম্রমুকুল পেলে বল কে লুব্ধ হয় নিম্বফলে

জীবের প্রাপ্তির লক্ষ্য হল আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি পূর্ব্বক আত্যন্তিক সুখ প্রাপ্তি। শুধু দুঃখ নিবৃত্তি মানুষ চায় না—কিন্তু দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হোক এইটিই চায় অর্থাৎ দুঃখ যেন আর কখনও না আসে—আবার তার সঙ্গে চায় সুখলাভ হোক। কিন্তু যে সুখ আসবে সে সুখ যেন চিরকাল থাকে, আত্যন্তিক হয়ে থাকে—সে সুখ যেন কখনও হারাতে না হয়। সাংখ্যকার কপিলদেব বললেন—আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তির নামই মুক্তি। এ ছাড়া নূতন কোন সুখের আস্বাদ তাদের নেই। ভারাপগমে সুখী সংবৃত্ত ইতি বৎ। যেমন একজন মানুষ মাথায় একটি বিরাট ভার (বোঝা) বয়ে নিয়ে যাচ্ছে, তাতে ব্যথা তো লাগছে—এখন ঐ ভারটি যদি ফেলে দেওয়া যায় তাহলে সে নিজেকে সুখী বলে মনে করে—কিন্তু ভারটি ফেলে দেওয়াতে দুঃখনিবৃত্তি হল বটে—কিন্তু নূতন করে তো তার কোন সুখের আস্বাদন হচ্ছে না—তেমনি জ্ঞানীরা দুঃখের নিবৃত্তিকেই সুখ বলে মনে করেন। এর ওপর যে ভগবানের লীলামাধুর্য্য, রূপমাধুর্য্য, রস মাধুর্য্যের আস্বাদন আছে তার সন্ধান তারা জানে না—হাতে নগদ সুখ তারা পায় না। তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ বললেন—

জ্ঞানী জ্ঞানে মুক্তদশা পাইনু করি মানে।
বস্তুতঃ চিত্তশুদ্ধি নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে॥

ভক্তিরসের আস্বাদন না পাওয়া পর্য্যন্ত ঠিক ঠিক আনন্দের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। দুঃখ নিবৃত্তিটি সুখের কারণ হয় বটে, কিন্তু সুখময় বস্তু যদি কিছু না থাকত তাহলে তাকেই সুখ বলে মেনে নেওয়া যেত কিন্তু সুখময় কৃষ্ণপাদপদ্ম মাধুর্য্য যখন রয়েছে তখন দুঃখনিবৃত্তিকে চরম প্রাপ্তি কি করে বলা যায়? কারণ শাস্ত্রে কথা আছে—

সুখময় কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন।
ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ॥

কৃষ্ণপ্রেম হলেন ব্রহ্মানন্দ তিরস্কারী। শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ ভক্তিমহারাণীর একটি বিশেষণ দিয়েছেন—মোক্ষলঘুতাকৃৎ। ভক্তিসুখ মুক্তিসুখকে লঘু করিয়ে দেয়—তুচ্ছবোধ কুৎসিৎবোধ করিয়ে দেয়। তাই

প্রেমভক্তির একটি নাম আছে মুকু। এই মুকু যিনি দান করতে পারেন তিনি হলেন মুকুন্দ—তাই গোবিন্দের একটি নাম মুকুন্দ। ভগবানকে না জানলে জীবের গতি নেই। কৃষ্ণচরিতামৃত সাগরে ভক্তগণ সাঁতার দেয়। শ্রুতিগণ মূর্ত্তিমতী হয়ে ভগবানকে স্তুতি প্রসঙ্গে বলছেন—প্রভু, তোমার পাদপদ্ম মধুতে লুব্ধ হয়েছে যে সব ভক্ত হংস তাদের কুল অর্থাৎ বংশ পরম্পরা শিষ্যপ্রশিষ্যাদিরূপে—তাদের আবার যারা সঙ্গ করেছে শুধু সঙ্গ করেছে তাই নয়—সঙ্গ করে সব ছেড়ে হা গোবিন্দ বলে বেরিয়ে পড়েছে তাদের কাছে কোটি ব্রহ্মানন্দ তুচ্ছ হয়ে যায়, স্বর্গসুখ তো তুচ্ছ হবেই। কৃষ্ণলীলাসাগরে সাঁতার দেওয়ার অর্থ হল কৃষ্ণকথার শ্রবণ এবং কীর্ত্তন। কারণ সাঁতার দিতে হলে যেমন দুটি হাত দিয়ে জল কেটে কেটে যেতে হয় তেমনি কৃষ্ণলীলাসাগরে সাঁতার দেওয়ার ভক্তের দুটি হাত হল শ্রবণ এবং কীর্ত্তন। যাঁরা রসজ্ঞ জন তাঁরা এই শ্যামামৃতই পান করেন। কিন্তু এই শ্যামামৃত তো পথে ঘাটে পড়ে থাকে না যে তাকে কুড়িয়ে নিয়ে উপভোগ করলেই হল—তারও একজন মালিক আছেন। ভগবান নিজমুখে বললেন—

কিশোরীদাস মুই পীতবাস
ইহাতে সন্দেহ যার।
কোটিজন্ম যদি আমারে ভজয়ে
বিফল ভজন তার॥

স্বয়ং ভগবান শ্রীগোবিন্দের পরিচয় অনেকে অনেক জায়গায় অনেক ভাবে দিয়েছেন। শাস্ত্র বললেন ভগবান স্বতন্ত্র। কিন্তু এর উপরেও ভগবানের পরিচয় আছে যেটি তিনি নিজেমুখে বললেন—তিনি কিশোরীমণির দাস। এটিই তাঁর খাঁটি পরিচয়। মহাপ্রভুর হার্দ্য যে গোপীপ্রেম গোপী আনুগত্যে ভজন সেইটিই শ্রীপাদ রামানন্দ রায়ের শ্রীমুখ দিয়ে প্রকাশ করলেন। রসতত্ত্ববিদ্‌গণ শ্যামামৃত অঞ্জলিভরে পান করেন। শ্রীরাসস্থলীতে কৃষ্ণের বংশীনিনাদে গোপরামাদের মদনবেগ বৃদ্ধি পেয়েছিল। মদন তো উপচারে বাড়ে। গোপীদের কৃষ্ণানুরাগের বৃদ্ধিই হল এখানে মদনবৃদ্ধি। প্রাকৃত মদন গোপীদের স্বসুখবাসনা জাগাবার চেষ্টা অনেকভাবে করেছিল কিন্তু সফল কাম হয় নি। কারণ গোপীদের মনকে রথ করে রথী হয়েছেন স্বয়ং ভগবান শ্রীগোবিন্দ—তাই রথ যদি বিচলিত হয় তাহলে রথী তো পড়ে যাবেন।

এই মনে করে গোপীরা মদনের ফুলবাণে কিছুতেই টলেন নি। কারণ মন টললেই রথ টলে যাবে। যেমন হনূমানজীর পিঠে প্রভু রামচন্দ্র উঠেছেন। হনূমানজীর পিঠ হল রথ আর ভগবান রামচন্দ্র হলেন রথী। রামচন্দ্র রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ করছেন। রাবণের সেরা সেরা বাণ হনূমানজীকে বিদ্ধ করছে। কিন্তু হনূমানজী এতটুকু বিচলিত হন নি পাছে প্রভুর ব্যথা লাগে। তেমনি গোপরামাদের মনকে রথ করে গোবিন্দ রথী হয়েছেন।

চড়ি গোপী মনোরথে
মনমথের মন মথে।

শ্রীধরস্বামিপাদ এবং শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ বলেছেন—রাসলীলা হলেন কন্দর্পদর্পহালীলা। ভোগ্যবস্তু থাকা সত্ত্বেও ভোগের আকাঙক্ষা যদি না থাকে তাকেই বলা হয় মদন জয়। কৃষ্ণ অনুরাগ গোপরামাদের এতই তীব্র যে তার কাছে জগতের সকল প্রলোভনই তুচ্ছ হয়ে গিয়েছিল। যুদ্ধের নীতি আছে শত্রুকে বর্দ্ধিত করে জয় করার। এখানে মদন হল শত্রু। কৃষ্ণবংশীধ্বনি এখানে গোপীদের কৃষ্ণ পিপাসা বাড়িয়েছে। এর ফলে মদনাবেশ পুষ্টি লাভ করেছে। গোপীরা তাদের নেত্ররূপ অঞ্জলি দিয়ে কৃষ্ণপ্রেম শ্যামামৃত পান করছে। তাঁদের আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে যে দু'এক ফোঁটা পড়ছে তাই রসজ্ঞ ভক্ত পরমানন্দে পান করছেন। অর্থাৎ গোপী আনুগত্যে কৃষ্ণমাধুর্য্য ভোগ করলে মুক্তি, ঋদ্ধি, সিদ্ধি কোন প্রাপ্তিই বাকী থাকে না। সব প্রাপ্তিই পূর্ণতা লাভ করে—অর্থাৎ অন্য কোন প্রাপ্তিতে আকাঙক্ষাই থাকে না।

মহাপ্রভুর হার্দ্য বিষয়টি রামানন্দের শ্রীমুখে প্রকট হয়েছে। মহাপ্রভু শুনে সুখ পেলেন। এর পরে বললেন—এর আগে যা বলেছ তার সঙ্গে এ উক্তির পার্থক্য নেই। প্রায় একই—তাই অন্য কিছু বল।

শ্রীপাদ রামানন্দ সে কথা শুনে বললেন—এর পরে আর কি প্রতিপাদ্য আছে, কি বলব? এই ভেবে মনে মনে চিন্তা করে বললেন।

দ্বাদশ ধারা

এইমত দুইজন কৃষ্ণ কথা রসে।
নৃতগীত রোদনে হৈল রাত্রি শেষে॥
দোঁহে নিজ নিজ কার্য্যে চলিলা বিহানে।
সন্ধ্যাকালে রায় আসি মিলিলা আর দিনে॥

সারা রাত্রি এইভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভু আর রামানন্দ কৃষ্ণকথা রসে, নৃত্য গীতে কাটালেন। প্রেমের গাঢ়তায় দুজনেরই রোদন। এরপরে সকালে দুজনে নিজ নিজ কাজে গেলেন—পরে সন্ধ্যাকালে আবার রামানন্দ এসে প্রভুর চরণে মিলিত হলেন। কতক্ষণ ইষ্টগোষ্ঠী করে প্রভুর চরণে রামানন্দ নিবেদন করলেন—

কৃষ্ণতত্ত্ব, রাধাতত্ত্ব প্রেমতত্ত্বসার।
রসতত্ত্ব, লীলাতত্ত্ব বিবিধ প্রকার॥
এত তত্ত্ব মোর চিত্তে কৈলে প্রকাশন।
ব্রহ্মাকে বেদ যেন পড়াইল নারায়ণ॥
অন্তর্যামী ঈশ্বরের এই রীতি হয়ে
বাহিরে না কহে, বস্তু প্রকাশে হৃদয়ে॥

রামানন্দ বলছেন—প্রভু, তুমি তো এত কৃপা করলে—কিন্তু আমার মনে আজও একটি সংশয় থেকে গেছে—সেটি কৃপা করে নিশ্চয় করো।

এক সংশয় মোর আছয়ে হৃদয়ে।
কৃপা করি কহ মোরে তাহার নিশ্চয়ে॥

এ সংশয়টি কি রামানন্দ খুলে বলছেন—

পহিলে দেখিলু তোমার সন্ন্যাসী স্বরূপ।
এবে তোমা দেখি মুঞি শ্যাম গোপরূপ॥
তোমার সম্মুখে দেখি কাঞ্চন পঞ্চালিকা।
তাঁর গৌরকান্ত্যে তোমার সর্ব্ব অঙ্গ ঢাকা॥
তাহাতে প্রকট দেখোঁ স-বংশী বদন।
নানভাবে চঞ্চল তাহে কমল নয়ন॥
এইমত তোমা দেখি হয় চমৎকার।
অকপটে কহ, প্রভু, কারণ ইহার॥

রামানন্দের এই বাক্যে বুঝা যাচ্ছে যে তিনি অনেক গবেষণা করে গৌরস্বরূপটি উদ্ধার করেছেন। তাঁর হৃদয়ে গৌর প্রতিষ্ঠিত আছেন কিন্তু আমার কাছে তিনি সম্পূর্ণ অচেনা। তাই আমরা তাঁকে আজও বুঝতে পারি নি। তিনি দুর্ব্বোধ। যোগীন্দ্র শ্রীকরভাজন বললেন—যাঁরা সুমেধা তাঁরাই কলিযুগে গৌর উপাসনা করবে। দ্বাপরে বা ত্রেতায় ভগবদুপাসনার অধিকারী শুধুমাত্র মানুষ, কলিযুগে কিন্তু শুধু মানুষ হলেই গৌর উপাসনা করবে তা বলা হয় নি। কলিযুগে গৌর উপাসককে বাছাই করে নেওয়া হয়েছে। পাতলা দুধ খেয়ে যে হজম করতে পারে না সে ক্ষীর হজম করবে কেমন করে? অথচ ক্ষীর হজম করতে গেলে যেমন পাতলা দুধ খাইয়ে ক্ষীর ভোজনের শক্তি করিয়ে নেওয়া হয়—তার ফলে সে পরে ক্ষীর হজম করতে পারে। তেমনি এখানেও গৌরের করুণা ধরে থেকে থেকে তার স্বরূপ আস্বাদন হয়ে যাবে। কৃপাতেই একমাত্র তত্ত্ব উপলব্ধি করা যায়।

রামনন্দ বলছেন—প্রভু, প্রথমে দেখলাম তোমাকে সন্ন্যাসী তারপর দেখলাম—তোমার শ্যাম গোপরূপ—তার ওপর দেখি স্বর্ণ পঞ্চালিকা—তার গৌরবরণে তোমার শ্যাম অঙ্গ ঢাকা পড়েছে। তার ওপর তোমার বংশীবদন রূপ দর্শন করলাম। তোমার নয়নে চঞ্চল চাহনিও তাতে ধরা পড়ল—এইরূপ দর্শন করে মন তো চমৎকৃত হল কিন্তু কপটতা না করে প্রভু সরলভাবে এ রূপের তাৎপর্য্যটি দয়া করে প্রকাশ কর। কারণ তোমার কৃপা ছাড়া তো এ তত্ত্বের অনুভব হবে না। রায় গৌরচরণে সম্পূর্ণরূপে নিজেকে সঁপে দিয়েছেন—কারণ অকপটে কৃপা পাবার এই একটিই উপায় নিজেক সর্ব্বতোভাবে বিকিয়ে দেওয়া, যার নাম আত্মনিবেদন। এই আত্মনিবেদন যার যত বেশী তার ওপর কৃপার বর্ষণ তত বেশী।

রামানন্দ অনুভব করে অবাক হয়ে বলছেন—তোমার সন্ন্যাস মূর্ত্তির সামনে দেখি কাঞ্চন পঞ্চালিকা অর্থাৎ কনককান্তি প্রতিমা অর্থাৎ রাধার অঙ্গের কথা রাধামূর্ত্তি। সেই রাধামূর্ত্তির গৌরকান্তিতে শ্যাম অঙ্গ গৌরীভূত হয়েছে—এই গৌররূপ দর্শন করে শ্রীল নরোত্তম দাস পদকর্ত্তা বললেন—

রাধা অঙ্গ ছটায় উদিত ভেল দশদিশ
শ্যাম ভেল গৌর আকার।

গৌর ভেল সখীগণ গৌর নিকুঞ্জবন
রাইরূপে চৌদিকে পাথার॥
গৌর ভেল শুকসারী গৌর ভ্রমর ভ্রমরী
গৌর পাখী ডাকে ডালে ডালে
গৌর কোকিলগণ গৌর ভেল বৃন্দাবন
গৌর তরু গৌর ফলফুলে
গৌর যমুনা জল গৌর ভেল জলচর
গৌর সারক চক্রবাক।
গৌর আকাশ দেখি গোরাচাঁদ তার সখী
গৌর তায় বেড়ি লাখে লাখ॥
গৌর অবনী হৈল গৌরময় সব ভেল
রাইরূপে চৌদিক ঝাপিত
নরোত্তম দাস কয় অপরূপ রূপ নয়
দুহুঁ তনু একই মিলিত॥

কেবল কান্তিতে গৌর অর্থাৎ রাধার কান্তি কিন্তু অন্য সব দিক দিয়েই কৃষ্ণ। শ্রীমুখে মোহনমুরলী। প্রভু তোমাকে দেখছি বংশীবদন। ঐ গৌররূপী কৃষ্ণে চঞ্চল কুটিল কটাক্ষময়।

মূরতি মদন ধনু ভাঙ্গ বিভঙ্গ।
বিষম কুসুম শর নয়ান তরঙ্গ॥

এইমত সবই কৃষ্ণ শুধু কান্তিতে অর্থাৎ বর্ণে গৌর। তাই রামানন্দ বলছেন—প্রভু, এ এক ঘোরতর সমস্যা। তোমার কৃষ্ণবর্ণ না হয়ে গৌরবর্ণ কেন ছলনা না করে অকপটে এটি বল কৃপা করে।

শ্রীপাদ রামানন্দের এ চাতুরালির কথা শুনে প্রভু হেসে বললেন—রামানন্দ, তুমি যা বললে ও কিছু নয়—ও হল কৃষ্ণে গাঢ় প্রেমের স্বভাব। তোমার তো কৃষ্ণে গাঢ় প্রেম—তাই তুমি এইভাবে দর্শন করেছ।

প্রভু কহে, কৃষ্ণে তোমার গাঢ়প্রেম হয়
প্রেমের স্বভাব এই জানিহ নিশ্চয়।
মহাভাগবত দেখে স্থাবর জঙ্গম।
তাঁহা তাঁহা হয় তাঁর শ্রীকৃষ্ণস্ফূরণ॥
স্থাবর জঙ্গম দেখে না দেখে তার মূর্ত্তি।

সর্ব্বত্র হয় নিজ ইষ্টদেব স্ফুর্ত্তি॥

মহাভাগবত বলতে মহাভক্ত। কারণ ভগবত বলতে ভক্তকেও বুঝায়। এই ভক্তজন যেদিকে দৃষ্টিপাত করে স্থাবরজঙ্গম বৃক্ষলতা, পশুপাখী তাঁতে অন্য কিছু দেখে না, সর্ব্বত্র তার শ্রীকৃষ্ণ স্ফুরণ হয়। দ্বিতীয় যোগীন্দ্র শ্রীহরি উত্তম ভক্তের লক্ষণে বললেন—

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মনেষ ভাগবতোত্তম॥ ভাঃ ১১।২।৪৫

শ্রীভগবান গীতাবাক্যেও তাই বললেন—

সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ইক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥
যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥
গী ৬।২৯-৩০

এই ভক্তজগতের চরমসীমা শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী—তাঁর শ্রীমুখের উক্তি—

জিমু নাগো মুঞি জিমু না কালা
বন্ধুর পিরীত পাকে
আপনার দুটি আঁখি নিবারিতে নারি গো
কালা বিনু আন নাহি দেখে॥

পদকর্ত্তা জ্ঞানদাস বলছেন—

একদিন আয়ান আইলে ঘরে
কালিয়া দেখিনু তারে
বন্ধু বলি তাহারে সম্ভাষি
আমার আরতি দেখিয়া আয়ান
মুখে কাপড় দিয়া হাসি॥
বন্ধুয়ার ভরমে আয়ানের সনে
মনের কথাটি কই।
হাসিয়া হাসিয়া আয়ান বলে
মুই তোমার বন্ধুয়া নই॥

প্রভু বললেন—রামানন্দ তোমার রাধাকৃষ্ণে গাঢ় প্রেম তাই সর্ব্বত্র তুমি

তোমার রাধাকৃষ্ণ স্ফূর্ত্তি পায়। এইভাবে শ্রীগৌরসুন্দর রামানন্দকে মহাভাগবত বলে প্রশংসা করে নিজের স্বরূপটি ঢাকবার চেষ্টা করেছেন— কিন্তু ভক্তের দৃষ্টি কি এড়াতে পারেন? রামানন্দ এ চাতুরী তো ধরে ফেলেছেন। তাই বললেন—

রায় কহে, প্রভু তুমি ছাড় ভারিভুরি।
মোর আগে নিজরূপ না করিহ চুরি॥
রাধিকার ভাবকান্তি করি অঙ্গীকার
নিজরস আস্বাদিতে করিয়াছ অবতার।
নিজ গূঢ় কার্য্য তোমার প্রেম আস্বাদন
আনুসঙ্গে প্রেমময় কৈলে ত্রিভুবন॥

এখানে রামানন্দ স্পষ্টভাবেই মহাপ্রভুর অবতারের উদ্দেশ্য বললেন। ভগবান নিজেকে লুকাবার চেষ্টা করেন কিন্তু ভক্তের কাছে তা ধরা পড়ে যায়।

আপনা লুকাইতে প্রভু নানা যত্ন করে।
তথাপি তাঁহার ভক্ত জানায় তাঁহারে।
অসুর স্বভাবে কৃষ্ণে কভু নাহি জানে।
লুকাইতে নারে কৃষ্ণ ভক্তজন স্থানে॥

রামানন্দ প্রভুর কাছে অনুযোগ করেছেন—

আপনে আইলে মোরে করিতে উদ্ধার।
এবে কপট কর তোমার কোন ব্যবহার॥

রামানন্দ রায়ের কাছে প্রভু ধরা পড়ে গেছেন—রাধারাণীর প্রেমাস্বাদনের জন্যই শ্রীগোবিন্দের গৌর অবতার। নিজেই বলেছেন—

নিজ প্রেমাস্বাদে মোর হয় যে আহ্লাদ।
তাহা হৈতে কোটিগুণ রাধা প্রেমাস্বাদ॥
সেই প্রেমার রাধিকা পরম আশ্রয়।
সেই প্রেমার আমি হই কেবল বিষয়॥
বিষয় জাতীয় সুখ আমার আস্বাদ।
আমা হৈতে কোটিগুণ আশ্রয়ে আহ্লাদ॥
কভু যদি এই প্রেমার হইয়ে আশ্রয়।
তবে এই প্রেমানন্দের অনুভব হয়॥

তাই গৌর অবতারের আন্তর উদ্দেশ্য অর্থাৎ মুখ্য উদ্দেশ্য রাধারাণীর প্রেমাস্বাদন আর আনুষঙ্গে অর্থাৎ বাহ্য বা বহিরঙ্গ উদ্দেশ্য হল নাম প্রেম প্রচার অর্থাৎ জীব উদ্ধার।

প্রেমভক্তি শিখাইতে আপনি অবতরি।
রাধাভাবকান্তি দুই অঙ্গীকার করি॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রূপে কৈল অবতার।
দুই হেতু অবতরি লঞা ভক্তগণ।
আপনে আস্বাদে প্রেম নাম সঙ্কীর্ত্তন॥
সেই দ্বারে আচণ্ডালে কীর্ত্তন সঞ্চারে।
নাম প্রেম মালা গাঁথি পরাইল সংসারে॥

শ্রীপাদ রামানন্দ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে বললেন—

রাধিকার ভাবকান্তি করি অঙ্গীকার।
নিজরস আস্বাদিতে করিয়াছ অবতার॥

রামানন্দ এ উক্তির দ্বারা গৌরস্বরূপের রহস্য উদঘাটন করেছেন। শ্রীরাধিকার ভাবকান্তি অঙ্গীকার করে নিজ রস অর্থাৎ রাধারাণীর প্রেমাস্বাদনের জন্যই তুমি অবতীর্ণ হয়েছ। স্তবমালায় শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে লক্ষ্য করেই বলেছেন—

অপারং কস্যাপি প্রণয়িজনবৃন্দস্য কুতুকী
রসস্তোমং হৃত্বা মধুরমুপভোক্তুং কমপি যঃ।
রুচং স্বামাবব্রে দ্যুতিমিহ তদীয়াং প্রকটয়ন্
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু॥

যিনি লীলাময় হয় কোন এক প্রণয়ীজনের রস আস্বাদন করবার জন্য তা হরণ করলেন—সেই অনির্ব্বচনীয় মধুর রস আস্বাদনের জন্য শ্রীরাধিকার হেমকান্তি দিয়ে নিজের শ্যামকান্তি ঢেকেছেন সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব আমাদের অত্যন্ত কৃপা করুন।

এখানে রসসাগর সম্পৎসম্রাট কৃষ্ণচন্দ্রকে কুতুকী বলা হল কেন? সম্রাট হয়েও তিনি চুরি করেছেন তাই তিনি কুতুকী। তা না হলে কৃষ্ণ তো স্বয়ং ভগবান।

একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য।
যারে যৈছে নাচায় সে তেছে করে নৃত্য॥

কস্যাপি প্রণয়িজনবৃন্দস্য বলতে গোপীমুখ্যা রাধারাণীকেই বুঝান হয়েছে। গোস্বামিপাদ নাম করে বললেন না—কারণ শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্রে শ্রীশুকদেব রাধারাণী বা অন্য কোন গোপরামার নাম করে তো বলেন নি—কারণ সেখানে রাধারাণীর নিষেধ ছিল—কারণ গোবিন্দের সঙ্গে তাঁদের পরকীয়া রসের লীলা—নাম করে বললে তাঁরা লজ্জা পাবেন। আরও একটি কারণ আছে—শ্রীশুকদেবের স্বচ্ছ হৃদয় স্বচ্ছ জিহ্বা—রাধারাণীর নাম এবং স্বরূপ অভিন্ন। আমি নাম উচ্চারণ করলে স্বরূপকে স্পর্শ করতে পারি না—কারণ আমার অস্বচ্ছ হৃদয় অস্বচ্ছ জিহ্বা। কিন্তু শ্রীশুকদেবের তো তা নয়—তাঁর জিহ্বায় রাধারাণীর নাম উচ্চারণ মাত্রে রাধারাণীর স্বরূপকে স্পর্শ করা হবে—তখন তিনি প্রেমে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়বেন—তাঁর আর কৃষ্ণ কথা বলা হয়ে উঠবে না। তাই শুকদেব খুব সাবধানে আছেন—কোথাও রাধা আদি ব্রজরামার নাম উচ্চারণ করেন নি। সেই শুকদেবের আনুগত্যে শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ কথা কইছেন—তাই তিনিও রাধারাণীর নাম করে বললেন না—ঈঙ্গিতে বললেন—কস্যাপি প্রণয়িজনবৃন্দস্য। শ্রীগোবিন্দ রাধারাণী হতে পারলে তবে রাধারাণীর প্রেমাস্বাদন তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে। রাধাগোবিন্দের লীলা তো মধুররসের। রসের দুটি জাতি একটি হল আশ্রয়জাতি আর একটি বিষয়জাতি। যিনি রসদাতা তিনি আশ্রয়জাতি আর যিনি রসভোক্তা তিনি হলেন বিষয়জাতি। এখানে রাধারাণী রস দান করেন তাই তিনি আশ্রয়জাতি আর গোবিন্দ ভোগ করেন তাই বিষয়জাতি। সেই বিষয়জাতি শ্রীগোবিন্দের বাসনা জেগেছে আশ্রয়জাতি রাধারাণীর প্রেমাস্বাদনের জন্য। সেই আস্বাদন কিন্তু বিষয়জাতি স্বরূপে থেকে সম্ভব হবে না—কারণ গোবিন্দের এটি বিজাতীয় বাসনা। তবে সম্ভব হবে যদি বিষয়জাতি গোবিন্দ আশ্রয়জাতি রাধারাণী হতে পারেন কোনও দিন। যেমন এই প্রাকৃত জগতেও দেখা যায় সন্তান (পুত্র বা কন্যা) যতই জ্ঞান গুণী হোক কিন্তু তারা পিতামাতার অন্তরের দরদ বা উদ্বেগ কিছুতেই জানতে পারে না—তবে জানতে পারা সম্ভব হবে যদি কোনও দিন ঐ সন্তান নিজে পিতা বা মাতা হতে পারে। এখানেও সেই একই নিয়ম। বিষয়জাতি গোবিন্দকে আশ্রয়জাতি রাধারাণী হতে হবে—তবে রাধারাণীর প্রেমাস্বাদন তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে। এখন রাধারাণী হওয়া মানে রাধারাণী

স্বরূপে যা আছে সবটি নেওয়া। রাধারাণী স্বরূপে আছে দুটি জিনিষ—ভিতরে ভাব অর্থাৎ মহাভাব যেটি কৃষ্ণপ্রেমের ঘনতম অবস্থা—আর বাইরে আছে সোনাবরণ অর্থাৎ স্বর্ণকান্তি। গোবিন্দ দুটিই নিলেন—শুধু নিলেন নয় চুরি করলেন। ভিতরে নিলেন ভাব—আর চুরি করলেন বলে ধরা পড়বার ভয়ে নিজের কালবরণকে রাধারাণীর সোনারবরণ দিয়ে ঢাকলেন—তাতে ক্রান্তিও নেওয়া হল। এইভাবে ভাবকান্তি নেওয়ার ফলে সম্পূর্ণ রাধারাণী হওয়া হল—এই ভাবকান্তি অঙ্গীকার করে রাধাভাবে বিভাবিত হওয়ার ফলে গৌরস্বরূপে রাধারাণীর প্রেমাস্বাদ সম্ভব হল।

এখন প্রশ্ন হতে পারে কৃষ্ণচন্দ্র রাধারাণীর ভাবকান্তি চুরি করলেন কেন? চাইলেই পারতেন—চাইলে তো রাধারাণীও দিতেন। কারণ তাঁর তো গোবিন্দকে অদেয় কিছু নেই। চাইলে পারতেন রাধারাণীও দিতেন—কিন্তু চাইলে এতটা পেতেন না। কারণ চাইলে মানুষ দেয় কিন্তু বেশী দেয় না—হাত তোলা দেয়—কিন্তু কম পেলে তো কৃষ্ণের হবে না—কারণ নিজে তো আস্বাদন করবেনই আবার আচণ্ডালে এই প্রেম সম্পদ বিতরণ করবেন—এ সঙ্কল্পও আছে। শ্রীশুকদেব শ্রীমদ্ভাগবতে কৃষ্ণস্বরূপের প্রেমদানে কৃপণতাটি ঘোষণা করেছেন—

মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্।

এরই অনুবাদ করলেন শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ—

কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি মুক্তি দিয়া।
কভু প্রেমভক্তি না দেন রাখেন লুকাইয়া॥

তাই শ্রীগোবিন্দের সঙ্কল্প এবারে কৃপণতা দোষ সারিয়ে দাতা হব—এই প্রেম সম্পদ আচণ্ডালে অযাচিতভাবে বিতরণ করব। এত সম্পদ চাইলে পাওয়া যাবে না বলেই—লুঠ করেছেন। গোবিন্দের চুরি কাজের অভ্যাস আছে। তাঁর স্বরূপে চুরি কাজ এটি অপবাদ নয়—তবু যদি ধরা যায় অপবাদ তাহলেও সব অপবাদ ঢেকে গেছে যখন গোবিন্দ রাধারাণীর ভাবকান্তি চুরি করে গৌর হয়েছেন—শাস্ত্র তাঁর এই চুরিকাজের প্রশংসায় মুখর। শ্রীগোবিন্দের রাধারাণীর ভাবকান্তি অঙ্গীকারে চরম গুরুশক্তি। কেননা গুরুশক্তি চরমে রাধায়। এই চরম গুরুশক্তিতেই নাম প্রেমের প্রচার। রামানন্দ বিহ্বল হয়ে বলছেন—চরম

গুরুশক্তি নিয়ে আমাকে উদ্ধার করতে এলে—কারণ কথা তো আছে—

মহান্ত স্বভাব এই তারিতে পামর।
নিজ কার্য্য নাহি তবু যান তার ঘর॥

রামানন্দের অনুযোগ হল—তাহলে এখন এত কপটতা করছ কেন? অর্থাৎ সে কথা স্বীকার করছ না কেন? তুমি কৃষ্ণ রাধার ভাবে রাধার কান্তিতে নিজেকে ঢেকে গৌর হয়েছ—এটি গোপন করছ কেন? রাধারাণীর ভাবকান্তিতে অতিশয় রঞ্জিত গৌর। তাই শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ প্রার্থনা জানালেন—সেই গৌরসুন্দর আমাদের অতিশয় কৃপা করুন। গৌরসুন্দরের প্রকাশ তখনই যখন শ্যামসুন্দর রাধাভাবে অন্তরে বাইরে বিভাবিত হয়েছেন। এখন এই অতিশয় কৃপাটি কি? হে গৌরসুন্দর, তুমি যেমন রাধাভাবে ভিতর বাহির রঞ্জিত হয়েছ, আমাদের ভিতর বাহির তেমনি গোরারসে রসিয়ে দাও, গোরারসে রাঙিয়ে দাও।

শ্রীপাদ রামানন্দ রায় শ্রীমন্মহাপ্রভুকে বলছেন—

নিজ গূঢ় কার্য্য তোমার প্রেম আস্বাদন।
আনুষঙ্গে প্রেমময় কৈলে ত্রিভুবন॥

শ্রীগৌরসুন্দরের যে অবতার তার মুখ্য উদ্দেশ্য হল প্রেম আস্বাদন এবং আনুষঙ্গে জীব উদ্ধার। এখানে জীব উদ্ধার কাজটি গৌণ। কারণ জীব উদ্ধার কাজটি এত গৌণ যে সেজন্য স্বয়ং ভগবানের আসবার দরকার হয় না। ইচ্ছামাত্রে যেমন সৃষ্টি কাজ হয়—তেমনি ইচ্ছামাত্রে জীব উদ্ধার কাজ হয়। কিন্তু ভগবান তা করেন না—কেন? তার কারণ আছে। জীবকে রসভোগে বিষয়ভোগে অবসর দিতে হবে। বিষয় ভোগ করতে করতে জীব যখন তার হেয়তা নিজে থেকে বুঝতে পারবে তখন নিজে থেকেই বিষয়ভোগ থেকে বিরত হবে। এই বিরতিই প্রকৃত বিরতি। তা না হলে বিষয় বাসনা যদি মনের মধ্যে বীজের মত থেকে যায়, তাহলে বাইরে থেকে জোর করে বিষয়ের নিবৃত্তি করালে চলবে না। বিষয়বাসনাকে নির্মূলে ধ্বংস করতে হবে। এজন্য ভোগ প্রয়োজন—তা না হলে ভোগ করতে পেলাম না বলে জীবের আক্ষেপ থাকবে। তাই ভগবান জীবকে বিষয়ভোগের অবসর দেন। এটিও ভগবানের জীবের প্রতি কৃপা। জীবের ওপর ভগবানের কৃপা সর্ব্বদা বর্ষিত হচ্ছে। আকাশ, বাতাস, জল, আলো সবই ভগবানের কৃপার দান। এটি সামান্য কৃপা বা অচিৎ কৃপা, সকলেই

সমানভাবে উপভোগ করছে। কিন্তু ভগবানের একটি বিশেষ কৃপা আছে—যার নাম চিৎ কৃপা—যে কৃপা দিয়ে মায়াকে জয় করা যায়। এই চিৎ কৃপা বা বিশেষ কৃপা ভগবান তাঁর নিজ প্রিয়জনকে ভক্তজনকে দান করেন। সামান্য কৃপা বা অচিৎ কৃপা দিয়ে মায়া জয় হয় না। জীব যখন বিষয় ভোগের তিক্ততা অনুভব করে বলতে পারবে—'আর নারে বাপ'—তখন বিষয়বাসনা ছাড়বে। জগাই মাধাই বলে—'আর নারে বাপ।'

ভগবান জীবের ভোগের জন্য যেমন নানা বিষয় ব্যবস্থা করেছেন, তেমনি বিষয় ত্যাগের উপায় স্বরূপ বিষয় ভোগের তিক্ততাও পাশাপাশি রেখেছেন। এই তিক্ততা বোধ জীবের জাগাবার জন্য ভগবান নিজেই সাধু, গুরু, শাস্ত্ররূপে আবির্ভূত হন।

মহাপ্রভুর প্রধান উদ্দেশ্য হল প্রেম আস্বাদন। রামানন্দ যে বললেন—

আপনে আইলে মোরে করিতে উদ্ধার।
এবে কপট কর তোমার কোন ব্যবহার?

আমাকে উদ্ধার করতে এসে কপট ব্যবহার করছ কেন? কপটতা বলতে এখানে স্বরূপের প্রকাশ না করাই বুঝাচ্ছে। কিন্তু এখানে তো হেতুটির সামঞ্জস্য হল না। কারণ রামানন্দ রায়কে উদ্ধার করাই যদি মহাপ্রভুর উদ্দেশ্য হয় তাহলে স্বরূপ প্রকাশের প্রয়োজন কি? সাধারণ জীবের উদ্ধারে ভগবৎ স্বরূপ প্রকাশের প্রয়োজন হয় না বটে, কিন্তু রামানন্দ রায়ের উদ্ধার তো সাধারণ জীবের উদ্ধার নয়। রামানন্দ তো জীব নন—তাঁর তো কর্মফল নেই—তাই তাঁর উদ্ধারকে সাধারণ জীবের উদ্ধারের সঙ্গে সমপর্য্যায়ে ফেলা যায় না। রামানন্দ রায় ব্রজলীলার বিশাখা সখী—তাই যুগল লীলার সহচরী। তিনি যুগল বোঝেন। তাঁর রাধাকৃষ্ণের মিলন মাধুর্য্যের আস্বাদন আছে। এখন গোদাবরী তীরে রামানন্দ স্বরূপে যখন গৌর প্রত্যক্ষ করছেন তখন রাধাকৃষ্ণের মিলন মাধুর্য্যের চেয়ে বেশী মাধুর্য্যের উপলব্ধি হচ্ছে। তার ফলে রামানন্দের মনে সন্দেহ হয়েছে। জীব বহির্ভূত বিশাখা সখী শ্রীপাদ রামানন্দ রায়কে শ্রীমন্মহাপ্রভু উদ্ধার করতে এসেছেন অর্থাৎ রামানন্দের এই সংশয়রূপ যে বিপদ তার থেকে উদ্ধার করতে এসেছেন। এইজন্যই যদি শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব হয় তাহলে এত কপটতা কেন? অর্থাৎ নিজের স্বরূপ প্রকাশ না করার কারণ

কি? এইটিই রামানন্দের বলবার তাৎপর্য্য। ভগবানের কপটতার অর্থ হল ভক্ত সঙ্গে কৌতুক। প্রিয়স্থানে কৌতুক করার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আছে। ভক্ত সঙ্গে এরকম কৌতুক ভগবান মাঝে মাঝে করেন।

মহারাজ অম্বরীষ নৈষ্ঠিক ভক্ত। তাঁর ইষ্টদেব ছাড়া আর কারও কাছে কোনও দান গ্রহণ করবেন না। ভগবান শ্যামসুন্দর তাই কৌতুক করবার জন্য মহারাজ অম্বরীযের কাছে ইন্দ্রমূর্ত্তিতে দেখা দিলেন—বর প্রার্থনা করতে বললেন। হয় বর প্রার্থনা কর নতুবা বজ্রপাত বক্ষে নিতে হবে। মহারাজ অম্বরীষ কিন্তু নিজের ইষ্ট ছাড়া আর কারও কাছে বর নেবেন না। বজ্রপাত বক্ষে নেবার জন্যই তিনি প্রস্তুত হলেন। তাই চোখ বন্ধ করে প্রতীক্ষা করছেন। বহুক্ষণ হয়ে গেছে কিন্তু বজ্রপাত আর হয় না। চোখ খুলে অম্বরীষ মহারাজ দেখলেন—ইষ্টদেব শ্যামসুন্দর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছেন। কোথায় ঐরাবত, কোথায় ইন্দ্র আর কোথায় তার বজ্র—কেউ কোথাও নেই।

আর একবার প্রহ্লাদ চলেছেন বদরীনারায়ণের দর্শনে। পথে এক সাধুর সঙ্গে দেখা। সাধু বেশ বটে—কিন্তু হাতে তার শাণিত অস্ত্র। তাই দেখে প্রহ্লাদ ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন—অস্ত্র ত্যাগ করুন। সাধু কিন্তু রাজী হলেন না। তখন যুদ্ধ আরম্ভ হল। ছয়দিন সমান যুদ্ধ হল—কিন্তু কেউ কাউকে পরাজিত করতে পারেন না। তখন প্রহ্লাদ বললেন—আগামী কাল যুদ্ধে তোমাকে পরাজিত করব। এই আমার প্রতিজ্ঞা। ঘরে ফিরে গিয়ে পরদিন প্রভাতে ইষ্টদেবের মূর্ত্তি পূজা করে নিজের হাতে মালা গেঁথে তাঁর গলায় পরিয়ে তাঁর অনুমতি নিয়ে যুদ্ধে বার হলেন। এসে দেখেন প্রতিদ্বন্দ্বী সেই সাধুর গলায় তাঁর নিজের হাতে গাঁথা ইষ্টদেবের কণ্ঠে দেওয়া সেই মালা। ইষ্টের কৌতুক বুঝতে পেরে প্রহ্লাদ প্রণাম করে সেই সাধুকে বললেন—তোমার চাতুরী বুঝতে পেরেছি—তা এ ছলনা কেন? ভগবান বললেন—প্রহ্লাদ, তুমি অতদূর পথ কষ্ট করে গিয়ে আমাকে দর্শন করবে—এ বিলম্ব আমার সহ্য হচ্ছিল না, তাই আমি এগিয়ে এসেছিলাম তোমাকে দর্শন করতে। তখন প্রহ্লাদ বললেন—তা তো হল কিন্তু আমি যে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম আগামীকাল যুদ্ধে তোমাকে পরাজিত করব, আমার সে প্রতিজ্ঞা রক্ষার কি হবে? তখন ভগবান বললেন—প্রহ্লাদ আমি তো তোমার কাছে পরাজিত হয়েই আছি আবার নূতন করে তুমি

আমাকে কি পরাজিত করবে?

তাই দেখা যায় ভক্ত সঙ্গে ভগবানের কৌতুক—এ ভগবানের চিরন্তন স্বভাব। ভক্ত ভগবানের স্বরূপ বোধ করে অসাধারণ প্রেম বলে। তাই রামানন্দের কাছেও মহাপ্রভু নিজে রূপ লুকাতে পারলেন না।

তবে হাসি প্রভু তারে দেখাইলা স্বরূপ।
রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ॥

শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ গৌরস্বরূপটি বললেন—

রাধাকৃষ্ণ প্রণয়বিকৃতিহ্লাদিনী শক্তিরস্মা—
দেকাত্মানাবপিভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতি সুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্॥

রসরাজ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের রসময় বিগ্রহ আস্বাদনের জন্য জিহ্বার প্রয়োজন। কারণ জিহ্বাই তো রসাস্বাদন করে। মহাভাবস্বরূপিনী শ্রীরাধিকা এই জিহ্বামূর্ত্তি। কৃষ্ণেরই হলাদিনী শক্তি শ্রীমতীরূপে মুর্ত্তি পরিগ্রহ করেছে। কুণ্ডল যেমন সোনা ছাড়া কিছু নয়—তেমনি শ্রীমতী রাধারাণী কৃষ্ণেরই হলাদিনী শক্তি ছাড়া অন্য কিছু নয়। শক্তি শক্তিমানেতেই বদ্ধ থাকে। কিন্তু রসই যদি সমস্ত বস্তু হয়—রস আস্বাদনের জন্য আলাদা করে কেউ যদি না থাকে তাহলে রসের পুষ্টি হয় না। মিছরির কুঁদো আছে কিন্তু তাকে আস্বাদনের জন্য যদি কোন লোক না থাকে তাহলে রসের পুষ্টি হয় না। তাই রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র পরম সামর্থবান বলেই তাঁর হলাদিনী শক্তি বা আনন্দিনী শক্তিকে নিজের স্বরূপ থেকে ভিন্ন করে রূপ দিয়ে তাঁকে দিয়ে নিজেকে রসরাজকে আস্বাদন করিয়াছেন। লীলারসের পুষ্টির জন্য দুটি দেহের পৃথক অবস্থান হয়েছে রাধারাণী এবং কৃষ্ণরূপে। শ্রীল যদুনন্দন ঠাকুর যেমন নিতাই গৌর সম্বন্ধে বলেছেন—

ভিন্ ভিন্ তনু পরাণ এক।
যেন দুকমলে মৃণাল এক।।

এখানেও তেমনি রাধাকৃষ্ণ দেখতে দুটি আলাদা আলাদা দেহ কিন্তু রাধারাণী কৃষ্ণচন্দ্রে হলাদিনী শক্তি মূর্ত্তিমতী ভিন্ন অন্য কিছু নয়। এই কৃষ্ণস্বরূপ এবং তাঁর লীলা সহচরী শ্রীমতী রাধিকাসুন্দরী গৌররূপে প্রকাশ পেয়েছেন পরস্পর সুবলিত অর্থাৎ সুযুক্ত হয়ে। এমন করে যুক্ত

হয়েছেন যে তাঁদের আর চিনবার উপায় নেই যে কোনটি রাধা আর কোনটি কৃষ্ণ। যেন প্রেম উষ্মাতে গলে গেছে দুটি খণ্ড গালা তার উপর আবার হিঙ্গুল সংযোগে ভিতর বাহির রঙ্ হয়ে গেছে। এই স্বরূপই গৌরমূর্ত্তি। মহাভাব হিঙ্গুল। কৃষ্ণপ্রেমিকের হৃদয়ই হল হর্ম্য অর্থাৎ প্রাসাদ—এই প্রেমিক হৃদয়েই গৌররূপের খেলা চলে।

নাচে শচীনন্দন
দেখে রূপ সনাতন

শচীনন্দন নাচছেন—বৈরাগী রূপসনাতন তার কি দেখছেন? তাঁরা দেখছেন—মহাভাবের কত বল নাগরী করে।

নিকুঞ্জ মন্দিরে ব্রজের রাজ পরম প্রেমিকার সঙ্গে পরম প্রেমবানের যে খেলা হয়েছে বিশখা সখী (রামানন্দের) তো তার আস্বাদন আছে। সেখানে রাইকানু জড়াজড়ি অবস্থায় শ্যামসুন্দরের শ্যামকান্তি মহাভাবময়ী রাধার ভাবকান্তির ছটায় ঢাকা পড়ে গেছে—গবাক্ষপথে কৌতুক ভরে সখীরা তা লক্ষ্য করে একজন অন্যকে ডেকে বলছেন—রাই অঙ্গের ছটা লেগে শ্যাম হল গোরা। তোরা দেখে যা লো সজনি—

নিকুঞ্জেতে একি রঙ্গ
আবার হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ বলে দু'নয়নে ধারা।

রামানন্দের নিজের তো এ আস্বাদন আছে—তবে তিনি আজ এই গৌররূপ দর্শন করে এত বিস্মত হলেন কেন? গৌরস্বরূপ রাধাকৃষ্ণ মিলিত মূর্ত্তি। কিন্তু এ স্বরূপে পরিপাটির কিছু আধিক্য আছে। এ হল বিবর্ত্তবিলাস মূর্ত্তি। পরমারাধ্য শ্রীগুরুমহারাজ শ্রীল রামদাস বাবাজী মহারাজ আস্বাদন করেছেন—

রাই কানু একাকৃতি
কিন্তু বিপরীতভাবে অবস্থিতি
যুগল উজ্জ্বল রস নির্য্যাস মূরতি
রাই কানু কানু রাই
নাগরী নাগর নাগর নাগরী
কিশোরী কিশোর কিশোর কিশোরী
রমনী রমণ রমণ রমণী

(গোদাবরী তীরে) যা দেখে রাম রায় মূরছিত।

ব্রজে রাধাকৃষ্ণের মিলন দিনের মধ্যে কয়েকবারই হয়—তাই তাদের বিরহ খুব তীব্র নয় আবার তীব্রও। কারণ বলা আছে—

মিলনে দুই রসের খেলা
মিলনে মিলা অমিলা দুই রসের খেলা
নিত্য মিলনে নিত্য বিরহ
আমার মধুর গৌরাঙ্গ দেহ

শ্রীকৃষ্ণ অদর্শনে বিরহে গোপীরা পলকে প্রলয় গনে। একক্ষণ কৃষ্ণ অদর্শন তারা যুগসম মনে করেন। দ্বারকা মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র রাধারাণীর বিরহ ভোগ করেছেন। রুক্মিণী দেবী কৃষ্ণকে নব অনুরাগে আলিঙ্গন করে সর্ব্বাঙ্গে পূলকিত হয়েছেন। উদগত পুলক দেখে মনে হচ্ছে যেন প্রথম অনুরাগের ছটা। এ তো খুব স্বাভাবিক। কৃষ্ণ আলিঙ্গন তো কখনও পুরান হয় না। এ অবস্থায় কৃষ্ণচন্দ্র মূর্চ্ছা গেছেন। মনে হতে পারে রুক্মিণীর প্রতি প্রেমবশতঃই বোধ হয় এই মূর্চ্ছা। তা কিন্তু নয় ব্রজভূমিতে নীলিমচ্ছটাবিচ্ছুরিত শ্রীযমুনা তীরে বাণীর কুঞ্জে শ্রীরাধিকার সঙ্গে যে মিলন লীলা করেছিলেন তারই স্মরণে এই মূর্চ্ছা। শ্রীগোস্বামিপাদ প্রার্থনা করছেন—ভগবানের এই আনন্দ মূর্চ্ছা আমাদের রক্ষা করুন।

এদিকে ব্রজে রাধারাণীর মোহনদশা। কৃষ্ণচন্দ্রকে রাধারাণী ধ্যান করছেন। এ ধ্যান বড় ঘন। এখানে ধ্যান ও বস্তু অভিন্ন। দেবর্ষিপাদ নারদ মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে বলেছেন—রাজন্, শ্রীকৃষ্ণ ধ্যানে প্রাকৃতদেহ অপ্রাকৃত হয়ে যায়। কাঁচপোকাকে ভাবতে ভাবতে তেলাপোকা কাঁচপোকা হয়ে যায়। বস্তুর তন্ময়তায় সেই বস্তু লাভ হয়। কিন্তু বস্তু যদি অসত্য হয় তাহলে প্রাপ্তি হয় না। আর বস্তু যদি সত্য হয় তাহলে তার থেকেই প্রাপ্তি হয়। কৃষ্ণ ভাবতে ভাবতে ভাবনাকারী কৃষ্ণময় হয়ে যায়।

গৌর স্বরূপের রহস্য হল বিবর্ত্ত রাধা আর বিবর্ত্ত গোবিন্দের মিলিত মূর্ত্তি। গৌরের বহু নামের মধ্যে গৌররসাস্বাদী যারা তাদের 'গোরা' নাম বড় প্রিয়, বড় আস্বাদনের। তাঁরা বলেন—

যার যা লেগেছে ভাল তারে ভজুক তারা গো।
আমার চোখে লেগেছে ভাল শচীর নন্দন গোরা গো॥

এই 'গোরা' নামটির এক অপূর্ব্ব রহস্য আছে। রাধাকৃষ্ণ পরস্পর

পরস্পরের কাছে থেকেও বিরহভোগ করছেন। রাধারাণী কৃষ্ণ ধ্যানে মগ্ন, আবার কৃষ্ণচন্দ্র রাধারাণীর ধ্যানে মগ্ন। রাধারাণী গোবিন্দ ধ্যান করতে করতে গোবিন্দ হয়ে গেছেন—আবার গোবিন্দ রাধারাণীর ধ্যান করতে করতে রাধা হয়ে গেছেন। গোবিন্দ ভাবতে ভাবতে রাধারাণী যে গোবিন্দ হয়েছেন ইনি হলেন বিবর্ত্ত গোবিন্দ আর গোবিন্দ যে রাধারাণীকে ভাবতে ভাবতে রাধা হয়ে গেছেন—ইনি হলেন বিবর্ত্ত রাধা। 'গোরা' নামে বিবর্ত্ত গোবিন্দের 'গো' আর বিবর্ত্ত রাধার 'রা' এই দুই এ মিলে নাম গোরা। কারণ নাম গ্রহণের রীতি হল আগে আশ্রয়তত্ত্বের নাম উচ্চারণ করে পরে বিষয়তত্ত্বের নাম করতে হয়। এখানে গোবিন্দের যে 'গো' তিনি হলেন বিবর্ত্ত গোবিন্দ অর্থাৎ আসলে রাধারাণী আর রাধার যে রা তিনি হলেন বিবর্ত্ত রাধা অর্থাৎ আসলে গোবিন্দ। সুতরাং নাম গ্রহণের নিয়ম ঠিক বজায় রইল। গৌর হলেন বিবর্ত্ত বিলাস মূর্ত্তি। এই বিবর্ত্ত-স্বরূপে আবার ভোগের চেষ্টা উঠেছে। রাধারাণী নিজেকে কৃষ্ণ ভাবছেন আর কৃষ্ণ নিজেকে রাধারাণী ভাবছেন—তাঁদের যে বিলাস চেষ্টা এর গতি রামানন্দ রায়ের কাছে অজ্ঞাত ছিল। বিবর্ত্ত রাধা আর বিবর্ত্ত গোবিন্দ আজ একীভূত হয়ে মাদনাখ্য মহাভাবে পরিণতি লাভ করেছে। এই স্বরূপেই যুগল লীলার চরম সীমা। এই রসরাজ মহাভাব দুই রূপের একীভূত অবস্থা শ্রীগৌরসুন্দর রামানন্দ রায়কে দর্শন করালেন।

এর মধ্যে আরও কথা আছে। রামানন্দ দেখেছেন গৌরের সন্ন্যাস মূর্ত্তি। নিত্যানন্দতত্ত্ব বা বলদেবতত্ত্ব হলেন সেবাবিগ্রহ। বসন, ভূষণ ভোজ্য, পেয়, ছত্র চামর, পাদুকা, আসন সবই নিত্যানন্দ স্বরূপ। ভগবানের সন্ধিনী শক্তির প্রকাশ হলেন ধাম। এই সন্ধিনী শক্তির প্রভু হলেন শ্রীবলদেব। রাধাকৃষ্ণ যুগল নিত্য রসভোগে লোলুপ হয়ে রসমদিরায় ডুবে আছেন। মিলনের এতই গাঢ়তা যে মিলনকালেও তাঁরা বিরহ ভোগ করেন। শ্যামকণ্ঠ আলিঙ্গন করা অবস্থায় রাধারাণী 'হা কৃষ্ণ' বলে কাঁদছেন। এ প্রেম বড় বিচিত্র। এর নামই প্রেমবৈতিত্ত্য দশা। এর তুলনা প্রকৃত জগতে মেলে না। কিন্তু যুগলের নিরন্তর এই রসভোগে বাদী জটিলা কুটিলার ভয় আছে। মিলনে বিরহ ভোগ হল রসের চরমসীমা। গৌরস্বরূপ তাই মূরতিমন্ত প্রেমবৈচিত্ত্য।

মধুর গৌরাঙ্গ দেহ

মূরতিমন্ত প্রেমবৈচিত্ত্য
নিত্যমিলনে নিত্য বিরহ।

বাদীর ভয় নিবারণের জন্য সেবকতত্ত্ব শ্রীনিত্যানন্দ সন্ন্যাসবেশে গৌরস্বরূপে আবরণ দিলেন। বেশ ত সেবাবিগ্রহ শ্রীনিতাইচাঁদ। তাই গৌরের সন্ন্যাসরূপে রামানন্দ রায় নিতাই জড়িত যুগলমূর্ত্তি রসভোগে লুব্ধ এই স্বরূপই প্রত্যক্ষ করলেন। এ তো গৌরের সন্ন্যাস নয়, এ সন্ন্যাসের সাজ মাত্র। ভিতরে ভিতরে চরম রস আস্বাদন—আর বাইরে বাদীর ভয়ে সন্ন্যাসবেশ রূপে নিতাইচাঁদের আবরণ—এ বড় বিচিত্র স্বরূপ। এ স্বরূপ রামানন্দ কখনও প্রত্যক্ষ করেন নি। তাই গোদাবরী তীরে সন্ন্যাসমূর্ত্তি গৌরস্বরূপকে প্রত্যক্ষ করে রাম রায় মূর্চ্ছিত হলেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার রায় রামানন্দ সংবাদে এ লীলা প্রকট করেছেন—

তবে হাসি প্রভু তাঁরে দেখাইলা স্বরূপ।
রসরাজ মহাভাব দুই এক রূপ॥
দেখি রামানন্দ হৈলা আনন্দে মূর্চ্ছিতে।
ধরিতে না পারে দেহ পড়িলা ভূমিতে॥

শ্রীগৌরসুন্দরের সন্ন্যাস মূর্ত্তি দর্শনে রামানন্দ রায় আনন্দে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে গৌরসুন্দর তো স্বয়ং ভগবান—ভগবৎ স্বরূপের সন্ন্যাস কেমন করে সম্ভব হয়? সন্ন্যাস বলতে তো সম্যক্ ন্যাস অর্থাৎ ত্যাগ বুঝায়। জীবের পক্ষে ত্যাজ্য বস্তু আছে। সেই ত্যাজ্য বস্তু ত্যাগ করে মানুষ সন্ন্যাস গ্রহণ করে। কিন্তু ভগবৎ স্বরূপের তো কোনও কিছু ত্যাজ্য থাকতে পারেন না। স্বরূপ তো তাঁর সৎ চিৎ আনন্দ—এই তিন বস্তু ছাড়া অন্য কোন বস্তু অর্থাৎ অসৎ, অচিৎ এবং নিরানন্দের সঙ্গে তো তাঁদের কখনও সম্বন্ধই হয় না। স্বরূপের থেকে যা অতিরিক্ত সেইটিই তো ত্যাজ্য। ভগবানের ধাম, নাম, গুণ, লীলা, পরিকর কোনটিই স্বরূপ হতে ভিন্ন নয়—তাই কোনটিই ত্যাজ্য হতে পারে না। সন্ন্যাসী হওয়া, ত্যাগী হওয়া, তাই ভগবানের স্বরূপে সম্ভব হয় না। এখন সন্ন্যাস গ্রহণ করলে বৈরাগ্যই বা কিভাবে আসবে? আর বৈরাগ্যকে গ্রহণ না করলে তাঁর ভগবত্তাই বা সম্পূর্ণ হয় কি করে? কারর ভগবান শব্দের অর্থই হচ্ছে যার 'ভগ' অর্থাৎ যড়বিধ ঐশ্বর্য্য আছে। সমগ্র ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, সমগ্র যশঃ, সমগ্র শ্রী, সমগ্র জ্ঞান, সমগ্র বৈরাগ্য যাঁর আছে তিনিই

ভগবান। ভগবানের প্রতিটি স্বরূপই সমগ্র—অর্থাৎ যার সমান কোথাও নেই—যার থেকে বেশী তো সুতরাং কোথাও নেই। সমগ্র বৈরাগ্যকে ভগবান সর্ব্বদা ধারণ করে থাকেন—কারণ তা না হলে ভগবানের ভগবত্তা সম্পূর্ণ হয় না। ভগবানের মধ্যে তাহলে কি কপিল, নরনারায়ণ এঁরাই শুধু বৈরাগ্যবান? নরনারায়ণ ঋষির কাছে দেবর্ষি পাদ নারদ বৈরাগ্য শিক্ষা করেন। ভগবানের প্রতিটি স্বরূপই এমন বৈরাগ্যকে ধারণ করেন যার সমান বৈরাগ্য অন্য কেউ ধারণ করতে পারে না। ভগবানের প্রতিকূল যা কিছু সেইটিই ত্যাজ্য। স্বরূপ থেকে ভিন্ন বস্তুকে ত্যাগ করে স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার নামই সন্ন্যাস। ভগবান তো স্বরূপ ভিন্ন অন্য কোন বস্তু গ্রহণ করেন না। তাই শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রের প্রথমেই বলা আছে—

ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি। ভাঃ ১।১।১

ভগবান তাঁর নিজ তেজঃপ্রভাবে কুহক অর্থাৎ মায়িক উপাধিকে সর্ব্বদা বহু দূরে সরিয়ে রাখেন। সেই সত্য স্বরূপ ভগবানের আমি ধ্যান করি।

এখন কথা হচ্ছে শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ তো শুধু ভগবৎ স্বরূপ নয়, ভগবান হয়েও ভক্তির আস্বাদনের স্বরূপ হলেন শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর। রাধাগোবিন্দের শৃঙ্গার রসভোগের চরম পরম স্বরূপ শ্রীগৌরসুন্দর। পরস্পর পরস্পরের রসভোগে ভরপূর। গৌর পরিকর শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর রাধাগোবিন্দের বিলাস মূর্ত্তি। নরহরিকে যখন মহাপ্রভু কোলে নিয়েছেন তখন ১০৮ শ্রীল রামদাস বাবাজী মহারাজ শ্রীগুরু মহারাজ আঁখরসুধা বর্ষণ করেছেন—

বিলাসী কোলে বিলাস খেলে।

ব্রজের মধুমতী নরহরি মধু দান করে জগৎকে মাতিয়েছেন। গৌরপদ তরঙ্গিনীতে নরহরি সরকার ঠাকুর বলেছেন—'সখি' বলে সম্বোধন করে গৌররূপ বর্ণনা করছেন—এ গৌর হলেন ব্রজের কালিয়া কপট। পীতবাস কৃষ্ণচন্দ্র তবে তাঁর অরুণ বসন কেন? কৃষ্ণের কালবরণ কোথায় গেল? গৌরবরণ কেমন করে হল? অঙ্গের পুলক উদগম কোথা থেকে এল? কাজেই লম্পট গুরু কৃষ্ণচন্দ্র ব্রজের কালিয়া কপট চোরজারশিখামণি আজ সন্ন্যাসী সেজেছেন—

গোপীনাং কুচকুঙ্কুমেন নিচিতং বাসঃ কিমস্যারুণং
নিন্দৎকাঞ্চনকান্তিরাসরসিকাশ্লেষণ গৌরং বপুঃ।
তাসাং গাঢ়করাভিবন্ধনবশাৎ রোমোদগমো দৃশ্যত
আশ্চর্য্যং সখি পশ্য লম্পটগুরোঃ সন্ন্যাসিবেশঃ ক্ষিতৌ॥

সরকার ঠাকুর অন্য কোন গৌরপরিকরকে 'সখি' বলে সম্বোধন করছেন। এর তাৎপর্য্য কি? কারণ শাস্ত্র সিদ্ধান্ত হল এরাই তারা তারাই এরা। রাধাগোবিন্দ পরিকর ব্রজের গোপী হলেন স্বরূপ গোপী আর গৌরপরিকর হলেন ভাব গোপী। তাই এখানে 'সখি' সম্বোধন সার্থক হয়েছে।

গোপীদের বক্ষে কুঙ্কুমে রাঙ্গা রঙ্গে রঞ্জিত করে লম্পট শিরোমণির পীতবসন আজ অরুণ হয়েছে। যে রাধিকার উজ্জ্বল কনককান্তি সোনার বরণকেও নিন্দা করে (যার প্রতি অঙ্গে শত শত হিরণ্যগর্ভ খেলা করে) তার গাঢ় আলিঙ্গনে কৃষ্ণচন্দ্র আজ গৌরবরণ ধারণ করেছেন। আর অঙ্গে যে পুলক দেখা যাচ্ছে তা সাত্ত্বিকভাবের পুলক নয়—এ হল গোপীদের গাঢ় করবন্ধনে রসিকশেখরের অঙ্গে পুলকচ্ছটা। কাজেই সখি, দেখ, দেখ, চৌরজার শিখামণি চোরের রাজা লম্পটের গুরু যে আজ সন্ন্যাসবেশ ধারণ করেছেন এ বড় বিচিত্র।

নিরন্তর যিনি তত্ত্ববস্তুকে স্পর্শ করেন তিনিই সাধু। ভগবান গৌরসুন্দর আর নূতন করে কি সাধু সাজবেন? তিনি তো তত্ত্ববস্তুকে সর্ব্বদা স্পর্শ করেই আছেন। সূর্য্য যেমন অন্ধকারকে দেখতে পায় না—তেমনি ভগবৎস্বরূপের সঙ্গে অতৎবস্তুর দেখা হয় না। ভাবনিধি গৌরাঙ্গ আমার অভাবের সঙ্গ করে না।

ওমা ওর কি গরজ বালাই
ভাবের অভাব দেখতে পারে না
স্বভাব জাগায়ে করে সঙ্গ।

তাই ভগবৎ স্বরূপমাত্রই সন্ন্যাসী। নূতন করে তাদের আর সন্ন্যাস গ্রহণ করতে হয় না। তবে গৌর আজ সন্ন্যাসী হলেন কেন? নিরন্তর রাধাগোবিন্দ বিলাসভোগী গৌরের কি সন্ন্যাসী হওয়া সাজে? তবু তাঁকে সন্ন্যাসী হতে হল। এ তাঁর সন্ন্যাসী হওয়া নয়, সন্ন্যাসী সাজ মাত্র। ভিতরে ভিতরে তাঁদের রস আস্বাদন পরিপূর্ণরূপে চলতে লাগল—কিন্তু বাইরে সন্ন্যাসবেশের আবরণ পড়ল। এইটিই গৌরস্বরূপের রহস্য। তাঁর সন্ন্যাসী

বেশ ধারণের কয়েকটি কারণ আছে।

জগৎবাসীকে ভজন শিক্ষাদান—কারণ নিজে আচরণ না করলে শুধু প্রচার করলে মানুষ নেবে না। তাই মহাপ্রভু দেখলেন নিজে সন্ন্যাসী সাজতে হবে। নিজে সন্ন্যাস গ্রহণ করে জগতে প্রচার করলে তবে লোকে নেবে। কারণ—

আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায়
আপনি না করিলে ধর্ম শিখান না যায়।

শ্রীমন্মহাপ্রভু একবার শ্রীল অদ্বৈত আচার্য্য প্রভুকে বলেছিলেন—'আচার্য্য, বিনা সর্ব্বত্যাগং ন ভবতি ভজনং হ্যসুপতেঃ।' সর্ব্বস্য ত্যাগ না করলে অসুপতি প্রাণবল্লভের ভজন হতে পারে না। পরমরসভোগী শ্রীগৌরসুন্দর তাই আজ সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী সাজলেন। কেমন করে সব ছেড়ে ভগবদ্ভজন করতে হয় তাই সকলকে শেখাবার জন্য।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের বীজ শ্রীধাম নবদ্বীপে প্রথম উপ্ত হয়। পাষণ্ডীর কৃষ্ণ নাম সহ্য হয় না। মহাপ্রভুর সন্ন্যাস বেশ জগৎ উদ্ধার করবে। শ্রীল সরস্বতীপাদ গৌরসুন্দরের সন্ন্যাসরূপে ধবলপাটের জোড় বর্ণনা করেছেন। তাহলে বুঝা যাচ্ছে গৌরের সন্ন্যাস শুধু সাজ মাত্র—এটি শুধু বাইরের আবরণ—ভিতরে ভিতরে তিনি পরমভোগী। গৌরের সন্ন্যাসরূপকে সাধু বুদ্ধিতে পাষণ্ডী প্রণাম করে উদ্ধার পাবে। ব্রজলীলায় রাধারাণী কৃষ্ণনাম করতে পারেন না আবার কৃষ্ণচন্দ্রও রাধারাণীর নাম করতে পারেন না। কারণ করলেই বাদী লক্ষ্য করবে। তাই এখন সন্ন্যাস আবরণ নিলেন।

স্বপ্নবিলাসে রাধারাণী স্বপ্নে যে গৌরবরণের যুবাপুরুষকে দর্শন করলেন সে অন্য কেউ নয়—রাধাকৃষ্ণ মিলিত যুগল মূরতি। গৌরসুন্দর যখন ভূলুণ্ঠিত হচ্ছেন—তাই দেখে রাধারাণীর প্রাণে ব্যথা লেগেছে। ভাবলেন বঁধুর গায়ে লাগতে দেব না—আমি আবরণ দেব। গৌর সন্ন্যাসের সহজ মাধুরী রাধারাণী শ্যামবঁধূকে ধরে আছেন। এইভাবে রাইকানু পরস্পর মিলিত হয়ে রসভোগে মত্ত হলেন। মিলিত যুগল গৌররূপে প্রকট হয়ে বিহারকালে ভাবাবেশে মূর্চ্ছিত হয়ে ভূমিতে লুণ্ঠিত হন। সেবিকা অনঙ্গমঞ্জরী রাধারাণীর অঙ্গে আঘাত সহ্য করতে পারলেন না। তাই মিলিত যুগল অঙ্গে সেবাবিগ্রহ অনঙ্গমঞ্জরী শ্রীনিত্যানন্দ বলদেব

সন্ন্যাস বেশরূপ আবরণ দিলেন।

গৌরের সন্ন্যাসী রূপের আরও রহস্য আছে—শ্রীমতীর বাসনা ছিল—

কালার লাগিয়া হাম হব বনবাসী।
কালা নিল জাতিকুল প্রাণ নিল বাঁশী॥
কানু অনুরাগে রাঙ্গা বসন পরিয়া।
দেশে দেশে ভরমিব যোগিনী হইয়া॥

এখানে বনবাসীর অর্থ সন্ন্যাসী। তাই গৌরের কপট সন্ন্যাস রাধারাণীরই মনোবাসনা পূরণ করল।

সন্ন্যাসী গৌরকে সাজাতে না পেরে নিত্যানন্দ নিজ তনুকে নয় প্রকার ধাতুর অলঙ্কারে সুসজ্জিত করেছেন যা দেখে মহাপ্রভু বললেন—এ হল নববিধা ভক্তির প্রতীক। অভিন্ন চৈতন্যতনু ঠাকুর অবধূত। তাই নিতাই গৌর দুজনেই মিলিত যুগল। গৌর যেমন রসরাজ মহাভাব মিলিত স্বরূপ নিতাইও তেমনি রসরাজ মহাভাব মিলিত স্বরূপ। এই নিতাই মিলিত গৌরমূর্ত্তি হলেন সন্ন্যাসী গৌর। এখন কথা হচ্ছে, নিতাই গৌর দুইই যদি রসরাজ মহাভাব মিলিত স্বরূপ হন তাহলে কে কার সেবা করবে? নিতাই হল আশ্রয়তত্ত্ব তাই সেবক আর গৌর হলেন বিষয়তত্ত্ব আর তিনি সেব্য। আশ্রয়তত্ত্ব হবেন দাতা আর বিষয়তত্ত্ব হবেন ভোক্তা। ভোক্তা হবেন সর্ব্বদা সেব্য আর দাতা হবেন সর্ব্বদা সেবক। সন্ন্যাস মূর্ত্তি শ্রীগৌরস্বরূপে নিতাই মিলিত। তাই তার অভূতপূর্ব্ব মাধুর্য্য এই সন্ন্যাসমূর্ত্তির বর্ণনা আছে—

কেনা না দেখে দুখ।
তথাপি মাধুর্য্য দেখে বড় সুখ।

সন্ন্যাস বেশে তাই গৌরের অধিক মাধুর্য্য।

রামানন্দের এমনই দৃঢ় ভক্তি যে মহাপ্রভু আর নিজেকে লুকাতে পারলেন না—শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ বললেন—প্রভু হেসে তাঁর নিজের স্বরূপ রামানন্দকে দেখালেন। এখানে গৌরসুন্দরের হাসি অর্থাৎ গুরুতত্ত্বের হাস্য যা থেকে জ্যোতির্ময় বেদমন্ত্রের প্রকাশ। এই হাসি হতেই রামানন্দের হৃদয়ে প্রেমভক্তির সঞ্চার আর এই সঞ্চায়ের ফলেই দর্শন যোগ্যতা। মহাপ্রভু যে স্বরূপ দর্শন করালেন—এ স্বরূপ হল কৃষ্ণ রূপ

কিন্তু রাধার ভাবকান্তিতে গৌর রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ। রসরাজ গোবিন্দ আর মহাভাব রাধা দুইরূপ একযোগ হয়ে গৌরাঙ্গরূপী কৃষ্ণ। পদকর্ত্তা আস্বাদন করেছেন—

"দেখ দেখ গৌর প্রেমরস ধাম।
পদনখে জিতল, কতহুঁ শশিকুল লাখে লাখে মদযুত কাম।
চকিত বিলোকনে, সব দিশ হেরই ঝাঁপই চম্পক অঙ্গ
আপাদমস্তক, পুলকহি পূরিত, নিরুপমভাব তরঙ্গ॥
ক্ষণে মৃদু হাসি, কহই সো পিরীতি যৈছন হেমদশবাণ।
শ্যাম নাগর মোর, প্রাণ মনোহর কহইতে ঝরয়ে নয়ান॥
ভাবহি বিবশ, কহই বরজ রস, অভিনয় তৈছে পরকাশ।
পরমানন্দ সার, মহাভাব অবতার ভন রাধামোহন দাস॥"

সন্ন্যাসী গৌরে রাধাকৃষ্ণ দেখতে পেয়ে রাধার ভাবকান্তিতে গৌরাঙ্গীভূত কৃষ্ণ দেখে রামানন্দ আনন্দে মূর্চ্ছিত হলেন। কৃষ্ণসখা অর্জ্জুনও একদিন বিশ্বরূপ দর্শন করে ধৈর্য্যহারা হয়ে বলেছিলেন—

"ধৃতিং ন বিন্দামি শমং চ বিষ্ণো।"
দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম। গীঃ ১১।২৪-২৫

অর্জ্জুনের ধৈর্য্যনাশ ভয়ে আর রামানন্দের মূর্চ্ছা পরম আনন্দে। সুতরাং দুই এর মধ্যে অনেক পার্থক্য। রামানন্দ মূর্চ্ছিত হয়ে ভূতলে পড়লেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁর অমৃতময় স্পর্শ দিয়ে রামানন্দকে সঞ্জীবিত করলেন। রামানন্দ প্রভুর সন্ন্যাস বেশ দেখে বিস্মিত হলেন। মহাপ্রভু তাঁকে কৃপালিঙ্গন দিয়ে শক্তিসঞ্চার করে বললেন—রামানন্দ, তুমি যা দেখেছ তা প্রকৃত সত্য। তোমার মত প্রেমিক ভক্ত না হলে এই রাধার ভাবকান্ত্যে গৌরাঙ্গীভূত কৃষ্ণরূপ কেউ দেখতে পায় না।

প্রভু তাঁরে হস্ত স্পর্শি করাইলা চেতন।
সন্ন্যাসীর বেশ দেখি বিস্মিত হৈল মন॥
আলিঙ্গন করি প্রভু কৈল আশ্বাসন।
তোমা বিনা এই রূপ না দেখে অন্যজন॥
মোর তত্ত্বলীলা রস তোমার গোচরে।
অতএব এইরূপ দেখাইলু তোমারে।॥
কৃষ্ণ বশ হেতু এক প্রেমভক্তি রস।

প্রেম হৈতে হয় কৃষ্ণ নিজ ভক্ত বশ॥
প্রেম হৈতে পাই কৃষ্ণসেবা সুখ রস।
ভক্ত্যে কৃষ্ণ বশ হয় ভক্ত্যে তাঁরে ভজি।।

রাধারাণীর প্রেম আস্বাদনে রাধার ভাবকান্তি নিয়ে গৌরীভূত এ একমাত্র তুমিই বুঝেছ। তাই তোমাকে এই রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ দর্শন করিয়েছি। এরপরে শ্রীমন্মহাপ্রভু বললেন—

গৌর অঙ্গ নহে মোর—রাধাঙ্গ স্পর্শন।
গোপেন্দ্রসুত বিনা তেঁহো না স্পর্শে অন্যজন॥
তাঁর ভাবে ভাবিত করি আত্মমন।
তবে নিজ মাধুর্য্য করি আস্বাদন॥
তোমার ঠাঞি আমার কিছু গুপ্ত নাহি কর্ম।
লুকাইলে প্রেম বলে জান সর্ব্বমর্ম॥

গৌর দেহ নহে মোর অর্থাৎ স্বরূপে আমি কৃষ্ণ, সুখময় শ্যাম। রাধার কালিয়া বঁধু। এই যে আমার গৌরকান্তি তা রাধার ভাব, রাধার বর্ণ গ্রহণ করে। একমাত্র ব্রজের কৃষ্ণ ছাড়া রাধারাণী আর অন্য কৃষ্ণকে স্পর্শ করেন না। এমন কি মথুরার কৃষ্ণকেও নয়, দ্বারকার কৃষ্ণকেও নয়। বৈকুণ্ঠের নারায়ণের আর কথা কি? রাধারাণী হলেন আদ্যাশক্তি, আর কৃষ্ণ হলে অদ্বয় পরতত্ত্ব, কৃষ্ণই রাধার একমাত্র স্পৃশ্য। রাধারাণীও এই ব্রজেন্দ্রনন্দনেরই একমাত্র ভোগ্যা। রাধারাণী ব্রজের কৃষ্ণ ভিন্ন আর কাউকে স্পর্শ করেন না। রাধা গৌরাঙ্গকে স্পর্শ করে তদঙ্গীভূত হয়ে আছেন, সুতরাং গৌরাঙ্গ হলেন ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ।

পদকর্ত্তা শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপের আস্বাদনটি বলছেন—

গদগদ কৃষ্ণ কাঁহা মঝু প্রাণনাথ
ব্রজজন নয়ন আনন্দ
কাঁহা মঝু জীবন ধারণ মহৌষধি
কাঁহা মঝু সুধারস কন্দ॥
ইহ বড় হৃদয়ক তাপ গোকুল নায়ক গোপিকা ভাবহি
কত শত করত বিলাপ॥
ঘন ঘন শ্বাস ভারত মহী শিখত
বিবরণ ভেল অরু ক্ষীণ

বাম করতল অব লম্বন মুখ বিধু
লোচন নীর ধরু চিম্॥
স্থাবর জঙ্গম যাহা আগে দেখই
বরজ সুধাকর কাঁহা তাহে পুছই
ক্ষণে গড়াগড়ি কান্দে ক্ষণি উঠি ধায়
রধামোহন কাহে মরিয়া না যায়॥

রাধারাণীর ভাবকান্তি গ্রহণ করে রাধারাণীর প্রেম অর্থাৎ আশ্রয়জাতীয় প্রেম আস্বাদন করি। শ্রীমন্মহাপ্রভু বললেন—রামানন্দ, তোমার কাছে আমি কিছু লুকাতে পারি না। গোপন করতে গেলেও তুমি প্রেমের বলে সব জানতে পার। কারণ শ্রীল রামানন্দ রায় যে ব্রজের বিশাখা সখী—তাই তিনি তো রাধাকৃষ্ণের সকল লীলাই জানেন। কিন্তু রামানন্দ, একথা তোমার অন্তরেই গোপন রেখো। কারও কাছে যেন প্রকাশ কর না।

গুপ্তে রাখি কাঁহা না করিহ প্রকাশ।
আমার বাতুল চেষ্টা লোকে উপহাস॥
আমি এক বাতুল, তুমি দ্বিতীয় বাতুল।
অতএব তোমায় আমায় হই সমতুল॥

এ হল চিন্ময় রাজ্যের চিন্ময়ী লীলা। কৃষ্ণপক্ষে রাধারাণীর ভাবকান্তি নিয়ে রাধারাণীর প্রেমের আস্বাদন এটি লৌকিক জীবের বুদ্ধিগোচর হতে পারে না। তারা বোঝে না তাই উপহাস করে। রসময় রসিক চূড়ামণি আজ রসিকা হয়ে রসের আস্বাদন করছেন চিন্ময় ক্ষেত্রে কিন্তু এটি মহীয়ান ব্যাপার। মহাপ্রভু বলছেন—রামানন্দ, আমি তো এই আস্বাদনে বাতুল হয়ে গিয়েছি। আবার তুমি চিন্ময় তত্ত্বের রসজ্ঞ হয়ে আর এক বাতুল হয়েছে। তাই তোমায় আমায় সমতুল। অর্থাৎ লৌকিক রাজ্যের দুজনেই সমান উপহাসের পাত্র।

এইরূপ দশরাত্রি রামানন্দ সঙ্গে।
সুখে গোঙাইলাপ্রভু কৃষ্ণ কথা রঙ্গে॥

রাধারাণীর যেমন বিশাখা সখী সঙ্গে কৃষ্ণকথার আলোচনায় সুখ সেইরকম সুখ করলেন আজ মহাপ্রভু বিরহিণী রাধা বিশাখাসখী রামানন্দ সঙ্গে।

নিত্যলীলার রাধারাণী বিশাখাজীকে বলেন—

কালিয়া রূপ মরমে লাগিয়া ধৈরয না হয় মনে।
বিরলে বসিয়া সখীরে কহই দেখাইলে রহে প্রাণে॥
এ বোল শুনিয়া বিশাখা ধাইয়া শ্যাম কলেবর দেখি।
রাইয়ের গোচরে দেখাবার তরে পটের উপরে লেখি॥
আনি চিত্রপট রাইএর নিকট সম্মুখে রহিলা সখী।
সে রূপ দেখিয়া মূরছত হএগা পড়িলা কমলমুখী॥
মন্দাকিনী পারা শত শত ধারা ও দুটি নয়ানে বহে।
করহ চেতন, পাবে দরশন দাস উদ্ধবে কহে॥

শ্রীমন্মাহাপ্রভু যে বিরহিণী রাধা—তাই মুখে হা কৃষ্ণ বুলি।

আজু শচীনন্দন নব বিরহিনী জনু রহি রহি রোয় অনিবার।
কহে মঝু বল্লব কো হরি নেওল হিয়া গেহ করু আঁধিয়ার॥
আহা কানু যব ছোড়ি গেল কাহে এ পাষাণ হিয়া
ফাটি নাহি গেও তব
কাহে মঝু মরণ না ভেল।
যছুক গরবে হাম গরবিনী গোকুলে
সো যদি বিছুরল মোহে।
বিনু নবঘন জল আন নীরে কো ফল
চাতকিনী পীলব বারি কাহে॥
চাঁদ চাঁদিমা লাগি চকোরিনী আকুলি
রাহু যদি গরাসল চাঁদে।
চকোরিনী পিয়াস তব কাহে মিটব
কাছে সোই হিয়া থির বাঁধে॥
যদি প্রাণ প্রিয়া মোহে ছোড়ি গেয় মধুপুর
হাম কাহে জীয়ব জীয়ে।
কহ রাধামোহন পহুঁ সঞে তেজব
এ পরাণ কালকূট পিয়ে॥

কৃষ্ণ বিরহ দশায় কৃষ্ণ কথার আলাপেই চিত্তের শান্তি। ব্রজের নিগূঢ় রসলীলার বিচার প্রেমিক ভক্তই আস্বাদন করতে পারেন। অভক্ত জনে আস্বাদন করতে পারে না। এ প্রেমের পার পাওয়া যায় না।

রাধাকৃষ্ণ লীলা তাতে কর্পূর মিলন।

ভাগ্যবান যেই সেই করে আস্বাদন॥

প্রভু রামানন্দের শ্রীমুখে রাধাকৃষ্ণের লীলা এই রসালা বস্তু প্রাণভরে আস্বাদন করলেন। বক্তা শ্রোতা বিশাখা রাধা। এ তো বীণকারের বীণবাদ্য।

মধুর হতে মধুর অতি সুমধুর।
মধুর মধুর গৌরকিশোর মধুর মধুর নাট।
মধুর মধুর সব সহচর মধুর মধুর হাট॥
মধুর হেলন মধুর দোলন মধুর মধুর গতি।
মধুর মধুর বচন সন্দর মধুর মধুর ভাতি॥
মধুর অধরে জিনি শশধর মধুর মধুর হাস।
মধুর আরতি মধুর পিরীতি মধুর মধুর ভাষ॥
মধুর যুগল নয়ান রাতুল মধুর ইঙ্গিতে চায়।
মধুর প্রেমের মধুর বাদর বঞ্চিত শেখর রায়॥

যে ভাগ্যবান এই অমৃত একবার আস্বাদন করেন তার কর্ণের লোভ উত্তরোত্তর বাড়ে। তখন না শুনে আর থাকতে পারা যায় না। পদকর্ত্তা বললেন—

শুনইতে অনুক্ষণ যছু নব নব গুণ
শ্রবণ নয়ন ভৈ গেলা।
দরশনে তাকর এ হেন লোর ঝর
নয়ন শ্রবণ সম ভেলা॥
নব নব গুণগণ শ্রবণ রসায়ন
নয়ন রসায়ন অঙ্গ
রভস সম্ভাষণ হৃদয় রসায়ন
পরশ রসায়ন সঙ্গ॥
হাসিখানি তাহে ভায় অপাঙ্গ ইঙ্গিতে চায়
বিদগধ মোহন রায়।
মুরলীতে কিবা গায় শুনি আন নাহি ভায়
জাতি কুল শীল দিনু তায়॥

সর্ব্বতত্ত্ব, কৃষ্ণতত্ত্ব, রাধাতত্ত্ব, রসতত্ত্ব প্রেমতত্ত্ব, সখী মঞ্জরী আনুগত্যে রস বিলাস, প্রেমবিলাস—তত্ত্বলীলা দুই—এই হল রায় রামানন্দ সংবাদ। প্রভুর আস্বাদনে বিভোর অবস্থা নিজ অন্তরঙ্গ সনে। শ্রীল কবিরাজ

গোস্বামীচরণ বললেন—

নিগূঢ় ব্রজের রস লীলার বিচার।
অনেক কহিল তার না পাইল পার॥
তামা কাঁসা রূপা সোনা রত্ন চিন্তামণি।
কেহ যদি কাঁহা পোঁতা পায় একখানি॥
ক্রমে উঠাইতে সেই উত্তম বস্তু পায়।
ঐছে প্রশ্নোত্তর কৈল প্রভু রাম রায়॥

মাটির ভিতরে পোঁতা যেমন তামা ছেড়ে কাঁসা, কাঁসা বাদ দিয়ে রূপা, রূপা বাদ দিয়ে সোনা—সোনার শেষে চিন্তামণি রত্ন ক্রমশঃ পায়, তেমনি উত্তম হতে উত্তমতর রস তা হতে উত্তমতম রস—বর্ণাশ্রম ধর্ম, প্রেমভক্তি, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য মধুর রস রাধাপ্রেম—কৃষ্ণতত্ত্ব, রাধাতত্ত্ব, পরকীয় রস, কত কত রসবিলাস।

এইভাবে রস আস্বাদনে দশরাত্রি প্রভু রামানন্দ সঙ্গে কাটানোর পরে একদিন রামানন্দের কাছে বিদায় প্রার্থনা করলেন—

আর দিন রায় পাশে বিদায় মাগিলা।
বিদায়ের কালে তাঁর এই আজ্ঞা দিলা॥
বিষয় ছাড়িয়া তুমি যাহ নীলাচলে।
আমি তীর্থ করি তাঁহা আসিব অল্পকালে॥
দুইজনে নীলাচলে রহিব একসঙ্গে।
সুখে গোঙাইব কাল কৃষ্ণকথা রঙ্গে॥
এত বলি রামানন্দে করি আলিঙ্গন।
তাঁরে ঘরে পাঠাইলা করিল শয়ন॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদের দ্বাদশ বৎসর শ্রীধাম নীলাচলে গম্ভীরা মন্দিরে প্রভুর পাশে আছেন স্বরূপ দামোদরজী আর রায় রামানন্দ—ব্রজের বিরহিনী রাধারাণীর পাশে অন্তরঙ্গা সখী ব্রজের ললিতা বিশাখা।

শেষ লীলায় প্রভুর কৃষ্ণ বিরহ উন্মাদ।
ভ্রমময় চেষ্টা সদা প্রলাপময় বাদ॥
রাত্রে প্রলাপ করে স্বরূপের কণ্ঠ ধরি।
আবেশে আপন ভাব কহয়ে উঘারি॥
যবে যেই ভাব উঠে প্রভুর অন্তর।

সেই গীত শ্লোকে সুখ দেন দামোদর॥
বিদ্যাপতি জয়দেব চণ্ডীদাসের গীত।
আস্বাদয়ে রামানন্দ স্বরূপ সহিত॥
চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটক গীতি
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ
স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রিদিনে
গায় শুনে পরম আনন্দ॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু রামানন্দকে আলিঙ্গন করে অর্থাৎ আলিঙ্গনে শক্তি সঞ্চার করে ঘরে অর্থাৎ কাছারী বাড়ীতে পাঠিয়ে দিলেন এবং নিজে তাঁর বাসায় ফিরে এলেন। পরদিন প্রাতঃকালে উঠে শ্রীহনূমানজীর শ্রীবিগ্রহ দর্শন করলেন। শ্রীহনূমানজী রামাবতারের ভক্ত, দাস্যভক্তির পারাকাষ্ঠা। যিনি ভগবান রামচন্দ্রের শ্রীচরণে দাস্যভক্তি ছাড়া আর কিছু চান নি। মুক্তিসুখকেও তুচ্ছ বোধ করেছেন। বলেছেন—

ভববন্ধচ্ছিদে তস্যৈ স্পৃহয়ামি ন মুক্তয়ে।
ভবান্ প্রভুরহং দাস ইতি যত্র বিলুপ্যতে॥

ভববন্ধনকে ছেদন করে দিতে পারে যে মুক্তিসম্পদ তা চাওয়া তো দূরের কথা—চাইবার স্পৃহাও করি না—কারণ যে মুক্তি পেলে তুমি প্রভু—আমার সর্ব্বেশ্বর এবং আমি তোমার চরণ কমলে দাস—এই দাস প্রভু সম্বন্ধ লুপ্ত হয়ে যায়।

শ্রীহনূমানজীকে প্রণাম করে মহাপ্রভু বিদ্যানগর ত্যাগ করে দক্ষিণদিকে যাত্রা করলেন। বিদ্যানগরে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী সকলেই মহাপ্রভুর করুণায় ব্রজের ভজন গ্রহণ করলেন। প্রভুর দর্শনে যে অলৌকিক প্রভাব সেটি প্রাকৃত বুদ্ধির অগোচর।

তোমা দেখি কৃষ্ণপ্রেমে জগত পাগল।
স্ত্রী বাল বৃদ্ধ কিবা চণ্ডাল যবন।
যেই তোমার একবার পায় দরশন॥
কৃষ্ণ নাম লয়ে নাচে হইয়ে উন্মত্ত।
আচার্য্য হইল সেই তারিল জগত॥

প্রভু চলে গেলে রামানন্দ বিরহে বিহ্বল হলেন। রাধারাণীর বিরহে বিশাখা সখীর যেমন অবস্থা।

রামানন্দ হৈলা প্রভুর বিরহে বিহ্বল।
প্রভুর ধ্যানে রহে বিষয় ছাড়িয়া সকল॥

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বললেন—

সংক্ষেপে কহিলুঁ রামানন্দের মিলন।
বিস্তারি বর্ণিতে নারে সহস্রবদন॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা, রামানন্দের চরিত্র এবং রাধাকৃষ্ণের লীলার মধ্যে পরস্পরের সম্বন্ধ দেখাচ্ছেন—

সহজে চৈতন্য চরিত্র ঘনদুগ্ধপুর।
রামানন্দ চরিত্র তাহে খণ্ড প্রচুর॥
রাধাকৃষ্ণলীলা তাতে কর্পূর মিলন।
ভাগ্যবান্ যেই সেই করে আস্বাদন॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা ঘনদুগ্ধ—তাতে শর্করা সংযোগ হয়েছে—রামানন্দের চরিত্র—আবার রাধাকৃষ্ণের লীলা কর্পূর মিশ্রণে সেটি সুরভিত হয়েছে। ভাগ্যবান জন এই রস আস্বাদন করেন। এই ভাগ্য বলতে বুঝায় মহৎকৃপা, শ্রীগুরুকৃপা। কারণ বলা আছে—

আদ্যাপিও সেই লীলা করে গৌর রায়।
কোনও কোনও ভাগ্যবান দেখিবারে পায়।

এখানে ভাগ্যের লক্ষণ করা হয়েছে—

সেই ভাগ্যবান জনে দেখিছে—

শ্রীগুরুকৃপায় যার প্রেমনেত্রের বিকাশ হয়েছে সেই ভাগ্যবান জনে দেখিছে।

শ্রীগুরুকৃপাই তাই ভাগ্যের চরম সীমা। এই রস আস্বাদন কর্ণদ্বারেই হবে। তাই বললেন—

যে ইহা একবার পিয়ে কর্ণদ্বারে।
তাঁর কর্ণ লোভে ইহা ছাড়িতে না পারে॥

এই রামানন্দ মিলন প্রসঙ্গের ফলশ্রুতি দিচ্ছেন শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ—

রসতত্ত্ব জ্ঞান হয় ইহার শ্রবণে।
প্রেমভক্তি হয় রাধাকৃষ্ণের চরণে॥
চৈতন্যের গূঢ়তত্ত্ব জানি ইহা হৈতে।
বিশ্বাস করি শুন, তর্ক না করিহ চিতে॥

এই প্রসঙ্গ কানে শুনলে রসতত্ত্বের বোধ হবে—রাধাগোবিন্দের চরণে প্রেমভক্তি লাভ হবে। তর্ক না করে বিশ্বাস করে শুনলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর তত্ত্ব অনুভব হবে। কারণ বলা আছে—

বিশ্বাসে মিলয়ে বস্তু তর্কে বহুদূর।

শ্রুতিবাক্যও আছে—

নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া।
অলৌকিক লীলা এই পরম নিগূঢ়।
বিশ্বাসে পাইয়ে তর্কে হয় বহুদূর॥

নিতাই গৌর সীতানাথের চরণ যাঁরা হোতা যজ্ঞেশ্বর যজমান—তাঁদের হৃদয়ে ধারণ করতে পেরেছেন—তাঁদেরই এই প্রেম সম্পদ লাভ হয়।

রায় রামানন্দ মিলন প্রসঙ্গ সমাপ্তিকালে গ্রন্থকার শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদ রামানন্দকে বন্দনা করছেন—

রামানন্দ রায়ে মোর কোটি নমস্কার।
যাঁর মুখে কৈল প্রভু রসের বিস্তার॥

রামানন্দ রায়ের শ্রীমুখ দিয়ে মহাপ্রভু যে তাঁর নিজের ভক্তিসিদ্ধান্ত বর্ষণ করালেন—তাই রামানন্দের শ্রীচরণে কোটি কোটি প্রণাম। কারণ একজনকে উপলক্ষ্য না করলে তো কথার প্রকাশ হয় না। যেমন শ্রীগোবিন্দের গীতামৃত উপদেশ প্রিয়সখা অর্জ্জুনদেবকে উপলক্ষ্য করে—আবার পরমরসময়ী ভাগবতী কথামৃতের প্রকাশ মহারাজ পরীক্ষিৎকে উপলক্ষ্য করে—তাই একই পাণ্ডববংশের দুজন পিতামহ অর্জ্জুন আর পৌত্র মহারাজ পরীক্ষিৎ—তাদের কাছে কলিজীব আমরা সর্ব্বতোভাবে ঋণী—এক কথায় পাণ্ডববংশের কাছে কলিজীব ঋণী। কারণ অর্জ্জুন এবং পরীক্ষিৎ মহারাজ ছাড়া কলিজীবের গীতা ভাগবত পাওয়ার কোন উপায় ছিল না।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ বললেন—স্বরূপ দামোদরজীর কড়চা অনুসারে রামানন্দ মিলন লীলা প্রসঙ্গ প্রকাশ পেলেন।

শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহেন কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে রামানন্দ রায় সঙ্গোৎসবো নামাষ্টমপরিচ্ছেদঃ॥

উপসংহার

অশেষ করুণাঘন শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় আমাদের মূল বিষয়বস্তু রায়-রামানন্দ মিলন প্রসঙ্গ যথামতি যথাকৃপা প্রকাশ পেলেন। যে রামানন্দ মেঘকে দিয়ে প্রেমসাগর শ্রীগৌরসুন্দর তাঁর স্বভক্তিসিদ্ধান্তরূপ অমৃত বর্ষণ করালেন তাঁর কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু শুধু ভগবান নন—স্বয়ং ভগবান। শ্রীমদ্ভাগবতে পরিভাষা বাক্য—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ং ভগবান—

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্। আর সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য গোঁসাই।

নন্দসুত বলি যারে ভাগবতে গাই।
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য গোঁসাই॥

আরও বলা আছে—

নন্দের যেই শচীসুত হইল সেই
বলরাম হইল নিতাই।

ব্রজের কানাই হইল গৌর আর ব্রজের বলাই হইল নিতাই।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ং ভগবান সুতরাং মহাপ্রভু তো স্বয়ং ভগবান বটেই—স্বয়ং ভগবান বলা হয়—যাঁর ভগবত্তা থেকে অন্য ভগবত্তার প্রকাশ—যাঁর থেকে সকল অবতারের প্রকাশ—কিন্তু যাঁর নিজের প্রকাশ অন্য কোন ভগবৎ স্বরূপের প্রকাশকে অপেক্ষা করে না—তাঁকে বলা হয় স্বয়ং ভগবান। লক্ষণ বলা আছে—

অনন্যাপেক্ষি যদ্রূপং স্বয়ংরূপং তদুচ্যতে॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই স্বয়ং ভগবত্তার সঙ্গে আর দুটি মিলেছে—একটি হল তাঁর যুগাবতারত্ব আর একটি তাঁর প্রেমাবতারত্ব।

শ্রীগৌরসুন্দর যুগাবতার ভাগবতীয় প্রমাণে। বহু প্রাচীন সংবাদ নবযোগীন্দ্র সংবাদ প্রসঙ্গে শ্রীকরভাজন নবম যোগীন্দ্রের বাক্য—

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র পার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তণ প্রায়ৈ র্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥

ভাঃ ১১।৫।৩২

এই একটি মন্ত্রে যোগীন্দ্র কলিজীবের উপাস্য উপাসনা ও উপাসক—তিনটি বিষয় নিরূপণ করলেন। তাই ভাগবতীয় প্রমাণে শ্রীগৌরসুন্দর যুগাবতাররূপে নির্ণীত হলেন। এই প্রমাণ বলেই আজ জগৎ গৌরসুন্দরকে ভগবান বলে নিতে পেরেছে।

কৃষ্ণ ভগবানই গৌর হয়েছেন—হরিই গৌরহরি। কিন্তু শ্রীজীব-গোস্বামিপাদ বললেন—শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাববিশেষঃ গৌরঃ। গৌর হলেন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের কিছু বিশেষ। যোগীন্দ্র বললেন—যাঁর নামের মধ্যে কৃষ্ণ দুটি অক্ষর (বর্ণ) থাকবে তিনি হবেন কলিযুগের যুগাবতার। শ্রীগৌরসুন্দরের সন্ন্যাস গ্রহণের পরে কেশব ভারতীয় দেওয়া নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। তাই তাঁর নামের মধ্যে কৃষ্ণ দুটি বর্ণ (অক্ষর) পাওয়া যাচ্ছে—সুতরাং লক্ষণ মিলল। আর যিনি নিজের অঙ্গকান্তির (ত্বিষা) দ্বারা কৃষ্ণ উপদেশ করেন অপরকে তিনি হবেন কলিযুগের যুগাবতার। মহাপ্রভু নিজের অঙ্গ কান্তিচ্ছটা দিয়েই দক্ষিণ ভারতের পণ্ডিতমণ্ডলীকে কৃষ্ণ উপদেশ করেছেন—তাঁকে মুখে উপদেশ করতে হয় নি। অঙ্গকান্তিচ্ছটাই কাজ করেছে। তাহলে গৌরসুন্দরে কলিযুগের যুগাবতারের লক্ষণ মিলল। আর একটি প্রশ্ন কলিযুগের যিনি যুগাবতার তাঁর বর্ণ কি হবে? গায়ের রং—যোগীন্দ্র বললেন—অকৃষ্ণ—অর্থাৎ কৃষ্ণ নয় কাল নয়। এখন কাল না হলে সাদা হতে পারে লাল হতে পারে। কিন্তু তা তো হবে না। কারণ যোগীন্দ্র নিজেই সত্যযুগের যুগাবতারের বর্ণ শুভ্র বলেছেন—ত্রেতাযুগের যুগাবতারের বর্ণ বললেন—রক্তবর্ণ। তাহলে কলিযুগের যুগাবতার সাদা (শুক্ল) হবে না—রক্তবর্ণ (লাল) হবে না—আর অকৃষ্ণ যখন তখন কাল তো হবেই না। তাহলে কি বর্ণ হবে? গর্গমুনির বাক্যে সব শুদ্ধ চারটি বর্ণ পাওয়া যায়—

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহহ্যস্য গৃহ্নতোঽনুযুগং তনু।
শুক্লো রক্তস্তথাপীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥ ভাঃ ১০।৮।১৩

সাদা লাল কাল এবং পীত (গৌর)। সত্য ত্রেতা দ্বাপর তিনযুগের যুগাবতারের বর্ণ হলেন সাদা, লাল, কালো এখন একটি যুগ আছে কলিযুগ আর একটি বর্ণ আছে পীত (গৌর), তাই শ্রীজীবগোস্বামিপাদ সিদ্ধান্ত করলেন—পারিশেষ্য প্রমাণলব্ধাৎ কলিযুগের যিনি যুগাবতার হবেন—তিনি হবেন পীতবরণ। যোগীন্দ্র 'অকৃষ্ণ' পদে পীতবরণকেই

বুঝিয়েছেন। তাহলে কলিযুগের যিনি যুগাবতার তিনি হবেন পীতবরণ অর্থাৎ গৌরবরণ। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ স্পষ্ট করে বললেন—

'অকৃষ্ণ' শব্দেতে কহে পীতবরণ।

তাহলে মহাপ্রভুর বর্ণেতেও যুগাবতারের লক্ষণ মিলল। যে কলিতে গৌর আবির্ভাব এবং যে কলিতে অন্য পীতবর্ণ (শুকপত্র) যুগাবতারের আবির্ভাব এই দুই কলি আলাদা। গৌর ভগবানই সন্ন্যাসী হয়েছেন। অন্য কোন ভগবান সন্ন্যাসী হন নি। কারণ সন্ন্যাস না নিলে রাধাপ্রেম আস্বাদন করা যাবে না। রাধাপ্রেম পদের তাৎপর্য্য হল রাধারাণীর কৃষ্ণের জন্য যে প্রেম অর্থাৎ ভালবাসা। এ ভালবাসা লোক দেখিয়ে বাইরে প্রকাশের নয়। এ হল গোপনে ভালবাসা। বাইরে প্রকাশ করলে বাদিনীর ভয় আছে। কুতুনীকৃষ্ণ রাধারাণীর এই গোপন ভালবাসা ভোগ করতে চান। তা না হলে রাধাকে ভালবেসে কৃষ্ণের যে সুখ তা তো কৃষ্ণের জানাই আছে। কিন্তু কৃষ্ণ তো শুধু তাতে সন্তুষ্ট নন। কিন্তু রাধার হৃদয়ের কৃষ্ণপ্রেম—এতো বাইরের জিনিষ নয় যে হাতে তুলে দেবেন। এ হল হৃদয়ের জিনিষ। তাহলে কৃষ্ণের পক্ষে পাওয়ার উপায় কি? রাধাভাব অঙ্গীকার করা ছাড়া উপায় নেই। কৃষ্ণ তাই অনেক চেষ্টা করে রাধা হয়েছেন।

শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ প্রার্থনা করেছেন—চৈতন্যাকৃতি যে দেব অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আমাদের অতিশয় কৃপা করুন। কৃষ্ণ শুধু কৃপা করেছেন কিন্তু কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু অতিশয় কৃপা না করলে আমাদের উদ্ধারের কোন উপায় নেই। জিনিষ হাল্কা হলে তোলা সহজ কিন্তু ভারী হলে তোলা কঠিন। কারণ সেও তখন তাকে আকর্ষণ করে। আমরা কলিজীব ভবসাগরে, আসক্তির সাগরে, পাপের সাগরে পাপের ভারে এমন করে ডুবেছি যে এখানে শুধু কৃপাতে উদ্ধার হবে না, তার জন্য অতিশয় কৃপা চাই।

গোবিন্দ এমন ঘন করে রাধারাণীকে ভেবেছেন অর্থাৎ পরকীয়াকে ভেবেছেন যে তাঁর স্বকীয় কৃপণতা স্বভাব সরে গেছে। যদিও তত্ত্বতঃ রাধারাণী কৃষ্ণের শক্তি তাই পরকীয় নন, সম্পূর্ণ স্বকীয়া—কিন্তু বিধি বিধানে লোক সমাজে দাঁড়িয়ে কৃষ্ণ তো বলতে পারবেন না যে রাধা আমার। তাই সে দিক দিয়ে রাধাগোবিন্দের পরকীয়া তাই শ্রীগোবিন্দ

আজ ভগবৎ স্বরূপ নয় ভক্ত স্বরূপে আবির্ভূত হলেন। জীবের দুঃখ ভক্ত হত বোঝেন ভগবান তত বুঝতে পারেন না। ভক্ত জীবের দুঃখ দেখতে পারেন না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র আজ গৌররূপে ভক্তরূপে এসে প্রেমরত্ন কলিজীবকে আচণ্ডালে দান করলেন। এ দান না পেলে কলিজীবের গতি ছিল না। কলিযুগে অন্য কোন উপাস্য নেই। শাস্ত্রযুক্তিতে বিচারে গৌর উপাসনাই কলিযুগের একমাত্র উপাসনা। সত্যযুগের তপস্যা, ত্রেতাযুগের যাগযজ্ঞ, দ্বাপরযুগের অর্চ্চনা সাধন হিসাবে দায়ী হলেও কলিযুগের বাজারে সেটি অচল। যেমন বাদশাহী আমলের স্বর্ণমুদ্রা (মোহর) এখনকার বাজারে মুদ্রা হিসাবে অচল। কলিযুগে শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তনই একমাত্র বাজারে সচল মুদ্রা। যেমন বর্ত্তমান বাজারে কাগজের টাকা যার কোন দাম নেই—কিন্তু সরকার বাহাদুরের ছাপ দেওয়া আছে বলে বাজারে সচলমুদ্রা হয়ে আছে যার বিনিময়ে জিনিষপত্র পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু বাদশাহী মুদ্রা (মোহর-স্বর্ণমুদ্রা) দামী হলেও বাজারে অচল। তেমনি অন্য তিনযুগের সাধন দামী মনে হলেও বর্ত্তমান কলিযুগের বাজারে সাধন হিসাবে অচল—কিন্তু শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন যদি মনে হয় সস্তা সাধন, কোনও দাম নেই তবু সেইটিই কলিযুগের বাজারে সচল—কারণ বর্ত্তমান গৌর সরকারের ছাপ দেওয়া আছে—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্রে শ্রীশুকদেবগোস্বামিপাদ এই কলির প্রশংসা করেছেন। এই কলির অশেষ দোষ থাকা সত্ত্বেও একটি প্রধান গুণ যে একমাত্র নামসংকীর্ত্তনের দ্বারা সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হবে। গৌর উপাসনা করলে অন্যান্য যুগে যা লাভ হত তাতো হবেই—তাছাড়া আর একটি বেশী লাভ হবে সেটি হল ভগবানের পাদপদ্মে প্রেমলাভ। কলিযুগে অন্য ধর্ম্মের প্রয়োজন নেই। একমাত্র নামসংকীর্ত্তনেই সব পাওয়া যাবে। কলিযুগে কলিজীবের একমাত্র উপাস্য গৌর। তাঁর উপাসনার একমাত্র উপচার হল শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন। কলিতে সব ধর্ম্মই চলছে—সৌর, শাক্ত গাণপত্য, পাশুপত, শৈব প্রভৃতি। কিন্তু মজা এমনই যে ভিন্ন ভিন্ন মত অবলম্বন করলেও সকলেই জানেন যে কলিতে হরিনাম সংকীর্ত্তন ছাড়া গতি নেই। মায়ের (কালী, দুর্গা, তারা প্রভৃতি) বা বাবার (আশুতোষ)

যে কোন উপাসনা করলেও হরিনাম করতেই হবে। আর হরিনাম সংকীর্ত্তন করতে গেলেই এই কীর্ত্তন যাঁরা দিয়েছেন কৃতজ্ঞতায় ভরপূর হয়ে তাঁদের নামও করতেই হবে। যেমন ক্ষেতে ধান, যব, গম, কলাই, ছোলা, আলু, পটল, যে যে ফসলই ফলাক না কেন সকলেরই যেমন এক সুবৃষ্টিরূপ কারণের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতেই হয় তেমনি সব উপাসনা ভিন্ন ভিন্ন ফসল হতে পারে কিন্তু গৌরের প্রেমবন্যা বর্ষণকে সকলেরই অপেক্ষা করতে হবে। তাঁর প্রেমের সুবৃষ্টি হলে তবে যে যে ফসল ইচ্ছা ফলাতে পারে। বৃষ্টি যেমন মেঘ থেকে আসে তেমনি এই প্রেমবর্ষণও গৌর মেঘ থেকে আসবে। কলিযুগে গৌর মেঘই হল সেই মেঘ। আমরা যাকে কৃপা মনে করি তা ঠিক কৃপা নয়। যেমন মায়ের মন্দিরের কাছে যেতেই মায়ের মন্দিরের দ্বার খুলে গেল। আমরা তাকেই কৃপা মনে করি। এটি কৃপা সত্য কিন্তু শুধু এইটুকুতে সন্তুষ্ট থাকলে চলবে না। আরও বেশী পেতে হবে। এই ভারতের মাটিতে বসে মায়ের সঙ্গে ছেলের মত কথা বলছেন, খেলা করছেন ঠাকুর শ্রীশ্রী পরমহংসদেব, সাধকভক্ত শ্রীরামপ্রসাদ মাকে দিয়ে বেড়া বেঁধে নিয়েছেন—তেমনি করে মায়ের সঙ্গ পেতে হবে। তবে সম্পূর্ণ কৃপা পাওয়া হল।

একমাত্র গৌরহরি ছাড়া এমন উত্তম এবং মিষ্টি মাধুর্য্যমণ্ডিত ভগবান আর নেই। গোবিন্দ স্বরূপে যে অসাধারণ গুণ চারটি—লীলামাধুর্য্য, প্রেমমাধুর্য্য, বেণুমাধুর্য্য, রূপমাধুর্য্য সে তো গৌরস্বরূপে আছেই। কিন্তু গৌর তো একা কৃষ্ণ নন—রাধারাণীর সঙ্গে মিলিত হয়ে গোবিন্দ গৌর হয়েছেন। বিচারে গোবিন্দের চেয়ে রাধারাণীর মহিমা আরও বেশী—কারণ কৃষ্ণচন্দ্র নিজেকে কিশোরীদাস বলে পরিচয় দিয়েছেন। তাহলে জীব কাকে ভজনা করবে? রাধাকৃষ্ণ দুজনেই উপাস্য—দুজনকে উপাসনা করলে তবে সম্পূর্ণ পাওয়া যাবে। এই রাধাগোবিন্দের আবার কাঁচা পাকা অবস্থা আছে। রাধার কৃষ্ণের প্রতি প্রেম কেমন এটি জানবার জন্য কৃষ্ণের অভিলাষ। সকল রসের মধ্যে মধুর রস সবচেয়ে উত্তম। আবার মধুর রস কোন অবস্থায় বেশী উত্তম? মিলনে না বিরহে? রসবিচারক বলেন—বিপ্রলম্ভ অর্থাৎ বিরহ ছাড়া মিলনের সুখাস্বাদন হয় না। বিরহ থাকলে তবে মিলন সুন্দর কিন্তু মিলিত অবস্থায় যদি বিরহ থাকে তবে সেই মিলনই সবচেয়ে সুন্দর। শ্রীগৌরাঙ্গ স্বরূপ হলেন এই মিলনে বিরহের

স্বরূপ। ১০৮ শ্রীশ্রীল রামদাস বাবাজী মহারাজ গৌর স্বরূপটি কীর্ত্তনের মাধ্যমে আঁকলেন—

মধুর গৌরাঙ্গ দেহ
নিত্য মিলনে নিত্য বিরহ।

এই স্বরূপই রসের চরম অবস্থা। তাই বিচার অনুসারেও সকলের একমাত্র গৌর উপাসনা করাই কর্ত্তব্য।

গৌরস্বরূপে রাধা হলেন আধার আর শ্যাম হলেন আধেয়। শ্যাম এবং রাধা এমন ভিয়ানে গৌর হয়েছেন যে শ্যাম থেকে রাধাকে আলাদা করা যাচ্ছে না। শ্যামের ওপরে রাধার আবরণ। এই রাধাস্বরূপ জীব সহজে গ্রহণ করতে পারবে।

পতিতপাবন সুদুর্লভ প্রেমদাতা শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর কলিযুগে আবির্ভূত হয়েছেন বলে কলিজীব এবং কলিযুগ দুজনেই তাঁকে পেয়ে গেল। গৌর ভগবানের ভিতর সব অবতারই মিলিত হয়েছেন। অন্যান্য অবতারের কাজ একা গৌরের দ্বরাই সিদ্ধ হয়েছে। শ্রীবৈষ্ণববন্দনায় বলা হল—

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ কৃপাময়।
সর্ব্বঅবতার সর্ব্বভক্তজনাশ্রয়॥

রাধাকৃষ্ণ মিলিত মূরতি শ্রীগৌরসুন্দর। রাধারাণী যত ঘন করে কৃষ্ণকে ভেবেছেন এমন করে আর কেউ ভাবে নি। গোবিন্দ সুখী হবেন এই ভাবনা রাধার। গোবিন্দ ভাবনায় রাধা তন্ময়। এই ধ্যানেতেই রাধা কৃষ্ণ হয়েছেন আবার এই ধ্যানেতেই কৃষ্ণ রাধা হয়েছেন।

রাধারাণী গোবিন্দ ভাবতে ভাবতে গোবিন্দ হয়েছেন—ইনি হলেন বিবর্ত্ত গোবিন্দ আবার গোবিন্দ রাধারাণীকে ভাবতে ভাবতে রাধা হয়েছেন ইনি হলেন বিবর্ত্ত রাধা। বিবর্ত্ত গোবিন্দের 'গো' আর বিবর্ত্ত রাধার 'রা'—এই দুই এ মিলে গোরা। তাই গোরা 'নামে' রাধাগোবিন্দ মূর্ত্তিমান। গৌরস্বরূপে এইভোগ বিবর্ত্তমিলন এরই নাম বিবর্ত্ত বিলাস। সেই পরমানন্দ স্মরণ স্বরূপ গোরার সেই স্বরূপের ভোগ, সেই ভোগে নিজের আনন্দ গান—আবার শুধু নিজে গান করে তৃপ্তি হচ্ছে না পরম করুণা করে অন্যকে দিয়ে গান করাচ্ছেন। যেমন অতিভোজন করলে আপনা থেকে উদগার উঠে। অনাদিকালের বিমুখ জীব কিছুতেই কৃষ্ণ বলবে না—তাকে হাতে পায়ে ধরে গললগ্নীকৃতবাসে তাদের কৃষ্ণ

বলাচ্ছেন। শ্রীজীবপাদ বলেছেন—অথবা স্বয়মকৃষ্ণং গৌরং ত্বিষা স্বশোভাবিশেষেণৈব কৃষ্ণোপদেষ্টারঞ্চ। যদ্দর্শনেনৈব সর্ব্বেষাং কৃষ্ণং স্ফুরতি। অর্থাৎ গৌর দেখলেই কৃষ্ণ বলতে ইচ্ছা করে।

অখিললোকসাক্ষী গৌর কিন্তু মহাজন বলেছেন—যার যেমন ভাব সে তেমনি দেখে—আবার যার যেমন ভাব সে তেমনি বলে।

কোই কহত গোরা জানকীবল্লভ
শ্রীরাধার প্রিয় পাঁচবাণ।
(ঠাকুর) নয়নানন্দের মনে আন নাহিক জানে
গৌর আমার গধাধরের প্রাণ॥

মুরারিগুপ্ত—যিনি ত্রেতাযুগের শ্রীহনুমানজী, তিনি গৌর দেখে বলছেন—গৌর আমার জানকীবল্লভ অর্থাৎ রামচন্দ্র। বসু রামানন্দ বলছেন—গৌর আমার রাধারমণ—আছে আবরিত রাধার বরণ। আবার অনুভবী ঠাকুর নয়নানন্দ বললেন—গৌর আমার গদাধরের প্রাণ। তাহলে দেখা যাচ্ছে গৌর শ্রীকৃষ্ণরূপেই প্রকাশ। গৌর নিজেকে যতই আবরণে রাখুন প্রাণপ্রিয় রামানন্দের কাছে এবারে ধরা পড়ে গেছেন আর নিজেকে লুকিয়ে রাখতে পারেন নি। শ্রীজীবপাদ তাই বললেন—তস্যৈবাবির্ভাব-বিশেষঃ। শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রের আবির্ভাব বিশেষ হলেন গৌর।

শ্রীগৌরসুন্দরের অঙ্গ এবং উপাঙ্গই তাঁর অস্ত্র এবং পার্ষদ—এ ছাড়া তাঁর নিত্য পার্ষদ তো আছেনই। শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তনেই গৌর আরাধনা হবে এবং যারা সুমেধা অর্থাৎ বুদ্ধিমান তারাই গৌর আরাধনা করবে। সুমেধা বলতে যারা গৌর ভগবানই কলিজীবের উপাস্য এবং শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনই কলিযুগোচিত সাধন এটি যার ঠিক ঠিক বুঝেছে তারাই সুমেধা বলা আছে—

কলৌ সংকীর্ত্তন যজ্ঞে কৃষ্ণ আরাধন।
সেই সে সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ॥

পরম বিদ্বৎ শিরোমণি সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যও দেখেছেন—মহাপ্রভুর ঈশ্বরস্বরূপ তাই সার্ব্বভৌমের সাধ্বস বোধ আছে, সম্ভ্রম বোধ আছে। অথচ সন্ন্যাসী গৌরে ঝোঁক আছে। গৌর দেখে দেখে মনে হচ্ছে তাহলে গোপীনাথ যা বলেছিল তাই নাকি? বেদান্তের সিদ্ধান্ত গৌররূপে মূর্ত্তিমান। সার্ব্বভৌম প্রথমে শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দর্শন

করলেন—পরে দেখলেন দ্বিভুজ মুরলীধর নবকিশোর নটবর। পরে আবার দেখলেন—ষড়ভুজ মহাপ্রভু দণ্ডকমণ্ডলুধারী। অঙ্গকান্তি কিন্তু পীত। এর তাৎপর্য্য হল গৌর আমার সর্ব্বাবতারী। এই গৌর সম্বন্ধেই বলা আছে—

সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তঃ শান্তি নিষ্ঠাপরায়ণঃ॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বয়ং ভগবত্তা এবং যুগাবতারত্ব প্রতিষ্ঠিত হল। কিন্তু তাঁর স্বরূপের আর একটি দিক আছে—সেটি হল প্রেমদাতৃত্ব। কারণ তিনি প্রেমাবতার। শ্রীগোবিন্দের চিরকালের প্রতিজ্ঞা বাক্য আছে—

আমি চিরকাল নাহি করি প্রেমভক্তিদান।
এই ভক্তি বিনু জগতের নাহি অবস্থান॥

ঘরে ঘরে অর্থাৎ নিজ পরিকরকে প্রেমদান করে গোবিন্দের নাম হয় নি—তাই গোবিন্দ এবারে সঙ্কল্প করেছেন—পতিত জীবকে প্রেমদান করবেন। গরীবকে খাওয়াতে পারলে তবে তো খাওয়ানোর গৌরব। কিন্তু প্রেম তো গোবিন্দের একার নয়। তিনি তো মায়ের অনুমতি ছাড়া সন্তানকে দান করতে পারেন না। মাকে অনুনয় করতে হবে দানের জন্য। যেমন শঙ্করারণ্য সন্ন্যাসী হাড়াই পণ্ডিতের কাছে তাঁদের একমাত্র সন্তান কুবেরকে (নিত্যানন্দ) ভিক্ষা করেছেন। কিন্তু হাড়াই পণ্ডিত তো মায়ের (পদ্মাবতীর) অনুমতি ছাড়া দিতে পারেন না। মা সন্ন্যাসীর ভিক্ষা এবং স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে মনের দুঃখ মনে রেখে পুত্রদানের অনুমতি দিলেন। এখানেও রাধাঠাকুরাণী হলেন ভক্ত শ্রেষ্ঠ। তাই রাধাঠাকুরাণীর অনুমতি পেলে তবে গোবিন্দ প্রেমদান করতে পারেন। যে আধারে প্রেম থাকবে তাকে রাধারাণীর মত করে নেবে। পরশমনির স্পর্শে লোহার স্বরূপ আর লোহা থাকে না—সে সোনা হয়ে যায় তেমনি প্রেমস্পর্শমণির স্পর্শে কৃষ্ণও গৌর হয়ে যাবেন। কৃষ্ণ তখন আর কৃষ্ণ থাকবেন না। কৃষ্ণ আধার যদি প্রেম স্পর্শমণি বহন করে তাহলে প্রেমস্পর্শমণির ভাণ্ডারী রাধারাণীর স্বরূপই কৃষ্ণ পাবেন। তাঁর নিজের স্বরূপ আর থাকবে না। অর্থাৎ কৃষ্ণ রাধা হবেন অর্থাৎ গৌর হবেন। প্রেমাদান লীলার পরিপূর্ত্তি গৌরে। জল যদি সীমাবদ্ধ থাকে তাহলে দানের কার্পণ্য থাকে কিন্তু প্লাবন এলে সব ভেসে যায়। গৌরস্বরূপে রূপের এবং প্রেমের

সাগরে বান ডেকেছে তাই বাঁধ ভেঙ্গে গেছে—পতিত জগৎকে তাই ভাসিয়ে দিয়েছে।

প্রেমদান লীলাতে গৌরের বৈশিষ্ট্য।

কৃষ্ণচন্দ্র দাতা বটে কিন্তু তাঁর দানে কিছু কার্পণ্য আছে—সংকীর্ণতা আছে—উপযুক্ত পাত্রে দান হয় নি—তাঁর দান হল ঘরে ঘরে দান। কারণ বলা আছে—

কৃষ্ণচন্দ্র কৃপা কর করুণা সাগর

কৃষ্ণচন্দ্র করুণা সাগর বলেই সাগরের ধর্ম বজায় রেখেছেন—সাগরে অসীম জলরাশি কিন্তু সে জল তটসীমাকে (বেলাভূমিকে) লঙঘন করে না। সাগরের জলে বন্যা আসে না—দেশকে ভাসিয়ে দেয় না। নদীর জল বন্যা আসে। তেমনি কৃষ্ণচন্দ্র করুণা সাগর—তাই তাঁর করুণা বারি নিত্য পরিকরূপ তটসীমাকে লঙঘন করে পতিত জগতে প্রেমবন্যা আনে নি। পতিত জগৎকে ভাসায় নি। কৃষ্ণচন্দ্র অন্তঃপুরে দান করেছেন। ঘরে ঘরে দানের কেউ প্রশংসা করে না। পতিত জগৎকে যদি কৃষ্ণচন্দ্র কৃপা করতেন তাহলে তাঁর দাতা নাম সার্থক হত। শ্রীধাম বৃন্দাবনের লতাতে পর্যন্ত কৃষ্ণচন্দ্র প্রেমদান করেছেন—এ কথা বলা আছে—কিন্তু বৃন্দাবনের লতা তো স্বরূপে লতা নয়—ওতো রাধারাণীর নিজেরই স্বরূপ তাই সেখানে আর প্রেম দিতে হয় না—তারা স্বভাবেই প্রেমবতী। আর যদি বা দিয়ে থাকেন তাহলেও নিজের জনকে দান করেছেন—এ দানের গৌরব নেই। কারণ রাজা দান করছেন রাণীকে—এ দানের কেউ প্রশংসা করে না। দান করতে হবে পতিতকে, দীনজনে। কৃষ্ণ স্বরূপে সে দান হয় নি। তাই ত্রুটি আছে। সে ত্রুটি পূরণ হয়েছে গৌরস্বরূপে।

গৌরস্বরূপে এমনই প্রেম বন্যা—যে শ্রীজগন্নাথও বিস্মিত হয়েছেন—রথাগ্রে গৌরনটনে জগন্নাথেরও বিস্ময়। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ বললেন—

স জীয়াৎ কৃষ্ণচৈতন্য শ্রীরথাগ্রে ননর্ত্ত যঃ।।
যেনাসীজ্জগতাং চিত্রং জগন্নাতোঽপি বিস্মিতঃ॥

পদকর্ত্তা যদুনাথ দাস বললেন—

দেখিয়া প্রভুর নৃত্য জগন্নাথ হাসে।
সে আনন্দে ভাসি যায় যদুনাথ দাসে॥

গৌরের কীর্ত্তন নটন দেখে জগন্নাথের আনন্দিত মন। কারণ এ নবনটন— মাধুরী এ জড়াজড়ি নটন মাধুরী জগন্নাথ তো কখনও দেখেননি। ব্রজলীলায় রাধাকৃষ্ণের রূপে ও নটনমাধুরীতে মুগ্ধ হয়েছেন আবার কৃষ্ণচন্দ্র রাধারাণীর রূপে ও নটনমাধুরীতে মুগ্ধ হয়েছেন। দুজনে দুজনের নাচ দেখেছেন এবং মুগ্ধ হয়েছেন। কিন্তু যুগলে এক সঙ্গে নাচলে যে কি মাধুরী হয় তা তো জগন্নাথ দেখেন নি। যুগলের নটনমাধুরী উপভোগ করেছেন সখী ও মঞ্জরীর দল। আজ জগন্নাথের বদন চেয়ে আবেশে গোরা রায় নাচছেন—

উদ্দীপ্ত নৃত্যে প্রভু ছাড়িয়া হুঙ্কার।
চক্রভ্রমি ভ্রমে যেন অলাত আকার॥

তাতে আনন্দ পাথার উথলিছে। গৌর নটন তো রাইসঙ্গে জড়াজড়ি তাই অধিক মাধুরী। গৌর একে তো যুগল তাতে আবার বিপরীত। শুধু বিবর্ত্ত নয়—বিবর্ত্তে বিলাস রঙ্গময়। গৌরস্বরূপে রাইকানু জড়াজড়ি। আমরি মরি কি মাধুরী। যা নিকুঞ্জে ছিল তা আজ নীলাচলের পথে প্রকট হল। ব্রজ নিকুঞ্জ হতেও এখানে অধিক মাধুরী। কারণ সেখানে দুজনে স্বভাবে ছিল। এখানে দুজনেই স্বভাব হারাল। এখানে যে বিপরীত রীতি। এখানে নাগরী নাগর, নাগর নাগরী, রমণী রমণ, রমণ রমণী, কিশোরী কিশোর, কিশোর কিশোরী। তাই মধুর নীলাচল আশ মিটান লীলাভূমি। প্রাণ রাধা রাধারমণের আশ মিটান লীলাভূমি বাঞ্ছাপূর্ত্তি মূর্ত্তি গোরার আশ মিটান লীলাভূমি। গৌরস্বরূপটি এখানে নিত্যমিলনে নিত্যবিরহ। নিভৃতে রাই ঢাকা আছে কানাই। নিরন্তর বুকে ধরে আছে কিশোরী তবু বলে কোথা বংশীধারী। এখানে প্রেমপাথারে সবাই সাঁতারে। পদকর্ত্তা আক্ষেপ করে বলছেন—

"প্রেমের পাথারে সবাই সাঁতারে
কেবল দুখী যদু অভাগিয়া॥"

কেবল দুখী যদু অভাগিয়া।
গৌর লীলা না দেখিয়া কেবল দুখী যদু অভাগিয়া।

কৃষ্ণস্বরূপে যা অসম্পূর্ণ গৌরাঙ্গ স্বরূপে তা সম্পূর্ণ। কৃষ্ণস্বরূপে যা অনভিব্যক্ত গৌরস্বরূপে তাই অভিব্যক্ত। কৃষ্ণস্বরূপে তাঁর আস্বাদন, প্রয়োজন সবই অসম্পূর্ণ গৌর স্বরূপে তা সম্পূর্ণ। মাধুর্য্যও কৃষ্ণস্বরূপে অসম্পূর্ণ। কৃষ্ণরূপ ভুবনমোহন, তাঁর রূপের বর্ণনায় শাস্ত্র মুখর হয়ে

আছেন। যে রূপ সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

যে রূপের এক কণ
ডুবায় সব ত্রিভুবন
নরনারী করে আকর্ষণ

গোপরামারা কৃষ্ণরূপের প্রশংসা করেছেন। ভীষ্মদেব কৃষ্ণরূপের স্তুতি করেছেন। কৃষ্ণের স্বরূপ বিচার রূপ হল একটি দিক। এই রূপের বিশেষ হলেন গৌর। কৃষ্ণরূপ যদি দুধ হয় গৌররূপ তাহলে ক্ষীর। তাই গৌররূপ দর্শনে কৃষ্ণেরও লোভ জেগেছে। প্রেমদান লীলাতেও গৌরের বৈশিষ্ট্য।

প্রেমদান কাজই ভগবৎ স্বরূপের বিশেষ কাজ। কারণ অসুর মারণে ভগবৎ মহিমা স্থায়ী হয় না ভগবানের যত যত দান আছে তার মধ্যে প্রেমদান হল শাশ্বত ফল। যে আশ্রয় প্রেম পাওয়ার শিক্ষা দেয় বা যে আশ্রয় গ্রহণ করেছে তাকে পঞ্চমাশ্রমী বলা হয়। ভক্তি পাওয়া হলে পুরুষার্থ পাওয়া শেষ হল। ভগবান প্রেমের অধীন—তাই প্রেম পেলেই ভগবানকে পাওয়া যাবে। ভক্তি হলেন পরুষার্থ শিরোমণি। যে প্রেম দিয়ে ভগবানকে বাঁধতে পারা যায় সেই প্রেম যে ভগবান দান করেন সেই ভগবানই সকলের চেয়ে বড়। যত যত ভগবান এসেছেন জীবের কল্যাণ সবাই করেছেন কিন্তু যে প্রেম দানে জীবের অবিদ্যা ব্যাধি চিরতরে নির্মূল হবে সেই প্রেম যিনি অকাতরে দান করেছেন—তাঁরাই দানের গৌরব। কৃষ্ণস্বরূপে মুক্তিদানেরই বৈশিষ্ট্য কারণ তীব্র অগ্নিকে যেমন করে হোক স্পর্শ করলে যেমন দাহ হবেই সেইরকম যেমন করে হোক কৃষ্ণ স্পর্শ করলেই মুক্তি হবেই। তাহলে দেখা যাচ্ছে মুক্তি সুলভ কিন্তু প্রেম দুর্লভ। কারণ বলা আছে—

কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি মুক্তি দিয়া।
কভু প্রেমভক্তি না দেন রাখেন লুকাইয়া॥

কিন্তু প্রেমদাতৃত্বের বেশী সুনাম গৌরে।

ভগবানের মুখ্য কাজ হল নিজের রস আস্বাদন। সেটি সম্পূর্ণ করে তবে জগতের কাজ করেন। ভগবান রামচন্দ্র এবং কৃষ্ণচন্দ্র দুজনেই ধ্যানের যোগ্য—তাতে কাল দেশের নিয়মের কোন বিধি গণ্ডি নেই। তাই শ্রীগৌরসুন্দর যখন শ্রীল বাসুদেব সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের কাছে

ষড়ভুজমূর্ত্তি প্রকাশ করলেন তখন তাতে কৃষ্ণচন্দ্র এবং রামচন্দ্রকেই নিয়েছেন কিন্তু অন্য কোন লীলা অবতারকে নেন নি। রামচন্দ্র হলেন মর্য্যাদা পুরুষোত্তম আর কৃষ্ণচন্দ্র হলেন লীলা পুরুষোত্তম। রামচন্দ্র স্বরূপে প্রেমের সাধনার প্রথম প্রকাশ। একটু একটু করে অগ্রগতি হতে হতে গৌর স্বরূপে সে সাধনা সে প্রেমের তপস্যা সম্পূর্ণ হল। রামচন্দ্রে প্রেমের তপস্যার বীজ উপ্ত হয়েছে। ক্রমে কৃষ্ণ স্বরূপে তার অঙ্কুর বেরিয়েছে আর গৌর অবতারে সেই অঙ্কুর বৃক্ষে পরিণত হয়ে ফল ফুলে সশোভিত হয়েছে। কৃষ্ণ নিজে যখন প্রেম সম্পূর্ণরূপে আস্বাদন করেন এবং জগতের সকলকে আস্বাদন করান তখনই তিনি প্রেমপুরুষোত্তম। এ জগতে বিদ্যার্থী যেমন একটির পর একটি শ্রেণীতে ওঠে তেমনি ভগবান রাম অবতার থেকে ধাপে ধাপে প্রেমের শ্রেণীতে উঠেছেন। এখন এই প্রেম রোজগারের উপায় কি সাধকের পক্ষে? সাধককে প্রেম লাভ করতে হলে নিঃসঙ্গ হতে হবে। বিষয় ছাড়তে হবে। নিঃসঙ্গ বলতে শুধু এ জগতের স্ত্রী, পুত্র, অর্থ, আত্মীয়স্বজন নয়—মান, যশ, লাভ, পূজা প্রতিষ্ঠা পরকাল, স্বর্গাদি পর্য্যন্ত সব ত্যাগ করতে হবে। তবে হবে নিঃসঙ্গ। এ সাধনা, প্রেমের তপস্যা ভগবানের আরম্ভ হয়েছে রামচন্দ্রের অবতার থেকে। রামচন্দ্র পিতা, মাতা, রাজ্য সব ত্যাগ করলেন—শেষ পর্য্যন্ত সীতাকেও ত্যাগ। কারণ সীতা ত্যাগ না করা পর্য্যন্ত প্রেমের সাধনা হবে না। রামচন্দ্র যে নিজে ভগবান এটি ভুল হয়ে গেছে। কারণ ভগবান মনে থাকলে আর প্রেম আস্বাদন হবে না। কৃষ্ণের যদি মনে থাকে আমি কৃষ্ণ তাহলে আর কৃষ্ণ বলে কাঁদা হবে না। তাই নিজের স্বরূপটি ভুলতে হবে। এই ভুল হওয়া আরম্ভ হয়েছে প্রথম রাম অবতারে আর এই ভুল সম্পূর্ণতা লাভ করেছে গৌরস্বরূপে। গৌর যে নিজে কৃষ্ণ এ কথা তাঁর মনে নেই। তাই গৌর 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলে কেঁদে আকুল। রামচন্দ্রের পরে কৃষ্ণ ভগবান। কৃষ্ণও প্রেমের সাধনার জন্য রাধারাণী এবং গোপরামাদের ত্যাগ করেছেন। ব্রজ ছেড়ে দ্বারকায় এসেছেন কৃষ্ণ। প্রেমের ধ্যানে নিঃসঙ্গ তপস্বীর জীবন যাপন করেছেন। দ্বারকার মহিষীগণ আছেন বটে কিন্তু তাঁরা গোবিন্দের মন ভরাতে পারেন নি। তাঁদের রাখতে হয় তাই রেখেছেন। কৃষ্ণের মনের ধ্যানে জেগে আছেন ব্রজের গোপরামারা। বাইরে তাদের ত্যাগ করতে হয়েছে—তা না হলে প্রেমের সাধনা হবে

না বলে ব্রজত্যাগী দ্বারকার কৃষ্ণ হলেন রাধাপ্রেমের ঋষি। রাধার ধ্যানে বিভোর। প্রেমের ধ্যানে নিমগ্ন দ্বারকার এই ঋষি পূর্ণ ঋষিত্ব লাভ করেছেন গৌর স্বরূপে, মহাজন তাই বললেন—

রাধার ধেয়ানে হিয়া বাহির না হয় গো
এই গোরা তনু তার সাথী।

তাই এই গৌরসুন্দরে প্রেম ধন্য হয়েছে। প্রেমের সাধনার চরম শ্রেণীতে উঠেছেন গৌর ভগবান। তাঁর প্রেমের ধ্যান তপস্যা সম্পূর্ণ হয়েছে। গৌরের ত্যাগ শুধু বাইরে নয়—মনে—তাই তিনি সন্ন্যাস নিয়েছেন। এই সন্ন্যাস গ্রহণের পরেই গৌরের রাধাপ্রেম আস্বাদন হয়েছে। ত্রেতায় রাম দ্বাপরে শ্যাম আর এই কলিতে গৌরাঙ্গ নাম। যেন ধান, চাল, ভাত। ধান খাওয়া যায় তবে কষ্ট করে তার থেকে চাল বার করতে হয়। চাল তার থেকে আর একটু ভাল করে খাওয়া যায়। আর ভাত একেবারে সুপক্ক, সুসিদ্ধ তৈরী অন্ন সুন্দর আস্বাদন করা যায়।

গৌর আধারে রাম এবং কৃষ্ণ—গৌর হলেন সর্ব্ব অবতারের আশ্রয়। শ্রীশ্রীবৈষ্ণব বন্দনায় বলা হয়েছে—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ কৃপাময়।
সর্ব্ব অবতার সর্ব্ব ভক্ত জনাশ্রয় ॥

যে অবতারে যত ভক্ত গৌর অবতারে সব এসে মিলেছে। যে ভগবান যত বেশী ভক্তকে আয়ত্তে রাখতে পারেন তাঁর ভগবত্তা তত বেশী।

অন্য কোন অবতার এ পর্য্যন্ত পরকীয় রস আস্বাদন করতে পারেন নি। গৌরসুন্দর সেই পরকীয়া রস নিজে তো আস্বাদন করেছেনই উপরন্ত তাঁর মধ্যে যে সব অবতার আশ্রয় পেয়েছেন তাঁদেরও পরকীয় রস আস্বাদন করিয়েছেন। এইটিই হল গৌর ভগবানের অন্য অবতারগণের প্রতি দয়ার পরিচয়। নিজের ভোগ্য তাঁদের ভোগ করিয়াছেন—এইটিই দয়ার চরম প্রকাশ। এ বড় একটা কেউ দেয় না।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, অন্য অবতারগণ যে রস আস্বাদন করেছেন এটি কেমন করে বুঝা গেল? গৌর অবতারে কলির পতিত জীব পর্য্যন্ত পরকীয়া রস আস্বাদন করল—আর সে রস অবতারগণ আস্বাদন করবেন এ আর কোন কথা? মহাজন বললেন—

ব্রাহ্মণে চণ্ডালে করে কোলাকুলি

কবে বা ছিল এ রঙ্গ।

প্রেমের বলবত্তায় কৃষ্ণে প্রেমের পাক ধরেছে—ব্রজে কাঁচা কৃষ্ণ দ্বারকায় প্রেমের পাকের বরণ ধরেছে। ফল যেমন প্রথমে কাঁচা থাকে তারপর পাকের বরণ ধরে পরে সুপক্ক হলে বোঁটা খসে আলগা হয়ে মাটিতে পড়ে। তেমনি দ্বারকায় প্রেমের পাক ধরতে ধরতে যখন সেই পক্ক অবস্থা সুপক্ক দশাতে পরিণত হল তখন আর কৃষ্ণ সেখানে থাকতেই পারলেন না। রাধাপ্রেমের ধ্যানে তন্ময় সুপক্ক গৌরস্বরূপে নদীয়ার মাটিতে খসে পড়লেন। এত বড় ভগবান, এত উত্তম এমন মিষ্টি ভগবান আর দুটি হয় না। কৃষ্ণের সামর্থ্যের চেয়ে প্রেমের সামর্থ্য অনেক বেশী। রস এবং তত্ত্ব যে দিক দিয়েই বিচার করা যাক না কেন প্রেমের সামর্থ্য সকলের চেয়ে বেশী। এমন কি ভগবান নিজেও প্রেমকে বশীভূত করতে পারেন না। প্রেম ভগবানকে বশীভূত করে। কৃষ্ণচন্দ্র নিজেই প্রেমের অধীন। প্রেমই সর্ব্বোপরি তত্ত্ব। কারণ তত্ত্বশিরোমণি কৃষ্ণচন্দ্রকেও প্রেম অধীন করে।

শাস্ত্র উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করলেন কৃষ্ণ ভজ। কিন্তু এই কৃষ্ণ ভজতে হলে কাকে ধরতে হবে? যেমন এ জগতে দেখা যায় কোন বড় লোককে কাজের জন্য ধরতে গেলে সে যেখানে থাকে বা যার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা আছে তাকে দিয়ে ধরলে তাড়াতাড়ি কাজ হয় তেমনি কৃষ্ণ ভজনের জন্যও দেখতে হবে—তিনি কোথায় থাকেন, কার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা—দেখা গেল রাধার কুঞ্জে কৃষ্ণ থাকেন তাঁর সঙ্গেই কৃষ্ণের ঘনিষ্ঠতা। তাই কৃষ্ণকে বশীভূত করতে হলে রাধারাণীর পাদপদ্ম ভজতে হবে। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরমশাই তাই বললেন—

কৃষ্ণ নাম গানে ভাই রাধিকা চরণ পাই
রাধা নাম গানে কৃষ্ণচন্দ্র।

সুচতুর গোস্বামিপাদগণ তাই উপদেশ দিলেন—রাধাকৃষ্ণ উভয়ে মিলিত হয়ে রসের পাকে প্রেমের পাকে রাধাপ্রেম হিঙ্গুলে অন্তর বাহির রাঙানো যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু—তাঁকেই ভজনা কর। এই গৌরসুন্দরই কলিযুগে কলিজীবের একমাত্র উপাস্য।

একে তো জীবের ওপরে মায়ার আবরণ আছেই তার ওপর দেহ, ইন্দ্রিয়, আত্মীয় কুটুম্ব, দেশ সমাজ, ইহলোক পরলোক সকলের লাঞ্ছনা।

ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্য এড়িয়ে কৃষ্ণদাস বলে নিজেকে ভাববার অবসর তো হয় না। এইটিই হল লাঞ্ছনার চরম। গীতায় ভগবান বললেন—এই ইন্দ্রিয় দুষ্পূর। কিছুতেই একে পূরণ করা যায় না। এ হল মহাশনো মহাপাপ্মা—এর বিরাট ক্ষুধা। এই ইন্দ্রিয়ের ক্ষুধা মিটিয়ে স্বরূপ চিন্তা জীবের হয়ে ওঠে না। মায়ার আবরণে জীব এমনই ঢাকা পড়ে গেছে যে সে কৃষ্ণ বলতে পারে না। চারিদিকে মায়ার চর আর তার মাঝখানে জীব রয়েছে যেন রাবণের ঘরে সীতার বাস। সেখানে যেমন চেড়ি লক্ষ্য রাখে, পাহারা দেয়, যাতে সীতার কাছে রামের লোক পৌঁছুতে না পারে বা রামের কোন খবর সীতা পেতে না পারে তেমনি মায়ার রাজ্যে কৃষ্ণদাস জীবের বাস। চারিদিকে মায়ার চেড়ি পাহারা দিচ্ছে যাতে রামের খবর তার কাছে না পৌঁছায় বা রামের কোন লোক তার কাছে না আসে। রামকে ভুলতে হবে আর রাবণকে ভজতে হবে এই যেমন সীতার প্রতি চেড়িদের আদেশ এখানেও তেমনি কৃষ্ণকে ভুলতে হবে আর মায়াকে ভজতে হবে এই হল মায়ার আদেশ জীবের প্রতি। তবু চেড়িদের মাঝ থেকেও যেমন শ্রীহনূমানজী সীতার কাছে রামের খবর পৌঁছে দিয়েছিলেন তেমনি রামদাস শ্রীহনূমানজীর মত শ্রীগুরুপাদপদ্ম এই মায়ার রাজ্যে আমাদের কাছেও গৌর সংবাদ কৃষ্ণ সংবাদ পৌঁছে দেন। মানুষকে যদি গরুর খাদ্য বিচুলি খাইয়ে অনাদিকাল থেকে রাখা যায় এর চেয়ে বড় তিরস্কার আর কি হতে পারে? মায়া জীবকে মড়ার কয়লা প্রাকৃত খাদ্য খাইয়ে অনাদিকাল থেকে রেখেছে। জীব নিত্য কৃষ্ণদাস তার খাদ্য হল কৃষ্ণপ্রেমসেবা। খাদ্যাভাবে জীবের মরে যাওয়াই উচিত কিন্তু সে যে গোবিন্দের অংশ, অমৃতের অংশ তাই জীবের মৃত্যু হয় না। গৌরপাদপদ্ম, কৃষ্ণপাদপদ্ম ধ্যান করলে তাঁরা তা জানতে পারেন। তখন ধীরে ধীরে মায়ার তিরস্কার কমতে থাকে। তাই প্রতিদিন, প্রতিক্ষণে ধ্যান করতে হবে। এই ধ্যান যত গাঢ় হবে ততই মায়ার তিরস্কার কমবে। ধ্যান যত করা যাবে ততই সংসারের তাপ কমবে। স্ত্রী পুত্র আত্মীয়স্বজন গৌরগোবিন্দ বলতে দেয় না। তারা চায় গৌরগোবিন্দের জন্য না ভেবে আমাদের জন্য ভাবুক। এর ছল করে গৌরগোবিন্দকে ভুলিয়ে রাখে। মমতায় বেঁধে রাখে। আবার দেখা যায় স্ত্রী পুত্র না থাকলেই যে মুক্ত তাও নয়। কারণ—

অর্থেঽহ্যবিদ্যমানেঽপি সংসৃতির্ন নিবর্ত্তনে।

বিষয় থাক আর নাই থাক—এটি হরি বলার হেতু নয়। অর্থাৎ বিষয় থাকলে যে হরি বলা যায় না তা নয় আবার বিষয় না থাকলেই যে হরি বলা যায় তাও নয়। হরিভক্তের দয়া হলে তবে হরি বলা যায়, নতুবা নয়। প্রকৃত তরঙ্গকেও তো ত্যাগ করা যায় না। আবার প্রাকৃত তরঙ্গ থামবার পরে হরি বলব এটি মনে করলেও হবে না। যেমন সাগরের তরঙ্গ থামলে স্নান করব—এ যেমন মনে করা যায়—সেটি সম্ভব নয় কারণ সগরের তরঙ্গ তো কখনও থামবে না—তাহলে স্নানও আর করা হবে না—তাই তরঙ্গের মাঝেই স্নান করতে হবে। মানুষের জীবনেও প্রকৃত তরঙ্গ কখনও থামবে না তাই এর মধ্যেই হরি বলতে হবে। হরিতুষ্টিতে লেগে থাকতে হবে। তাহলে সব সমাধান হয়ে যাবে। হরির কাজে লেগে থাকলে ক্রমশঃ সব অনুকূল হবে। সকলকে তুষ্ট করতে গেলে হরিভজন হয় না। সুমধুর হরিভজন যে ভুলিয়ে দেয় সেই তো তিরস্কার করে। এতো গেল এ জগতের তিরস্কার—আবার ওজগতের তিরস্কার আছে—সে হল যমের তিরস্কার। গৌরগোবিন্দ-পাদপদ্মের ধ্যানে সকল জ্বালার নিবৃত্তি হবে চিরতরে। ভগবানের ধ্যানে দুঃখ নাশ এটি হল আনুষঙ্গিক ফল—মুখ্য ফল হল প্রেম লাভ। তাই মহাজনের আস্বাদন—

আর কিছু লাগে না ভাল
বল বল ভাই গৌর বল।
নিতাই বলিয়া দুবাহু তুলিয়া চলিব বরজপুরে
নিতাই বলে যাব সেখানে
যেখানে হল ব্রজপূর
ব্রজপূর্ণ হল যেখানে
সেই তো পূর্ণ ব্রজ বটে
যেখানে অপূর্ণ সাধ হল পূর্ণ
প্রাণ রাধা রাধারমণের যেখানে অপূর্ণ সাধ হল পূর্ণ
সেই তো পূর্ণ ব্রজ বটে
পূর্ণ ব্রজ নদীয়া বটে
ব্রজ যাবার এই তো সাধন
নিতাই বলে নর্ত্তন কীর্ত্তন

যেখানে যুগল এক ঘটে
পূর্ণ ব্রজ নদীয়া বটে
সেই তো পূর্ণ ব্রজপুরী
যেখানে একধারে যুগল মাধুরী সেই তো পূর্ণ ব্রজপুরী
ব্রজের নিভৃতকুঞ্জের নিভৃতকুঞ্জ প্রকটরূপে মধুর নদীয়া

ব্রজে স্বরূপের প্রকাশ বটে কিন্তু নদীয়া তার খেলার ভূমি। তাই নবদ্বীপ আর বৃন্দাবন তত্ত্বত অভিন্ন। তত্ত্বের বোধ হলে পাওনা আপনিই আসবে। পাওনা দেবার মালিক শ্রীমন্মহাপ্রভু। পাওনার দাবী করবার অধিকার জীবের নেই। জীবের কাজ হল তত্ত্ববোধ। পাওনা গৌরসুন্দরের কৃপার দান।

নিতাই বলে নদীয়ায় যাব
নয়ন ভরে দেখব
পরিণতি রসের খেলা নয়ন ভরে দেখব।
বিশ্বম্ভর নাম পূর্ণ হল
মধুর নদীয়া লীলায় বিশ্বম্ভর নাম পূর্ণ হল ॥

———